অপরাজিতা

(গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

APARAJITA
by
Tarasankar Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রাকর ঃ শ্রীভোলানাথ পাল ঃ তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো ঃ কলিকাতা-৬

অপরাজিতা

রূপ সংসারে সবার এবং সবেরই আছে। তর্ক উঠতে পারে—রূপ সবার আছে বই-কি, সংসারে রূপ তো এক রকমের নয়, বহুরূপের তর্ক ছেড়ে দিয়েও সুরূপ এবং কুরূপ এ দুটোকে কে অস্বীকার করতে পারে? সুতরাং রূপ সংসারে সবার আছে এ কথাটা মেনে নিতে আপত্তি করব না। সঙ্গে-সঙ্গে বক্রহাস্যে ব্যঙ্গও করতে পারেন। তা করুন। আমি তাতে কথাটা পরিষ্কার করেই বলব—রূপ সবার আছে এবং ওই রূপের মধ্যেও সুরূপ বলুন, কুরূপ বলুন, এমন-কি ওই যে অতি চমৎকার অধ্যাত্মবাদের ছোঁয়াচ-লাগা বহুরূপ কথাটার উল্লেখ করেও কথাটা ছেড়ে দিতে চেয়েছেন—ওই বহুরূপও আছে ওই রূপের মধ্যে। কথাটা আরও খুলে বলছি। এক-একটা ভাবাবিষ্টতাকে আশ্রয় করে রূপ-সুরূপ-কুরূপ দু-ই নিজেকে প্রকাশিত করে; কারুর হাসি সুন্দর, কারুর ক্রোধ সুন্দর, কারুর বেদনা-বিষণ্ণ মুখচ্ছবির মধ্যেই ফুটে ওঠে সর্বোত্তম রূপ। আবার কুরূপের বেলাতেও তাই; গৌরবর্ণ রং, পটলচেরা চোখ—এমন লোককে প্রতুল দেখেছে এবং তার বিশ্বাস অনেক লোকই দেখেছেন—যে হাসলে তার মাড়ি বের হয় এবং মাড়িসুদ্ধ দাঁত-মেলা এই সহাস্যবদন সুপুরুষটিকে দেখে মনে হয়—বুঝি এর থেকে বীভৎস আর কিছু হয় না। এমন প্রেম-গদগদ-চিত্ত ব্যাকব্রাস-করা বিদ্বান তরুণকেও প্রতুল দেখেছে, যার প্রেমবিভোর নয়ন এবং বয়ানখানি দেখে মনে হয়েছে—বুঝি-বা ক্ষণপূর্বে সেই সুন্দর মুখখানা আসলে ছিল একখানা মুখোশ; প্রেমের আবেগে সেই মুখোশখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে—ওর আসল বানর-মুখখানা নিজেই বের করে ফেলেছে।

লম্বাটে ধরনের মুখ—ওই শ্যামবর্ণ মেয়েটাকে হাসতে দেখে প্রতুলের মনের মধ্যে কথাগুলি কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে খেলে গেল। শ্যামলারঙের মেয়েটিকে প্রথম দেখে সে আদৌ কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি। আধময়লা শান্তিনিকেতনী ফিতে-পাড় একখানা শাড়ি আর লাল-সবুজে সুচের কাজ-করা সরু-বর্ডার একটা ব্লাউজ-পরা মেয়েটির দিকে সে তাকিয়েই ছিল—কিন্তু তার কারণ তার রূপের আকর্ষণ নয়। মনে হয়েছিল—মেয়েটি যেন চেনা, ওকে সে দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে ঠিক করতে পারছিল না। আরও একটু এমন-কিছু ছিল যার জন্য মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি সকলেরই আকৃষ্ট হওয়ার কথা। সে এমন-কিছুটা হল তার পটভূমি;—একটি ছোটখাটো স্টেশনারী দোকানে একটিমাত্র টুলের উপর বসে মেয়েটি একখানি বই পড়ছিল। আর কোন লোকের অস্তিত্ব ছিল না—এমন-কি আর কোন লোক বসতে পারে এমন সংস্থানও ছিল না। অবশ্য একালে এদেশেও মেয়েদের জীবনের কর্মক্ষেত্র

জীবিকার দায়ে, বিবাহ-সমস্যায় এবং বেটাছেলেদের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবীতেও বটে—ত্রিবেণী-ধারার সংযুক্ত বেগে কূল-কিনারা ছাপিয়ে চারিপাশেই জল-প্লাবনের মতো ঢুকে পড়ছে। ইস্কুল-মাস্টারি ও নার্সিং কর্মে হয়েছিল আরম্ভ। বর্তমানে সব অফিসের সব কেরানীগিরি থেকে শুরু করে হাকিমি জজিয়তি এমন-কি পুলিশ বিভাগেও মেয়েদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বড় বড় বিদেশী দোকানে হোটেলে বিদেশী মেয়েরা অনেকদিন থেকেই কাজ করেন। আজকাল দেশী দোকানেও দেশী মেয়েদেরও দেখা যায়। কিন্তু এমনভাবে ছোট একটি দোকানে একা একটি মেয়েকে দেখতে পাওয়া বেশ একটু বিস্ময়ের কথা বলেই মনে হল প্রতুলের। পানের দোকানে পানওয়ালী বহুকাল থেকেই আছে—তাদের জাত আলাদা; মুড়িমুড়কীর দোকানেও মেয়েরা বেচাকেনা করে; সারকুলার রোডের মেলায়, গঙ্গার ঘাটে—চুড়িওয়ালী এদেশে আছে—তারাও স্বতন্ত্র জাত। এ মেয়েটিকে দেখে প্রতুলের মনে হল, এ হল ওই যুক্তধারার বন্যার জল; এর রং আলাদা, স্বাদ আলাদা, এ মেয়েকে স্কুলের চেয়ার থেকে কোন অফিসের চেয়ার পর্যন্ত যেখানে খুশি বসালে বেমানান ঠেকে না। ঠিক এই কারণেই একে যেন এখানে মানাচ্ছে না।

বেলা দুপুর, এ সময়টায় কলকাতার মতো মহানগরীতেও একটা ঝিমুনি আসে; আগেকার কালের মতো হাই তুলে তুড়ি না দিলেও হাই তোলে; বেলা একটার বদলে দশটায় খেয়ে, বিছানায় না গড়িয়ে অফিসে গেলেও ঢুলুনি আসে। ট্রামে বাসে ফুটপাথে মার্কেটে—এমন-কি সিনেমা হাউসেও দুটোর শোতে ভিড় তেমন থাকে না। অন্যদেশের কথা প্রতুল হলপ করে বলতে পারে না তবে এই দেশে দুপুরবেলা মহানগরেও কর্মজীবন মন্থর হয়ে পড়ে। সারকুলার রোডের উপরে—জায়গাটি একেই খুব জমজমাট জায়গা নয়—তার উপর দুপুরবেলা—জায়গাটি একরকম নির্জনই হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে এখানকার ট্রাম-স্টপে প্রতুলের আসাটা একটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ব্যাপার। অথবা দুটোর কিছুই নয়, এই ওর স্বভাব এবং আজ ওর ছুটি—শুক্রবার ওদের অফিসের ছুটি। সরকারী রেশনিং ডিপার্টমেন্টের চাকরি; লীগ আমলের জুম্মার ছাপ ও ডিপার্টমেন্ট থেকে আর ঘোচেনি। প্রতুল নামাজ পড়ে না। প্রতি শুক্রবার সে স্পেশাল কনস্টেবলের ডিউটি দেয়, ডিউটি সাধারণত বিকালবেলা, কিন্তু প্রতুল বেলা এগারোটা নাগাদ ধড়াচূড়া এঁটে, ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফোটোগ্রাফীতে প্রতুলের হাতটি বড় ভাল; শখও দারুণ। কোথায় কাদায় অঙ্গ ডুবিয়ে বসে আছে মহিষ, কোথায় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটি গাই তার বাছুরের অঙ্গ লেহন করছে, কোথায় কোন্ শুকনো গাছে বসেছে শকুনের পাল, কোথায় কোন্ গাছতলায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে কোন শ্রমিক, কোথায় কোন মিলের পাশে লাঠি-হাতে এক কাবুলিওয়ালা খাতকের প্রত্যাশায় বসে থাকতে থাকতে

দুপুরের আমেজে দেখছে রৌদ্রালোকিত আফগানিস্তানের পাহাড়ী স্বপ্ন,—দারুণ শখ ভিন্ন দুপুরে রোদে এসব কেউ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় না। ওই পুলিসী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়—লোকে ভাবে—হয়তো চোর বা ডাকাতের সন্ধানে ঘুরছে, একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই তাকায়। প্রতুল সে সব গ্রাহ্য করে না, মনোমতো কিছু চোখে পড়লেই ক্যামেরাটির দিকে চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নেবে, তারপর একটি বোতাম টিপে দেয়। এবং একপাক ঘুরিয়ে দেয় হ্যাণ্ডেলটা। আবার চলে।

এই কারণেই বা এ চর্চার ফলেই প্রতুল ওই সত্যটিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে—রূপ সবার আছে এবং সবেরই আছে; সে রূপই বল আর অপরূপই বল, যাকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে মানব-মানবীর চেষ্টার আর অন্ত নাই, সে সবার মধ্যেই আছে এবং একটি ভাবাবেগের ভঙ্গীকে অবলম্বন করে দেখা দেয়।

অকস্মাৎ মেয়েটির হাস্যস্মিত মুখে সেই রূপকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল প্রতুল; বইয়ের কোন অংশ পড়ে তার মুখটি স্মিতহাস্যে যেন মুহূর্তে ফুলের মতো ফুটে উঠল; গালে পড়ল দুটি টোল—ঠোঁট দুটি ঈষৎ ভিন্ন হয়ে ঝকঝকে দাঁতের একটি রেখা দেখা দিল—সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—এই কালো রঙের নিতান্ত পাঁচপাচি মেয়েটির চেয়ে এমন মনোহারিণী যেন আর পৃথিবীতে নাই। ঠিক যেন সন্ধ্যার মুহূর্তে ফুলদানিতে রাখা একটি বিশীর্ণ রজনীগন্ধার ডাঁটায় ফুল ফুটে উঠল। বইখানাকে ধন্যবাদ, মেয়েটির হাসি উত্তরোত্তর বিকশিত হচ্ছে; স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর মনোহর হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি প্রতুল ঘুরে দাঁড়াল এবং ক্যামেরাটা ধরে চোখ নামাল; শব্দ উঠল ক্লিক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকেও একটা শব্দ উঠল; প্রতুল চোখ তুলে দেখল—মেয়েটির হাত থেকে বইখানা পড়ে গেছে। তার মুখে আর হাসি নেই। রোষে ক্ষোভে মেয়েটি যেন কালো হয়ে উঠেছে; কপালখানা কুঁচকে দু-তিনটে রেখা দেখা দিয়েছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কররূপে তীব্র তার চোখের দৃষ্টি—শান দেওয়া ছুরির মতো ঝকমক করছে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতুলের মুখে হাসি ফুটে উঠল—কারণ মেয়েটিকে প্রথমে চেনা মনে হচ্ছিল অথচ ঠিক মনে পড়ছিল না—এবার ঠিক মনে পড়ে গিয়েছে। মেয়েটির এই বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মুখ এবং দৃষ্টি দেখেই মনে পড়ে গেল—বিচিত্র একটা পরিবেশ। বউবাজার অঞ্চলে সংকীর্ণ গলির মধ্যে একটা পুরনো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ি;—ধনীর প্রাসাদ ছিল এককালে; এখন তাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে—ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কাঠ এবং টিনের পার্টিশন করে ছোট এক-একটা আট-বাই-আট—আট-বাই-দশ ফুট কামরা। তার মধ্যে নানান ধরনের মানুষের বাস। মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। অঞ্চলটাই মুসলমান প্রধান। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে এই অঞ্চলটায় হত্যায় ও অগ্নিদাহে

নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল ; ভারতবিভাগের ছুরিখানা এই মারণ-যজ্ঞ থেকেই উঠেছিল চরুর মতো। এ নিয়ে গুজব অনেক আছে। একটা হল এই যে, গোটা কলকাতাকেই প্রথম দখল করবার জন্য কলকাতার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। কতক অংশে হত্যাকাণ্ড অগ্নিদাহ লুঠ ইত্যাদি চালালেই হিন্দুরা গঙ্গা পার হয়ে পালাবে। সে সব কথা থাক। এই অঞ্চলের একখানা বাড়িতে মেয়েটিকে প্রতুল দেখেছিল উনিশশো একান্ন সালে। সেনসাস অর্থাৎ লোকগণনার সময়। প্রতুল তখন লোকগণনার কাজ করেছিল।

বন্ধ দরজায় তালা ঝুলতে দেখে প্রথমটা সে ভেবেছিল—ঘরটায় কেউ নেই। কিন্তু একটিমাত্র ছোট জানলার ফাঁক থেকে একখানা ভিজে গামছার খানিকটা বেরিয়ে আসতে দেখে নিজেই নিজেকে বলেছিল—না, তা তো নয়! বিরক্তও হয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। এমন ঝঞ্ঝাটের কাজ! প্রতিবেশীদের প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর কিছু পায়নি। কেউ বলেছিল—এক ছোকরা থাকে ; কখনও থাকে, কখনও থাকে না। কেউ বলেছিল—ঠিক জানি না ; দরজাটা তো এমনিই বন্ধ থাকে। একটি পঞ্জাবী বুধা বলেছিল—উ ছোকরা নেহি, ছোকরী।

নামও কেউ বলতে পারেনি। বাড়িওয়ালার দপ্তরেও ঠিক হদিশ পায়নি। পেয়েছিল একটা বিচিত্র নাম। একটা ব্যবসায় কোম্পানির নামে ঘরখানা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভাড়া ছ-মাসের অগ্রিম দেওয়া আছে।

আরও চার-পাঁচ দিন ওই অন্ধকারে বাড়িটার ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-নামতে হয়েছিল প্রতুলকে। দরজায় সেই তালা তেমনিভাবে ঝুলছে।

প্রতিবেশীরা বলেছিল—এসেছিল তো! দরজা খোলা তো দেখেছি!

পঞ্জাবী বুড়ি বলেছিল, ছোকরী দেওয়ানা হ্যায় বাবুজী। ওর না আছে দিলের ঠিক, না আছে মগজের। দশ-বিশটা বাত বললে,—একটা বাত বলে, তাও যেন বাত নয়, ছুরি চালায়। আবার দেখছি একলা যখন ঘরে শুয়ে থাকে তখন দুনো আঁখসে পানিয়া ঝরতে থাকে। আমি তাকে বলেছিলাম—আদমী গিনতে সরকারী বাবু চার-পাঁচ রোজ তোমার পতা লাগাতে এসেছিল, কিন্তু ফিরে গিয়েছে। বলেছিলাম—তোমাকে থাকতে বলে গিয়েছে। না হয় তো তোমার নাম উমর কাম এই সব আমাকে বলে যাও, কি লিখতে হবে যদি জান তো লিখে দাও, আমি তাকে জানিয়ে দেব ; হয়রানি থেকে বেঁচে যাবেন বাবুজী। তা বললে—কি হবে ওসব দিয়ে? আদমী গিনতি যে রোজ খতম হবে সে রোজ তক আমারও খতম হয়ে যাবে। মরেই যাব আমি।

এ তো এক আচ্ছা ঝঞ্ঝাট। আচ্ছা মেয়ে তো! কিন্তু সে নিয়ে পঞ্জাবী বৃদ্ধার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে লাভ কি?

পঞ্জাবী বুড়ী বলেছিল—খারাপ লেড়কী বাবুজী। দারু-উরু পিতি হ্যায়, ইধর-উধর ঘুমতি হ্যায় ; নিজের হালতটাকে একদম জাহান্নামে

পাঠিয়েছে। কলিজাটা টুটাফুটা হয়ে গিয়েছে, থুককে সাথ খুন বাবুজী—মস্ত পড়ে। আর দেহের তাপ কি? হরদম বুখার লেগেই আছে—এ আমি তোমাকে কসম খেয়ে বলতে পারি। ঝুটা বাত লেড়কী বলেনি, ওর জিন্দিগী শেষ হয়ে এসেছে।

সেদিন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চলে এসেছিল। করুণা খানিকটা অনুভব না-করে পারেনি। এর ঠিক পরের দিনই সে আবার গিয়েছিল—ঠিক এই কারণেই। মৃত্যুপথযাত্রিণী এই পুরুষবেশিনী মেয়েটাকে দেখবার উৎসুক্য যেন তার বেড়ে গিয়েছিল।

সেদিন সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে। বুড়ী খুব হেসে ঘাড় নেড়ে আঙুল দেখিয়ে অকারণে চুপি চুপি বলেছিল—যাও যাও বাবুজী, আজ ঘরে আছে দেওয়ানা। কাল রাত্রে ন-দশ ঘড়ির সময় ফিরেছে। সেই অবধি আর ঘর থেকে নিকলি নাহি। নিদ যাতি। খুব ঘুম যাচ্ছে। আমি নিচে নামবার সময় ঘরের মধ্যে খুটখুট আওয়াজ শুনে এসেছি। মালুম হচ্ছে কি—উঠে থাকবে। যাও, দেখ।

সত্য বলতে প্রতুলও উৎসাহ অনুভব করেছিল। সেদিন ঘরের দরজায় তালা ছিল না। ঘরখানা ভিতর থেকেই বন্ধ। একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিয়েছিল প্রতুল—কি করবে? কড়া নাড়বে? পরক্ষণেই নজরে পড়েছিল—ওপাশে জানলাটা খানিকটা খোলা রয়েছে। সঙ্গত হবে কি অসঙ্গত হবে বিবেচনা না করেই সে এগিয়ে গিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করেছিল। আবছা অন্ধকারে ঘরখানা ভরে রয়েছে; তার উপর স্তব্ধ। মিনিটখানেক পরেই চোখে পড়েছিল—বিছানার উপর একটি ছায়ামূর্তি যেন উপরের দিকে মুখ তুলে নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে, জেগেই আছে! এবার সে গলার সাড়া দিয়ে দরজার মুখে ফিরে কড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল।

প্রথম নাড়ায় সাড়াই আসেনি ভিতর থেকে।

দ্বিতীয় নাড়া দিতেই ভিতর থেকে তিক্তকণ্ঠে কেউ সাড়া দিয়েছিল—কে?

—দরজাটা খুলুন, দরকার আছে।

—উঠতে পারব না, আমার কারুর সঙ্গে দরকার নেই।

—আমার দরকার জরুরী, সরকারী দরকার।

—আমার শরীর খুব অসুস্থ।

—একবার উঠতেই হবে। আমি জানলা দিয়ে দেখছি আপনি বসে আছেন; সুতরাং উত্থানশক্তি রহিত নন। একবার কষ্ট করে উঠুন। আমি সেনসাস ডিপার্টমেন্টের লোক। আজ কমসে-কম পাঁচ দিন ফিরেছি আমি।

কথাবার্তা চলছিল হিন্দীতে।

প্রতুল ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে বেনারসে, উর্দু, হিন্দী দুটোতেই তার দখল আছে। কম দখল বলতে গেলে সে আছে বাংলায়। নইলে

ইংরেজীও সে বেশ বলে।

এবার সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। সে শব্দ মাত্রা ছাড়িয়ে উচ্চ এবং রূঢ় হয়ে উঠল, জানিয়ে দিল অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে দরজা খুলছে।

বলিয়ে ক্যা মাংতেহে সরকার?

—বিচিত্র মূর্তি; পঞ্জাবী বুড়ী না বললে মেয়ে বলে সন্দেহ করবার কোন হেতুই পেত না প্রতুল। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, শীর্ণদেহ লম্বাটে একটি ছেলে বলেই মনে হয়। মাথার চুল বাবরির মতো ঘাড় পর্যন্ত লম্বা; রুক্ষ চুল ফুলে এলো-মেলো হয়ে রয়েছে। পনেরো-ষোলো বছরের একটি ছেলে। কিন্তু এ কি চেহারা! চোখে-মুখে অপরিসীম অপ্রসন্নতার ছায়া পড়েছে; কালো রঙের উপর কেউ যেন ছাই ঘষে শুষ্ক এবং বিবর্ণ করে দিয়েছে—এরই মধ্যে চোখ দুটির কোলে নিচের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে গাঢ় কালো ছাপ পড়েছে, এবং সে ছাপ ক্রমবর্ধমান। দেখে শিউরে উঠল প্রতুল। ভুল হয় না। এ ছায়া মৃত্যুর, বুঝতে বিলম্ব হয় না এ টি-বি রোগী। দু-পা পিছিয়ে গেল প্রতুল।

তার ঠোঁট দুটি মুহূর্তে বেঁকে গেল—রাগে অথবা ক্ষোভে; চোখ দুটি কোঁচকানো, ভুরুর টানে ছোট হয়ে এল—দৃষ্টি হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ; প্রতুলের আপাদমস্তক দেখে নিলে যেন, তারপর একেবারে পরিষ্কার বাঙালীর কণ্ঠস্বরে এবং খাস কলকাতার ভাষায় ও নিখুঁত উচ্চারণে বলে উঠল—হ্যাঁ, একটু সরে দাঁড়ান। আমি টি-বি রোগী।

চমকে উঠল প্রতুল। সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—বাঙালী? তুমি—আপনি বাঙালী।

সে-ও চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির মাত্রাও যেন বেড়ে গেল। তিক্তস্বরে বললে—হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কি? এখন কি চান বলুন, শুনেছি। ক-দিন এসে আপনি ফিরে গেছেন।

প্রতুল তখনও তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েই ছিল। এ-মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক—কথাবার্তা শুনে বার-বার এই কথাটাই মনে হচ্ছিল যে, এখানে এই পরিবেশের মধ্যে এ এল কি করে? গোটা বাড়িটার মধ্যে আর বাঙালী নেই। এবং যে অবাঙালীরাই এখানে আছে তারা মানসিকতার দিক দিয়ে এমন নিচের স্তরের মানুষ যে ওই ধরনের কথাবার্তা বলে যে লোক—সে বাঙালীই হোক আর অবাঙালীই হোক—সে ওদের সঙ্গে মিলিয়ে থাকতে পারে না।

—এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন কেন বলুন তো? অত্যন্ত অভদ্র আপনি।

—কেন, তাতে হয়েছে কি? প্রতুল একটু উষ্ণতার সঙ্গেই বললে এবার। অভদ্র কথাটা তার ধাতে সয় না।

—হয়েছে বই-কি। আমি যে মেয়ে সেকথা তো আপনি জানেন। পঞ্জাবী

বুড়ী সে কথা আপনাকে বলেছে—সে আমি জানি।

—আপনি জানেন, আমিও জানি। জানিনে সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি। আপনি এখন মেয়ে নন, শুধু রোগী। আমিও পুরুষ হিসাবে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছি না। আপনার মুখের দিকে যদি কেউ তাকায় তবে করুণা করেই তাকাবে। কি নাম আপনার?

সে কাগজপত্র বের করলে।

—কি হবে আমার নাম লিখে? দু-তিন মাসের মধ্যেই তো জীবন আমার শেষ হবে। দু-মাস পরে যেখানে বিয়োগ কেটে নামটা বাদই দিতে হবে—সেখানে যোগ করে লাভ কি?

—সে তো কালই ভূমিকম্প হয়ে বা কোন একটা বিপর্যয়ে চার-পাঁচ হাজার লোক মরে যেতে পারে। এবং দু-মাসের মধ্যে নিশ্চিত মরবে এমন রোগী এবং এমন বয়স্ক লোকও অনেক আছে। সরকারী নিয়মে আমাদের সকলের নাম লিখতে হবে। আমি তো আইন করিনি। আইন পালনের জন্যই আমাকে রাখা হয়েছে। আপনার নামটা বলুন।

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বললে—রেণু।

—রেণু কি? উপাধি?

—উপাধিও চাই? রেণু দেবী।

—বয়স?

—আঠারো।

—বাপের নাম?

এবার চমকে উঠল মেয়েটি। স্থিরদৃষ্টিতে প্রতুলের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চোখ দুটি যাকে বলে অগ্নিবর্ষী—তাই হয়ে উঠল। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সে বললে—বাপের নাম আমি বলব না।

—কেন? আমার যে চাই। লিখতে হবে যে।

—না। আমি বলব না—কঠিন সে কণ্ঠস্বর। শুনলেই মনে হয়, এ সংকল্প টলবে না।

প্রতুলও নাছোড়বান্দা। সে বললে কিন্তু আমার যে চাই।

—লিখুন অজ্ঞাত। অজ্ঞাত লেখা যায়—আমি জানি। বাপের পরিচয় অজ্ঞাত এমন লোকের সংখ্যা কোন কালেই কোন দেশেই কম নয়।

এবার প্রতুল নির্বাক হয়ে গেল। মেয়েটি যা বলেছে, যে যুক্তি দিয়েছে—তা খণ্ডন করবার মতো পাল্টা যুক্তি সে খুঁজে পেল না। শুধু তাই নয়, মেয়েটি যা বলেছে—আইন মতে তা গ্রাহ্যও বটে। অজ্ঞাত পিতৃপরিচয় মানুষের কোন সাম্প্রদায়িক সমাজে ঠাঁই না থাকতে পারে, পিতা অজ্ঞাত বললে সমাজ তাকে বর্জন করতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্র তা পারে না, রাষ্ট্রে

তার স্থানও আছে এবং সকলের সঙ্গে সমান অধিকারও আছে।

গম্ভীরভাবেই প্রতুল তাই লিখে নিয়ে বললে—পেশা বলুন।

—পেশা ?

—হ্যাঁ।

—পেশা ভিক্ষে।

—ভিক্ষে ? ভিক্ষের মতো তো মনে হয় না।

—ভিক্ষে অনেক রকমের আছে। তাতে যেমন ভিখিরী তেমনি পোশাক দরকার হয়। করি অবশ্য কতকগুলো স্নো-সাবান-সেন্টের দালালী। তাও ভিক্ষে। আমার অবস্থা দেখে দোকানীরা কেনে। মেয়ে বলেও বটে। এতে যা হয় লিখে নিন।

লিখে নিয়ে প্রতুল বললে—আপনি হয়তো আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। আপনাকে অসুস্থ শরীরে বিরক্তও করেছি। কিছু যেন মনে করবেন না। এটা আমার চাকরির কর্তব্য। আচ্ছা আমি যাই।

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মুখের বিরক্তির ছাপ মিলিয়ে গিয়ে কেমন যেন উদাস বিষণ্ণ হয়ে উঠল, হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—আপনিও যেন কিছু মনে করবেন না। দেহ অসুস্থ। কটু কথা বলেছি। আর—। আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে সে, বললে—সত্যি কথা বলি আপনাকে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় যে সব হতভাগিনী হারিয়েছিল—লুঠ হয়েছিল, আমি তাদেরই একজন। মা-বাপ জানে আমি মরে গেছি। হয়তো-বা জানে—। যা জানে, তা-ও মরারই সামিল। নিয়ে গিয়েছিল আমাকে বেহার পর্যন্ত। আবার বেহার দাঙ্গার সময় তাদের বাড়ি থেকে লুঠ হয়ে এখানে—এসে—মুক্তি পেলাম। সে অনেক কথা। সেই জন্যেই বাবার নাম জাতটা বলতে পারলাম না।

—বাবা আপনাকে ঘরে ফিরে নেননি ?

—যাইনি। যেতে ইচ্ছে করেনি। আর না, আমাকে মাফ করবেন। আর দাঁড়াতে পারছি না। বলেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

প্রতুলও তাকে আর বিরক্ত করেনি। করবার প্রয়োজনও ছিল না। সরকারী প্রয়োজন মিটাবার পর নিজের মনের কৌতূহলের প্রয়োজনকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। মেয়েটির রূপের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা প্রতুলের মতো মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে প্রশ্রয় দেওয়াতে পারে। বরং মেয়েটির ভ্রূ-কুঞ্চন এবং মুখের ওপর ক্ষয়-রোগের ওই কালোছায়া তার মনকে বিমুখই করে তুলেছিল খানিকটা ; প্রতুল নিজে স্বাস্থ্যবান ছেলে ; বোধকরি স্বাস্থ্য-বিলাসী বললেই ঠিক হয়। অকারণে ক্ষয়-রোগীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিশ্বাসের বিষে নিজেকে সংক্রামিত করবার মতো মানসিকতা তার নয়। রোগকে সে ভয় অবশ্য করে না। বাল্যজীবনে সে কাশীতে মানুষ হয়েছে ; সেখানে বাঙালী সমাজে

সে ছিল অতি উদার শ্মশান-বন্ধু। যে-কোন রোগ—সে প্লেগ—কলেরা—যক্ষ্মা—টাইফয়েড—যাতেই হোক না কেন, মানুষ মরলে প্রতুল ছুটে গিয়েছে, কাঁধ দিয়েছে। এবং পাড়ায় ঘরে হলে সেবাও করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে করবে কি? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেই সে ফিরেছিল। কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে আবার ফিরে গিয়ে বলেছিল আবার একটা কথা বলতে এলাম।

কি বলুন? দয়া করে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন। আমার এই শরীরে কথাবার্তা বলতে বড় বিরক্তি লাগে। আর কি জিজ্ঞাসা করবার আছে!

জিজ্ঞাসা করবার কিছু নেই। বলতে এসেছি আপনি বোধ হয় জানেন না, নোয়াখালি দাঙ্গার পর হিন্দু পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছিলেন যে, যে-সব মেয়ে লুঠ হয়েছে, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, তাদের কোন পাপ স্পর্শ করেনি। হরিনাম স্মরণেই তাদের গ্লানি দূর হবে। তখন আপনি কেন এমন গ্লানি অনুভব করে এইভাবে এখানে লুকিয়ে রয়েছেন?

মেয়েটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও হেসেছিল। সে হাসি অবশ্য আলাদা হাসি। কান্না শুকিয়ে গেলে এ হাসি লোকের মুখে ফোটে, শ্মশানে—মড়ার খুলিতে ঘাসের ফুলের মতো। তারপর বলেছিল—আমার গ্লানি তো মনের খেদও নয়, কল্পনাও নয়। সে যে রোগ হয়ে দেহকে সুদ্ধ আক্রমণ করেছে। এ রোগের সূত্রপাত এই অত্যাচার থেকে। সে-তো হরিনামে যাবে না।

এর উত্তর প্রতুল দিতে পারতো না এমন নয়। বাকপটু না হলেও প্রতুল লেখাপড়া শিখেছে। সে একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল—মেয়েটির কথা শুনে। এমন কথা বলতে পারে যে-মেয়ে, সে তো খুব সাধারণ মেয়ে নয়। একশোটার মধ্যে পঁচানব্বইটার দলে কি নিরানব্বুইয়ের দলে তো এ মিশবে না।

মেয়েটি তাকে আর অবসর দেয়নি। বলেছিল আপনি যান দয়া করে। বলেই সে ঘুরে শুয়েছিল।

প্রতুল আর যায়নি। কিন্তু সেনসাস শেষ হয়ে যাবার পর একটি দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় 'সেনসাসের বিচিত্র কাহিনী' নাম দিয়ে কতকগুলি বিচিত্র মানুষের বিবরণের সঙ্গে এ কাহিনীটিও প্রকাশ করে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই সংবাদ থেকে যদি মেয়েটির বাপ-মা তার খোঁজ করে; তাকে যদি ফিরিয়ে নিয়ে যায়! একটু আফশোশ হয়েছিল ক্যামেরাটা তখন সঙ্গে ছিল না বলে। ছবি থাকলে—সেটিও ছেপে দিতে পারত।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে! মেয়েটি প্রায় তার স্মৃতি থেকে হারিয়েই গিয়েছিল। হারিয়ে না-যাক, রং তার ফিকে হয়ে এসেছিল, অনেক ধুলো-ধোঁয়ার প্রলেপ পড়েছিল।

অকস্মাৎ আজ যেন এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে ধুলো-ধোঁয়ার প্রলেপ ধুয়ে

গিয়ে ডগডগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ওই ভ্রুকুটি দেখে মনে পড়ে গেল, চোখের রুক্ষ দৃষ্টি মনে করিয়ে দিল। সেই ভ্রুকুটি। সেই তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, রুক্ষ তিক্ত কণ্ঠস্বরের মেয়েটি বলে উঠল—আপনি আমার ছবি তুললেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে বইখানা নামিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, যেন অসহনীয় টানে ছিলা-ছেঁড়া ধনুক।

—কেন তুললেন ছবি?

প্রতুল তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। কিছুমাত্র চঞ্চল সে হয়নি। দেহে তার শক্তি আছে, সাহস সে রাখে, অর্থাৎ দেহের সবলতার সঙ্গে মনের সুস্থতার সুন্দর সঙ্গতি আছে। মেয়েদের মুখের দিকে তাকালেই অকারণ পুলকে তার মনে দোলা লাগে না; কাজেই 'তাকাচ্ছেন কেন' বলে সামান্য ধাক্কা দিলেই দোলায়মান পুলক-বিহ্বল মন চমকে উঠে ধড়াস করে পড়ে আছাড়ও খায় না। শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার উপর তার পরনের স্পেশাল কনস্টেবলের পোশাকটার উপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। সে মিলিয়ে দেখছিল।

সেই মুখ তাতে তার সন্দেহ নেই। তবে সেই রোগজীর্ণতা—পাণ্ডুরতা নেই; বব-ছাঁটা চুলগুলি বেশ একটু বেড়েছে। মুখের স্বাস্থ্যের একটি শ্যামশ্রী দেখা দিয়েছে। সন্দেহ সেইখানেই। এ কেমন করে হয়? মনে পড়েছে মেয়েটি বলেছিল—দু-তিন মাসের মধ্যে আমাকে যেখানে বাদ পড়তে হবে লোক-সংখ্যা থেকে, সেখানে অনর্থক আমার নাম যোগ দিয়ে কি হবে? সেদিন কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য বলেই মনে হয়েছিল। তাহলে এ কেমন করে সেই মেয়ে হতে পারে? যে রোগের চিকিৎসা হল—ভাল খাওয়া, ভাল থাকা এবং বহুমূল্যে ওষুধ, দুর্ভাগ্য এবং দুর্দশার অন্ধকূপে পড়ে মেয়েটি সে রোগ থেকে সেরে ওঠে কেমন করে?

মেয়েটির কাছে বোধকরি পুলিশের পোশাকপরা লোকটির নিরুত্তরতা স্পর্ধা বলেই মনে হল এবং স্থির-দৃষ্টির চাহনি মনে হল ঔদ্ধত্য বলে; সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল, বললে—পুলিশের লোক বলে কি যা-ইচ্ছে-তাই করবেন আপনারা? মেয়েদেরও সম্মান রাখবেন না?

প্রতুল এবার শান্তস্বরে বললে—অপমান তো করিনি কিছু?

—করেননি? আমার ছবি তোলেননি?

প্রতুল বললে—তা তুলেছি। বাঙালীর মেয়ে স্টেশনারি দোকান করে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করছেন—দেখে খুশি হয়েছি এবং সেই কারণেই ছবি তুলেছি। এতে কি আপনার অপমান হয়েছে মনে করেন? আর আধা-পুলিশ আমি বটে, পুরো পুলিশ আমি নই। স্পেশাল কনস্টেবল। মাইনে পাইনে। প্রতুল একটু হাসলে। কিন্তু মেয়েটি এতেও হাসল না।

সে স্থির দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকল, কোন কথাও বললে না।

প্রতুলই আবার বললে—'বাঙালীর মেয়ের জীবনের সমস্যা' বলে ছবিটা সমেত আপনার দোকানের কথা কাগজে ছেপে দেব আমি। মধ্যে মধ্যে কাগজে আমি এমনি বিচিত্র খবর দিয়ে থাকি। ওটা আমার শখ। আপনার দোকানের একটা বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যেন, মানে—আপনাকে আমার—

কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। একটু ভেবে নিয়ে কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—এই যে গেল বছর সেনসাস হয়ে গেল, তাতে আমি এই ধরনের অনেক কাহিনী প্রকাশ করেছিলাম। ছদ্মনামে অবশ্য। সেবার বউবাজারের একটি বাড়িতে একটি বাঙালীর মেয়েকে দেখেছিলাম। খুব অসুস্থ ছিলেন তখন। জীবনের উপর ঝড় বয়ে গেছে মেয়েটির। তাঁর কথা লিখেছিলাম। বুঝেছেন—দশ-বারোটা বাপ-মা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের মেয়ে হারিয়ে ছিল রায়টের সময়।

মেয়েটি স্থির অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। যেন তার সম্বিত হারিয়ে যাচ্ছে মনে হল।

প্রতুল নীরব হতেই মেয়েটি স্বপ্নাবিষ্টের মতো বললে—বাপ-মায়ের সন্ধান পেয়েছিলেন?

—না? যাঁরা এসেছিলেন—তাদের বর্ণনা বা ছবির সঙ্গে মেলেনি।

এবার মেয়েটি হাসলে। সেই আগেকার হাসি, কান্না জমে গেলে যে হাসি বের হয়—সেই হাসি।

প্রতুল এবার বললে—আপনাকেও আমার যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি যেন অনাবিল আনন্দের প্রসন্নতায় সুকোমল হয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ, সেই আমি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মিতহাস্যে তার মুখ তেমনি সুন্দর হয়ে উঠল।

প্রতুল এবার ক্যামেরাটি বাগিয়ে ধরলে। বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান। সটে যাবেন না যেন।

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে আসছিল, হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল—মেঘের ছায়ায় শরতের রৌদ্রের মতো। কিন্তু ততক্ষণে প্রতুলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়ে তোলা-ফিল্মখানা গুটিয়ে নিয়ে সে বললে—চমৎকার ছবি হবে বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে কপি দিয়ে যাব, দেখবেন।

সেই আধো-বিরক্তি আধো-হাসির মধ্যেই মেয়েটি বললে—ছবি-তোলা আপনার বাতিক দেখছি।

—হ্যাঁ, ওই আমার সব থেকে বড় শখ।

—কিন্তু সেবার তো আপনার ক্যামেরা ছিল না।

—না। তখন গরীব ছিলাম। মাইনেই ছিল সম্বল। হঠাৎ কিছু টাকা

পেলাম। শখ মিটিয়ে নিলাম। ক্যামেরা কিনলাম আর এই স্পেশাল কনস্টেবলের পোশাক। এটাও আমার একটি শখ, ত্যাঁদড় লোকদের ঠ্যাঙাতে আমার খুব ভাল লাগে।

—কিন্তু তাতে আপনাকেও তো ঠ্যাঙানি খেতে হতে পারে!

—তা পারে। হয়ও কখনও কখনও। সেই জন্যেই তো স্পেশাল কনস্টেবল হয়েছি। এটা অনেকখানি রক্ষা করে। কিন্তু আপনাকে আবার দেখব আশা করিনি।

মেয়েটি এবার বিচিত্র হাসি হাসলো। এক জাতের হাসি সংসারে আছে যা আনন্দেরও নয়, বেদনারও নয়, অথচ না-হেসে মানুষ পারে না। এক্ষেত্রে হয়তো অসহায় স্বীকৃতির হাসি; হেসে সে বললে—মানুষের মন মরতে চাইলেও জীবনের বাঁচবার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। আর বাঁচবার শক্তিও তার অসাধারণ। একটা সামান্য আঘাতে বা হেতুতে যেমন মরে তেমনি আশ্চর্য-ভাবে সে কঠিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচে।

আশ্চর্য সেরে উঠেছেন কিন্তু। সে-বার আমাকে কি বলেছিলেন মনে আছে?

—ঠিক মনে হচ্ছে না। বোধহয় বাঁচব না বেশিদিন—এইরকম কিছু হবে।

—বলেছিলেন, দু-মাস পরেই যেখানে বাদ দিতে হবে। সেখানে নামটা যোগ দিয়ে কি হবে?

—হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম মনে হচ্ছে। শরীরের অবস্থাতেও তাই মনে হয়েছিল। তারপর আবার উঠলাম সেরে।

—আপনি—আপনি?

—আপনি—আপনি নয়; তবে—। তবে বলতে আমার সঙ্কোচ আছে। কারণ সে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কেউ করলে আমি দুঃখ পাব।

কেন? ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করব কেন? চিকিৎসায় আপনি সেরে উঠেছেন, তখন ব্যঙ্গ করবে কে?

যুগটা যে অবিশ্বাসের। একটু বিষণ্ণ-হাসি দেখা দিল তার মুখে।

ও। দৈব ওষুধ! কবচ তাবিজ?

না। তা হলে তো কবজ তাবিজের ব্যবসা করতাম। হাসলে মেয়েটি। এক সন্ন্যাসীর ওষুধে ভাল হয়ে গেলাম। তবে তার সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদটাই আমার কাছে বড়। মনে হয় ওষুধ কিছু নয়, আশীর্বাদেই ভাল হয়েছে।

—এক্স-রে করিয়েছিলেন?

—না।

—ওটা করানো দরকার।

ঘাড় নাড়লে মেয়েটি। বললে—না, দরকার নেই। মরণের দরজার ওপাশ থেকে যখন খিল হুড়কো খোলার শব্দ শুনেছি, দরজাটা বুঝি খুলে যায়

যায়, তখন হঠাৎ একজন সামনে এসে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—চল, ফিরে চল। তখন সামনের দিকে দড়ি বেঁধে টানছে, ফিরবার উপায় ছিল না, ওই মানুষটির কথায়, সামান্য ওষুধে, সামান্য নিয়মে হঠাৎ টান-দড়িটা আলগা হয়ে গেল, ফিরবার উপায় পেলাম, পথ পেলাম। এখন যে দড়ির বাঁধনের কথা বলছিলাম, সে বাঁধন তো কখনও কারুর কাটে না। আলগা হয়, ঢিলে হয়, ছিপে গাঁথা মাছের মতো জলেই ছুটে বেড়ায়। ও সুতো কাটবার যখন নয়, তখন কতটা ঢিলে পেয়েছি দেখে কি করব? ওতে তো সেই মানুষটিকে অবিশ্বাসটাই বড় হয়ে উঠবে। রোগের কোন লক্ষণ নেই, যন্ত্রণা নেই, শরীরে বল পেয়েছি, মনের মৃত্যুভয়, মৃত্যুস্পৃহা কেটেছে, বাঁচবার বাসনা হয়েছে! এর চেয়ে আর হোই বা কি, চাইব-ই-বা কি?

—তা বটে। এ কথা ছাড়া আর কোনো উত্তর প্রতুল খুঁজে পেল না। সত্যিই তো আর চাইবে-ই বা কি মেয়েটি। যে কয়দিন ছাড়ান পেয়েছে—তাই তো ওর পক্ষে যথেষ্ট। ষোলো আনা যদি নাই পেয়ে থাকে—তবে তার জন্য কপর্দকহীন মানুষ পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাকে ষোলো আনা নয় বলে অসন্তুষ্ট হয়ে করবে কি? কিন্তু ওই দু-আনা? ওই দু-আনাই যেন জীবনের সব। চোদ্দ আনা থেকে বেশি।

—আপনি আসুন এবার। খরিদ্দার এসেছে।

চারটি ছোট ছেলেমেয়ে। তারা এসে পুলিশের পোশাক-পরা প্রতুলকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। একজন আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেও।

প্রতুল বললে—এস তোমরা। কি নেবে নাও।

মেয়েটি বললে—না, আপনি আসুন এখন। শুধু তো ওরাই নয়, তিনটে বেজে গেছে। এইবার আরও দু-চার জন আসবে।

তারপর সে মেয়েদের মধ্যে বড়টিকে ডেকে বললে—এস খুকু। আজ কি? চকোলেট না লজেন্স না বিস্কুট?

প্রতুল আর দাঁড়াল না। আজ সেদিনের মতো দাঁড়াবার ইচ্ছার অভাবের জন্য ঠিক নয়—দাঁড়াতে কেমন যেন সঙ্কোচ হল তার। কি ভাববে মেয়েটি? তার প্রশ্ন আরও আছে। প্রতুলের জীবনে কৌতূহলটা একটু বেশি। একটা কথা সেই সেদিন থেকেই তার মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। সেই পঞ্জাবী বুড়ী বলেছিল বাবুজী, ও ছোকরী দারু-উরু পিতি হ্যায়। ইধর-উধর ঘুমতি হ্যায়। আর বলেছিল দেওয়ানা। সেদিন কৌতূহল সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেনি। বুড়ীর কথাটা সে সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। নিতে কোনো জায়গায় বাধেনি। যে মেয়ে দাঙ্গায় লুঠ হয়ে গেল, এখানে লুঠ হয়ে মালের সামিল হয়ে চলে গেল বিহারের কোন গ্রামে; আবার বিহার-দাঙ্গায় হিন্দু গুণ্ডার হাতে লুঠ হয়ে এল কলকাতায়, যার জীবনের নারী-মর্যাদা অত্যাচারে অত্যাচারে পাগলা

বুনো দাঁতাল হাতির পায়ে পায়ে ছোট এক টুকরো ঝরনার মতো বিধবস্ত হয়ে পঙ্ক পল্বলে পরিণত হল, তার পক্ষে এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। এই তো স্বাভাবিক। জীবনে যারা মর্যাদার জন্য মরতে পারে, তারা ক-জন? অল্পই যদি না-হবে, তবে তারা মানুষের ইতিহাসে-কাহিনীতে স্মৃতিতে-শ্রুতিতে স্মরণীয় বরণীয় হয় কেমন করে? অধিকাংশ মানুষ—সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক জীবন এবং মর্যাদা এ দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হলে জীবনকেই বেছে নেয়। আজ রাস্তায়-ঘাটে সকালে-সন্ধ্যায় যে মেয়েগুলি হত-ভাগিনীত্বের ছাপ কপালে এঁটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, তাদের ভাগ্যকে প্রশ্ন করলে ওই উত্তরই মিলবে। ভাগ্য বলবে, কি করব? মর্যাদার বদলে জীবনটাকেই যখন মেনে নিলে ও তখন এই অমর্যাদার পথ ছাড়া ওর আর বাঁচবার পথ কই? সে পথে কাঁটা তো ও নিজের হাতে দিয়েছে।

হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেল, ওই মেয়েটির মুখের কথা। আজই বলেছে।

'মানুষের মন মরতে চায় কিন্তু জীবন যে চায় না। বাঁচাবার জন্য তার ব্যাকুলতার আর অন্ত নেই।'

কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মেয়েটিকে সাধারণ বিচারে বিচার করতে যেন বাধছে।

পরের শুক্রবারের জন্যে প্রতুলের প্রোগ্রাম ছিল চিড়িয়াখানা বা গঙ্গার ধার। ডক অঞ্চলে ছবিতোলা নিষিদ্ধ—আইনে বাধে। নইলে ডক অঞ্চলে যাবার ইচ্ছাই ছিল প্রবল। কিন্তু সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোটোর দোকানে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। ছবির নেগেটিভ সে নিজেই ডেভেলপ করে। কিন্তু সেগুলি প্রিণ্ট করিয়ে নেয় একটি বাঁধা দোকানে। নইলে বড় বেশি খরচের পাল্লায় পড়তে হয়। ছবি তো নিজের খেয়াল-খুশি মতো তুলেই নিষ্কৃতি নেই, বন্ধু-বান্ধবদের অনেক অনুরোধ রাখতে হয়। ভাল ছবি যার হাতে ওঠে এবং দাম নিতে যার হাত ওঠে না, মুখেও বাধে তার পক্ষে এ পথ ছাড়া পথ নেই। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের ছবি তুলে নেগেটিভখানি তাদের দিয়ে আসে, বলে ভাল দোকানে প্রিণ্ট করিয়ে নাও। দোকানের ঠিকানাও দিয়ে দেয়। নিজে প্রিণ্ট করে ছবির তারিফটা পাওয়া যায় পাওনার চেয়ে বেশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বরাত হয়—ভাই, আর খান-তিনেক কপি দিতে হবে। আবার হয়তো ছ-মাস পর হঠাৎ চিঠিতে আসে সনির্বন্ধ অনুরোধ—'ভাই প্রতুল, সেই ছবি—কি ছবিই তুলিয়া দিয়াছ! আমার প্রাণান্ত হইল। হঠাৎ কাল দুই শ্যালিকা আসিয়া একমাত্র বাঁধানো কপিটা লইয়া টানাটানি। কি করি! একখানা ছবি দুইজনকে দেওয়া যায় না। একজনকে দিলেও

বাঁধানো জিনিসটাই দিতে হয়। অগত্যা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছি যে, এই ছবিই তোমার নিকট হইতে লইয়া তাঁহাদের বাড়ি পেঁছাইয়া দিব। বিপদ বুঝিতেছ? একজন থাকেন কাশীপুরে, অন্যজন গড়িয়াহাটে। বাসভাড়া তো আছেই। উপরন্তু অন্তত দুইটা দিন ছুটি মাটি। তাও একক যাওয়া চলিবে না। গৃহিণী বলেন, বিবাহ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছ। কোথাও যাইবার উপায় নেই। এ সুযোগ আমি ছাড়িব না। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

কাজেই প্রতুলকে প্রিণ্ট-করার পাটটা উঠিয়ে দিতে হয়েছে। বলে ও পাট-ই আমার নেই ভাই। এতে শুধু খরচের দিক থেকেই নয় অন্য দিক থেকেও ঝঞ্ঝাট কমেছে। এই দোকানটির সঙ্গে বন্দোবস্ত তার পাকা এবং সস্তা। লোকটি কাজও ভাল করে। প্রতি শুক্রবার ছবি তোলবার জন্য বের হওয়ার পথে—প্রিণ্টগুলি নিয়ে যায়।

প্রিণ্টগুলি হাতে নিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওই কালো মেয়েটির হাস্যস্মিত মুখের মধ্যে যে অপরূপকে আবিষ্কার করেছিল, সে অপরূপ-রূপেই ধরা পড়ে গিয়েছে। শেষবারের ছবিটি—যেটি ভেবেছিল খুব ভাল হবে, সেটি কিন্তু তত ভাল হয়নি। প্রথম যে ছবিটি মেয়েটির অজ্ঞাতসারে তুলেছিল, সেই বই-পড়া হাসি-মুখটির মধ্যেই সেই অপরূপের চিরকালের চকিত আবির্ভাব ফুটে উঠেছে। মেয়েটির এ ছবি দেখে মনে হচ্ছে—এ তো কারুর চাইতে মলিন বা ম্লান নয়, অসুন্দর নয়।

ফোটোর দোকানী বললে—আমাকে কিন্তু ছবিখানি শো কেশে রাখবার পারমিশন দিতে হবে।

ছবিখানি দেখতে দেখতে প্রতুল বললে—কোন্‌খানা?

—ওই যেখানা দেখছেন। বই পড়তে পড়তে হাসছে মেয়েটি। আর একখানা আমি নিয়েই রেখেছি—কাদায় পড়ে আছে মোষটা। কিন্তু ওখানা তো পারমিশন না নিয়ে রাখতে পারি না। অনেক দিনএমন ভাল ছবি আপনি তোলেননি। মেয়েটির মুখখানি ভারি সুন্দর। কপালের উপরে রুখু চুলগুলি যা উঠেছে! ক্যালেণ্ডারওয়ালাদের দিয়ে দিন না। দেবেন?

—না। প্রতুল পকেটে পুরলে প্রিণ্টগুলি।

—আমাকে পারমিশন দিচ্ছেন তো?

—কাল সন্ধ্যাবেলা নেগেটিভ দেবার সময় বলব। কিন্তু এর ডুপ্লিকেট কপি কই?

একখানা খাম তার হাতে তুলে দিলে দোকানী।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের আপ ট্রামে উঠে বসল সে। সেখান থেকে শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম বদল করে চড়ে বসল সারকুলার রোডের হাওড়াগামী ট্রামে।

বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। বারোটার কাছাকাছি; লোকজন কম

হয়ে আসছে। কাকগুলো গাছে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। ট্রামের চাকার এবং মাথার ট্রলি ও তারের শব্দ কেমন-একটা অস্বস্তিকর খোনাটে আওয়াজ তুলেছে একঘেয়ে। ট্রাম-স্টপে লোক নেই। এক নাগাড় চলেছে ট্রামটা। প্রতুল বসে বসে একমনে ভাবছিল—সেই দিনের কথা। অপরূপের কথা। তার বাস সকল রূপের মধ্যেই, সবার রূপের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে থাকে; হাসি বা কান্না। সুখ বা দুঃখ—কোন-একটি ছোঁয়ায় সে জেগে ওঠে। কার যে কোন্‌টা সোনার কাঠি এবং কোন্‌টা যে সেইটিই তার সোনার কাঠি—সে বড় কঠিন কথা। অথচ সেইটির ছোঁয়াই তাঁর জীবনে কম লাগে। অন্ততঃ প্রতুলের তাই ধারণা। তার ধারণা—

যে হাসলে সবচেয়ে সুন্দর, সে হাসে কম।

কাঁদলে যাকে সুন্দর দেখায় সে হাসে বেশি। কাঁদে কম। হয়তো বা নির্লজ্জের মতো মাড়িসুদ্ধ দাঁত বের করে প্রতি কথাতেই অর্থহীনভাবে হি-হি করে হাসে। নিজেই হাসলে প্রতুল। না হলে অপরূপ এমন সুদুর্লভ কেন?

তার উপর মানুষের চোখ। অপরূপ আবিষ্কারের চোখ নাই মানুষের। রূপের পর আর সে কিছু দেখে না। তাই অপরূপ বিকাশ সে দেখতে পায় না। সে রঙে ছটায় ভোলে। আজ চারদিকে রং-করা ঠোঁট, তুলি-আঁকা ভুরু, প্রলেপ-করা মুখের এত ছড়াছড়ি ঠিক এই জন্যেই। গাঢ় লাল বা নীল রঙের জামা কাপড় পড়ে ফুটপাথ ধরে দ্রুতপদে তারা হেঁটে চলে ঠিক এই কারণেই। চকিত এবং উজ্জ্বল রঙের ছটায় দুর্বল অসুস্থ-দৃষ্টি মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে। ছোট ছেলেদের কাছে যেমন স্বাদের অপরূপত্ব একমাত্র গাঢ় মিষ্ট রসের মধ্যেই ধরা পড়ে—এদের চোখেরও ঠিক তেমনি, গাঢ় রঙের মধ্যেই রূপকে খোঁজে।

এদের চোখ নেই।

হঠাৎ প্রতুলের খেয়াল হল—একি এ যে রাজাবাজারের মোড়! সে যে অনেকখানি ছাড়িয়ে চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ট্রামের ঘণ্টার দড়িটা ধরে থামাবার জন্য ঘণ্টা মারলে। এবং থামতে-না-থামতেই নেমে পড়ল।

অনেকটা যেতে হবে।

তা হোক। এর জন্যে আর পাঁচ পয়সা খরচ সে করবে না।

হাঁটতে হাঁটতে সে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু দোকান বন্ধ। বারোটা-একটার সময় দোকানগুলি সাধারণতঃ বন্ধই থাকে। অন্তত ছোট-খাটো দোকান, যেখানে কেনাবেচার জন্য মাত্র একটি লোক। খেতে যায়। খোলে আবার দুটো নাগাদ।

ঘড়ি দেখলে প্রতুল। এখন মাত্র সাড়ে-বারোটা।

কি করবে সে? দাঁড়িয়ে থাকবে? লোকে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলবে?

অবশ্য কলকাতার মতো মহানগরীতে কে কাকে প্রশ্ন করে? তবে তাকিয়ে দেখবে। দৃষ্টিতেই থাকবে নীরব জিজ্ঞাসা।

তাতে একটু অস্বস্তি অনুভব করতে হবে। তা হোক। সে না হয় ভোগই করবে। কিন্তু থাকবেই বা কেন? তার থেকে দোকানের দরজার ফাঁক দিয়ে ছবিসুদ্ধ খামখানা তো ভিতরে ফেলে দিলেই হয়। তার সঙ্গে দেখা করে হবে কি? কি হবে?

সেই স্থির করেই সে খামখানা বের করলে এবং কোন্ দিক দিয়ে ভিতরে দেওয়া যায় লক্ষ্য করতে লাগল। হঠাৎ কটি খড়ির-লেখা অক্ষর এক হয়ে তার চোখে ধরা পড়ল। কাঠের উপর খড়ির মোটা অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করে লেখা—'দোকান বন্ধ'।

দোকান বন্ধ অবস্থায় ওই লেখাটার মানে কোনবিশেষ অর্থজ্ঞাপন করে না। দোকান বন্ধ থাকলে সেই অবসরে অনেক বালকপণ্ডিতে হাতে খড়ি পেলে এমন বিদ্যা জাহির করে যায়। তবুও দু-ঘণ্টার জন্য বন্ধ তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রতুল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলে; তারপর ট্রামে উঠে বসল। গেল সার-কুলার রোডের গোরস্থানে। বেনেপুকুরের পিছনের বস্তিতে। সেখানে ছবি তুলে ফিরল। কিন্তু দোকানটা তখনও বন্ধ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস না-ফেলে পারল না। এবং একবারনা-নেমেও পারলেও না। পাশে একটা মিষ্টির দোকান। একটা সিগারেট-পানের কুলুঙ্গী দোকান। তাদের ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—দোকানটা বন্ধ কেন জান?

হিন্দীভাষী সিগারেটের দোকানী একটু মুচকি হেসে বললে—কেয়া জানে! তিন-চার রোজসে তো দোকানদারণী নেহি আতি হ্যায়।

অগত্যা ফিরল প্রতুল। মনটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে গেল।

পরের দিন অফিসের পর রাস্তায় বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। পকেটে তার ফোটোর খামখানা রয়েছে। বাড়ি থেকে বের হবার সময় কখন যে পকেটে পুরেছে ঠিক মনে করতে পারলে না। তবে রয়েছে।

সে চেপে বসল ট্রামে। ছবি দুখানা বের করে দেখলে। চমৎকার ছবি হয়েছে। মেয়েটি নিজেই যে বিস্মিত হয়ে যাবে তাতে তার কোন সন্দেহই রইল না। এবং হাসবে নিশ্চয়। স্মিত হাসিটি ফুটে উঠবে; এবার হয়তো তার সঙ্গে লাজনম্রতার মাধুর্য মিশে গিয়ে তাকে আরও অপরূপ করে তুলবে! কিন্তু ক্যামেরাটা আনা হয়নি। এই যে মেয়ে এর লাজ-নম্রতা আর তো আসবে না। এমনি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সংস্থানে অভিভূত না হলে তো লজ্জার মাধুর্য বেরিয়ে আসবার পথ পায় না। নিষ্ঠুর পৃথিবী পায়ে পায়ে দলিত করে তার গোড়া পর্যন্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এমনি ঘটনায় বর্ষাগমে মরুভূমির মাটির তলার মূল থেকে একটা সবুজ কণার মতো মাথা ঠেলে ওঠে; আবার পরের দিনের প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে যায়। মেয়েটা যে মরুভূমির মাটির

মতো রুক্ষ্ম কঠিন অনুর্বর হয়ে গেছে।

ছায়া সিনেমায় অনেক ভিড়। কোন নতুন ছবি এসেছে। এ ছাড়া সন্ধ্যার মুখ। ট্রামে-বাসের যাত্রীর সংখ্যা এখন অনেক বেশি। রামমোহন লাইব্রেরিতে কোন মিটিং হচ্ছে। লাউড স্পীকারে গান বাজছে। এই এক নতুন কায়দা এসেছে দেশে। মিটিং-এর বক্তৃতার সঙ্গে গানের রেওয়াজ হয়েছে। সইয়ে সইয়ে বক্তৃতা শোনানো হল এর একটা উদ্দেশ্য। বক্তৃতা তো নয় এক-একখানি দশ ইঞ্চি থান ইট। প্ল্যাটফর্মে উঁচু জায়গায় উঠে এক নাগাড়ে ঝেড়ে চলেছেন বক্তারা। তার উপর জ্বালাময়ী। তাই মধ্যে মধ্যে ইষ্টক বর্ষণ বন্ধ করে যন্ত্রণা উপসমের জন্য পিচকারী সহযোগে গোলাপ জল বর্ষণের মতো সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করেন। কিন্তু না, আর না। ভিড় ঠেলে দরজার মুখে যেতে-যেতেই ট্রাম যে স্টপটা পার হয়ে যাবে।

নেমে পড়ল প্রতুল। একটা স্টপ আগেই নামল। কিন্তু আজও দোকান বন্ধ।

পরের শুক্রবার সে অনিশ্চিত হয়েই গিয়ে উঠল বউবাজারের সেই বাড়িতে। দোকান বন্ধ হয়ে রয়েছে। কোথায় গেল সে, কি হল তার?

এত কথার মধ্যে সে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেনি। প্রয়োজনও মনে হয়নি; তাছাড়া জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হয়েছিল। তার ভ্রূকুটির কথা তো সে জানে। আশ্চর্য, একই রূপের ভিতর থেকে কেমন করে যে সুন্দর এবং অসুন্দর বেরিয়ে আসে!

যাক সে কথা। অন্য ঠিকানা যখন জানা নেই তখন বউবাজারের সেই বাড়িতেই একবার যাবে সে। নিশ্চয় এখন সে সেখানে থাকে না। তার সে জীবন আর এ জীবনে অনেক প্রভেদ। শুধু একটা ভরসার কথা, আজ আট-দশ বছর ধরে কলকাতায় মানুষের ভিড় যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে নতুন বাসস্থান পাওয়াও তো সোজা কথা নয়।

দুপুরবেলা। বাড়িটা নিস্তব্ধ। শুধু অন্ধকার ভাঙা কাঠের সিঁড়িটাতে ইঁদুর বা ছুঁচোর পায়ের নখের শব্দ উঠছে, আর উঠছে ছাদের কার্নিসের নিচে ভাঙা ভেণ্টিলেটারের মধ্যে বিশ্রামরত পায়রার গলার আওয়াজ।

থমকে দাঁড়াল প্রতুল। কে যেন আপন মনেই বকে যাচ্ছে। এ বোধহয় সেই পঞ্জাবী বুড়ীটা। এগিয়ে গেল প্রতুল। ওদিকে সেই ঘরটা অবশ্য এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ঘরটা শিকল দেওয়া বন্ধ। মানুষ থাকার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তবুও বুড়ীর আওয়াজ পেয়েই সে এগিয়ে গেল। বুড়ী বকছে—কথাগুলি ঠিক বুঝতে না-পারলেওসুরে মনেহচ্ছে আপনমনে একঘেয়ে তিরস্কার করে যাচ্ছে। তিরস্কার কেমন যেন ভিজে-ভিজে।

বুড়ী যেন স্নেহভরে কাউকে তিরস্কার করে যাচ্ছে আপন মনে। বাড়ির স্নেহাস্পদ দুরন্ত ছেলেটি অনেক-কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে থাকলে স্নেহপরায়ণা

মা বা দিদি যেভাবে তিরস্কার করে এবং ঘর দোর গুছিয়ে চলে আপন মনে—ঠিক সেই সুরে তিরস্কার করে যাচ্ছে সে।

বলছে—এতটা ভাল নয়। বুঝলি! জোয়ানিতে নাচতে সবারই ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই এমন ধেই-ধেই করে কেউ নাচে না। খানিকটা সরম রাখতে হয়! নেচে-কুঁদে আমার মতো বুড়ীকে নাজেহাল করে আমার কাম বাড়িয়ে চলে গেলি তুই, সেটা কি তোর ভাল হল? একবার ভাবলি না ভাল করছিস কি মন্দ করছিস। ভেবেও তো দেখতে হয়! দুনিয়াতে মানুষ-চেনা হল সব চেয়ে কঠিন কাজ।

বারান্দায় মোড় ফিরে প্রতুল এবার ঘরগুলির সামনের দিকে এল। নজর পড়ল—ও ঘরটা বন্ধ। তালা ঝুলছে। এ ঘরের দরজাটা ভেজানো; ঘরের মধ্যে শুয়ে হোক—বসে হোক—বুড়ী আপন মনে বকছে। প্রতুলের জুতোর শব্দেই বোধ হয় বুড়ীর বকুনি বন্ধ হয়ে গেল।

প্রতুল একটু ইতস্ততঃ করে গলা ঝেড়ে সাড়া দিলে একবার। এবার ভিতর থেকে বুড়ী প্রশ্ন করলে—কোন্ হ্যায়?

প্রতুল ডাকলে বুড়ী মায়ী! শুনো তো একদফে!

ভেঙিয়ে উঠল বুড়ী। —বু—ড়ী—মা—য়ী, শু—নো—তো—এক—দ—ফে! কেয়া শুনেগা? কোন্ বাদশা হ্যায় তু? অঁ্যা? ইয়ে দুপহরকে ধুপনে—

দরজা খুলে মুখ বের করে বুড়ী কিন্তু চমকে উঠল—শঙ্কতকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—দরোগা সাব! এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে সেলাম করে বললে— কসুর মাফ কিয়া যায়—হুজুর—আমি আপনাকে পহচানতে পারি নাই।

প্রতুলের স্পেশাল কনেস্টবলের পোশাক দেখে বুড়ী তাকে দারোগা ভেবেছে! একটু কৌতুক অনুভব করল সে। সঙ্গে সঙ্গে আবার লজ্জিতও হল। মাথার টুপিটা খুলে হেসে বললে—না বুড়িয়া মায়ী। আমি দারোগা নই। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

বুড়ী তবুও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ার্ত দৃষ্টিতেই তার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে জানালে—না তো। চিনতে তো পারছে না।

—ভাল করে দেখ। মনে কর। প্রতুল হাসলে।—মনে পড়ছে না? সেই যখন আদমী গিণতি হয়েছিল—আমি এখানে এসেছিলাম গিণতি করতে। ওই ঘরে বেমার সেই যে এক লেড়কী থাকতো, তার হয়েছিল—এই যে এই তার তসবীর—

একখানা ছবি বের করে প্রতুল বুড়ীকে দেখালে। বুড়ীর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলে উঠল—দেখি—দেখি! আঃ—হাঃ। বাহববা কি বাহববা! কি চমৎকার সুরত—তুমি এ তসবির বের করেছ বাবু! আঃ!

হায় ! হায় ! হায় ! এমন সুরত তুমি কেমন করে খুঁজে পেলে বাবু ?

উচ্ছ্বাসের মুখে বুড়ীর ভয় যেন মুহূর্তে ভেঙে গেছে কোথায় !

– হায়—হায় –বলিহারি তোমার চোখকে, আর বলিহারি তোমার তুলিকে বাবুজী !

– তুলি নয় বুড়ী মায়ী তসবীর তোলা যন্তর। ফটোগিরাপ। এ মিথ্যে কথা কয় না। এ সুরত না থাকলে যন্তর মিথ্যা করে রঙ-চঙ দিয়ে কিছু কয়ে না। জান বুড়ী মায়ী, এখন যদি -

বলতে বলতেই সে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরলে।

– ও কি করছ ? আরে ?

বলতে বলতে তখন ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

প্রতুল বললে, দেখবে, তোমার এই বুড়ো বয়সের সুরত। তসবীর আমি দিয়ে যাব তোমাকে। কিন্তু বল দেখি, এ লেড়কী গেল কোথায় ?

- কেন বলতো বাবুজী ? প্রশ্নে বিস্ময় সন্দেহ অনেক-কিছু জেগে উঠল বুড়ীর মুখে।- তাকে কেন খুঁজছ ? তার এ তসবীরই বা তুমি কোথায় তুললে ? কি দরকার তোমার ?

বলতে বলতে হঠাৎ বুড়ীর চোখ দুটি আবার অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ওই মেয়েটির অপরূপ শোভায় হাস্যময় মুখের ছবি দেখে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যেমন একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক তেমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বললে, আরে বাবু, তুমি তো চেনা আদমী গো ! দরোগার পোশাকে তোমাকে চিনিনি। তুমি তো সেই গো ! আদমী গিণতির সময়—ওই লেড়কীর হিসাব নিতে পাঁচ-সাত রোজ এসেছিলে।

—হ্যাঁ। তোমাকে তো বললাম।

—বললে কি হবে বাবুজী —আমি ভাবছিলাম, তুমি গোয়েন্দা পুলিস !

—না—না। সে সব কিছু নই। ভয় করো না তুমি।

বুড়ী এবার বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে আমি সব সমঝে নিয়েছি। সে বারেও তুমি ঠিক কথা বলনি, এবারেও ঠিক বলছ না। তুমি আদমী গিণতি করতেও এসনি। এবারও পুলিশের পোশাকে এসেছ তাও শুধু নয়, তুমি ওই মেয়েটার সন্ধানে এসেছ। তাকেই তুমি খুঁজছ। মহাবর্বতির কান্ড-কারখানা আমার অজানা নয় বাবুজী ; জানি। এ শহর, সে দেহাত। সেই দেহাতে বাবুজী আমার জিন্দগীতে অমন নওজোয়ানী এল, পহেলি বরসায় যমুনা নদীর দুকূল ভরে মিট্টি মিশানো লালী তুফানের মতো ; তখন কত জোয়ান এল, মুরলী নিয়ে, আমার জিন্দগীর কিনারে ; আমি যাকেই শুধাই, তুমি কেন এখানে ? মুরলী বাজাও কেন ? ওরা কেউ বলে, এ-কামে এসেছি, কেউ বলে ও-কামে এসেছি, কেউ-বা আবার আমতা আমতা করে। এ সব আমি জানি। অথচ কেউ বলতে পারে না, আমি কানাহিয়া, মুরলী

বাজিয়ে তোর জোয়ানীতে উজান ধরাতে এসেছি।

বুড়ী বাসর-ঘরের বুড়ী দিদিমার মতো রস-বিলাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছে।

এই বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহরের নির্জনতা, যে নির্জনতা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেই নির্জনতার মধ্যে বুড়ীর এই রসোল্লাস মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও প্রতুল রুষ্ট হল না। হাসি পেল তার। বুড়ী তার জীবনের নওজোয়ানী কালের মধুর স্মৃতিকথাগুলি যমুনা ও কানাইয়ার উপমা দিয়ে এমন অপরূপ করে বলেছে যে, তার তুলনা পেলে না সে। মিথ্যে বলেনি বুড়ী। আদ্যিকাল থেকেই ভরা যমুনার কূলে এসে জোয়ানরা বোবাই হয়ে যায়। যার যে কানাই, সে ছাড়া মুরলীতে সুরও ওঠে না, যমুনাও শোনে না, উজানে ফেরে না। বাংলা দেশের তো কথাই নাই। সেকালে মেয়েরা যমুনা ছিল না, তারা ছিল কাটা খালের মতো, যে-মুখে বইয়ে দিত সেইমুখেই বইত। অথবা ছিল চারিপাশে বাঁধ দেওয়া পুকুরের মতো ; তার ঘাটে অভিভাবকেরা বসিয়ে দিত ছেলেকে। বলত—বাঁশী বাজিয়ে হিল্লোল তোল। বোবা বাঙালীর ছেলের বাঁশীতে সুরও উঠত না, সরোবরের জলে কাঁপন ধরত না।

এখন যদি-বা কালের টানে ছেলে-মেয়ে দুইকেই বাইরে পথে বের হতে হয়েছে, দীঘি এবং ডোবা দু-রকমের পুকুরেরই বাঁধ ভেঙে তাতে স্রোত ধরেছে ;—ছেলেরা ঘাট ছেড়ে গোচারণের বদলে অফিসে-কলেজে এদিক-ওদিকে ছুটছে, মেয়েদেরও দেখা যাচ্ছে, তবুও বাঁশীতে সুর ওঠাতে ঠিক পারেনি। পত্রযোগেই রাগরাগিণীর স্বরলিপিতেই সঙ্গীত শেষ। দৌড় ওই পর্যন্ত। 'তোমাকে আমি ভালবাসি—' এ কথা বড় একটা কেউ বলতে পারে না, লিখে জানায়। বা যাকে ভালবাসে তার জন্য সর্বস্ব ছেড়ে ভেসে পড়ার সাহসও বাঙালীর ছেলের নাই। যেখানে থাকে, সেখানে আছে প্রতারণা। দিনকতক পরে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়ে ভেগে যায়।

যাক গে। বুড়ী কিন্তু বড় চমৎকার করে বলেছে। হেসে প্রতুল বললে-- তাই তো বুড়ীয়া, তুমি তো বড় ভাল বলেছ। তোমার নওজোয়ানীর আমলের যে কহানিয়া বললে তুমি—তা ভারী মধুর। বহুৎ মিঠি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি—ওই লেড়কীর জিন্দিগীর নওজোয়ানীতে বাঁশী আমি বাজাতে আসিনি। সেদিন হঠাৎ সারকুলার রোডের ওপর একটা ছোট্ট দোকানে ওকে দোকানদারণী হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। মনে হল চিনি যেন। একখানা কেতাব পড়ছিল—পড়তে পড়তে হাসির সঙ্গে এই সুরৎ ফুটে উঠল ওর মুখে—সে মুখ দেখে কখনও ভাবিনি—ভাবতেও পারিনি, কি এমন মধুর সুরত ওর মধ্যে ফুলের কুঁড়ির মোড়কে ফোটার বাহারের মতো লুকিয়ে আছে, কি থাকতে পারে! তাই দেখে আর থাকতে পারলাম না—যন্ত্রর টিপে তসবীরে ধরে ফেললাম। সেইটে ওকে দিতে এসেছিলাম। আর বলতে

এসেছিলাম—দেখ, এমন মন, এমন হাসি যদি তুমি ধরে রাখতে পার অহরহ, তবে তুমি এমনিই খুবসুরতই থাকবে সব সময়। বুঝেছ?

বুড়ী হাসতে লাগল। বেশ অর্থপূর্ণ হাসি। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়তে লাগল। তা হয়তো পারবে। বুঝলে না! সে মন তার হয়েছে। সে হাসি তার হয়তো ফুটবে! কাল সে এখান থেকে চলে গেল।

—কোথায়?

—সেই তো! তবে আর বকছিলাম কেন? বলে গেল—কোথা থেকে এসেছিলাম বুড়ী, তার খোঁজ তো দিইনি। কোথায় যাচ্ছি, সেও বলব না। তুই চেপে রাখতে পারবি নে। আমার বড় ভয় ওই নাইজাম শয়তানকে। সে শয়তান আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে হয়তো।

এরপর বুড়ী গোপন কথা বলার মতো চুপি চুপি বললে—লেড়কীর মহব্বতি হয়েছে বাবুজী! বললে—ওর অনেক দিনের জানা মানুষ। ভারি এলেমদার লোক; লিখা-পড়ি জানে। গীত গায়, সেতার সারেঙ্গীতে সঙ্গত করে—! তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। নতুন একটা বাসা নিয়ে চলে গেল। হয়তো এইবার বাপ-মা—এদের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

•

প্রতুলের মনে পড়ে গেল—সেনসাসের সময় মেয়েটি তাকে বলেছিল—বাপের নাম বলতে পারব না। তার থেকে বাপের নাম "অজ্ঞাত"—লিখে নিন। অজ্ঞাত পিতৃপরিচয় মানুষের সংখ্যা তো একটা আছে-ই। তার সঙ্গে একটা যোগ দিয়ে দিন। অতীত ইতিহাসও তার সঙ্গে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুর রূঢ় সুর ছিল—যেটাকে সেদিন উল্লাস বলেই মনে হয়েছিল প্রতুলের। মনে হয়েছিল এ নিষ্ঠুর উল্লাস নিজের জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য—যেন তার জীবনটাই একটা অপরাধ আর সেই জীবন অতি সত্বর শেষ হবে জেনে অতি নিষ্ঠুরভাবে সে উল্লসিত। এতে অসঙ্গতিও সে দেখতে পায়নি। যে মেয়ের দেহ নিয়ে পুরুষের দল পাশব প্রবৃত্তিতে এমন ছিনিমিনি খেলে দেহ-মন্দিরের অভ্যন্তরের সংসার সুখ ভবিষ্যতের স্বপ্ন-বিভোর প্রাণময়ী নারীত্বকে বিষজর্জর করে দিলে—সে মেয়ের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। আরও একটা কথা মনে হয়েছিল—সেটা ওই সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা বাদ দিয়েও এমনই মৃত্যু-রোগগ্রস্ত মানুষের কথা। যার এমন রোগ হয়—মরণ এসে সামনে দাঁড়ায়—তার পক্ষেও এই ধরনের নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক। সেও পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকে—নিজের কথাই ভাবে—এবং মজার কথা এই যে, নিজের উপরেই ষোলো আনা আক্রোশটা চালিয়ে আনন্দ পায়; গুলি খাওয়া হিংস্র জানোয়ার মৃত্যুযন্ত্রণায় যেভাবে নিজের দেহ কামড়ে আততায়ীকে কামড়ানোর পরিতৃপ্তি অনুভব করে ঠিক তেমনি ভাবেই তৃপ্তি পায়।

সেই মেয়ে বেঁচে উঠেছে এই আশ্চর্য। এবং আবার তার জীবনের ইতিহাসের ছেঁড়া-সুতো জোড়া দিয়ে চলেছে। নিজেই চলেছে।

মনে মনে একটি অনাবিল আনন্দ নিয়েই সে বাড়ি ফিরল। বুড়ীকেই বললে—ছবিখানা তাকে দিয়ো বুড়ী মায়ী। বলো—সেই বাবু দিয়ে গেছে।

বুড়ী বললে—না বাবুজী। এ তসবির আমি নিলাম। তুমি একখানা তাকে নিজেই দিয়ো। ওই দোকানেই তাকে পাবে। দোকান তো সে ছাড়েনি। এ ক-টা দিন দিলের খুশিতে হাসতে-নাচতে-গাইতে দুনিয়ার কাম থেকে ছুটি নিয়েছে। খুলবে দোকান। হয়তো বা দু-তিন রোজের মধ্যেই খুলবে।

প্রতুল হেসে বললে—আচ্ছা। তা হলে আজ তোমার যে তসবীর তুললাম। তা-ও তাকে-ই দিয়ে দেব! কি বল?

—তাই দিয়ো। বুড়ী হাসলে। তারপর পঞ্জাবের গ্রামের সুরসিকা মুখরা মেয়ের অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে বললে—এই বুড়ীয়া, যার চুল পেকে সফেদ হয়ে গিয়েছে, দাঁতগুলো বিলকুল ভেঙে গিয়েছে, মুখের চামড়া ঝুলে গিয়েছে—তার কাছে এসে দুটো গাল-গল্প করে যেয়ো, তসবীর দিয়ে যেয়ো—এ তোমার মতো নওজোয়ানকে আমি কোন্ মুখে বলব?

হা-হা করে হাসতে লাগল।

তারপর বললে—রাগ করো না যেন বাবুজী।

প্রতুল সংসারে যাকে বলে শক্ত মানুষ তাই। দেহের গঠনে সামর্থ্যেও শক্ত মানুষ। ভোরে উঠে ডন মারে, বৈঠক দেয়, খানিকটা মুগুর ভাঁজে। ছোলা খায়; দাড়ি কামায়; বাজার যায়; স্নান করে আসে গঙ্গায়; সাদাকে বলে সাদা, কালোকে বলে কালো। কোনো ইজমের ধার সে ধারে না। চোরকে সে সর্বহারা বলে ক্ষমার চক্ষে দেখে না, আবার ধনীদের ধন-সম্পদকেও পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের পাওনা বলে মনে করে না। আবার বড়লোকের দানে কোনো সৎপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে সেটাকে সে বদমাইশি চাপা দেবার ধাপ্পা বলেও মনে করে না। রেশন বিভাগে সহকর্মীদের মধ্যে অনেক বামপন্থী আছে—তারা প্রতুলকে বলে—ষণ্ড! প্রতুল নিজের কানে না-শোনা পর্যন্ত প্রতিবাদ করে না; কেউ কানে তুলে দিলে বলে—আরে যানে দেও ভাই—ভুখনে দো! ওই ওদের স্বভাব।

তবে—। হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে বলে—পাষণ্ডদের বলে দিয়ো—নিজের কানে যেদিন শুনব, সেদিন—। তর্ক আমি করি না সে তুমি জান। আমি ঘুষি মেরে দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেব। আমি কাউকে গাল দিই নে। গাল দিলে সহ্যও করিনে। ঘুষি মারি। আর মারলে আস্তে মারিনে। জোরে মারি। তাতে অনেকের দাঁত উড়ে গেছে। বেনারসে গেলেই খবর পাবে।

বাঙালীটোলায় প্রতুলের নাম এখনও লোকে ভুলে যায়নি। এখানেও লোকে জেনেছে—আমার পাড়ায় গেলেই খবর পাবে।

এ সব কথা তার বাড়িয়ে বলা কথা নয়, বরং খানিকটা কমিয়ে বলে প্রতুল। একালে প্রতি পাড়াতেই বহুবিধ মতবাদের আড্ডা। যে-কোনো বড় রাস্তার ধারে কোনো একটা ভাল বাড়ির দেওয়ালের দিকে তাকালেই এ প্রমাণ মেলে। কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ, কম্যুনিস্ট পার্টি, সোসালিস্ট পার্টি, কৃষক-প্রজা-মজদুর, আর. এস. পি, আর. সি. পি. আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরোওয়ার্ড ব্লক—তার সঙ্গে আরও অনেক ব্লক পার্টি সঙ্ঘের ইস্তাহার পাশা-পাশি দেখতে পাওয়া যায়। প্রতুল মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে সবগুলোর উপরেই নজর বুলোয় এবং হেসে বলে—কালি-কাগজ-ময়দার-আটা আর পরিশ্রম নষ্ট। র‍্যাশনের ময়দায় লোকের পেট ভরছে না, আর ময়দার এই অপচয়। অন্ততঃ এরই জন্যে পানিশমেণ্ট হওয়া উচিত।

বলেই চটি পট পট করতে করতে চলে যায়। আশপাশে বাম-ডান যে পন্থী যেমন তরুণই থাক—প্রতুলের সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। করে লাভ নেই এবং চায়ও না কেউ।

কারণ রাত্রি দুপুরে পাড়ায় কারও কোনো বিপদ শুনতে পেলেই প্রতুল এসে হাজির হয়।

চোরের উপদ্রবে প্রতুল দল সংগ্রহ করে পাড়া পাহারা দিয়ে ফেরে। প্রতুলের খবরদারীতে পাড়ার পার্কটা নিরুপদ্রব হয়েছে। মধ্যে সন্ধ্যার মুখে ভিন্ন পাড়া থেকে অনেক বায়ুসেবীর আবির্ভাব হত। দু-একদিন দেখেই প্রতুল সজাগ দৃষ্টি মেলে ঘুরতে লাগল। নজরে এল জনদুয়েক শেঠ, জন চারেক হাফসার্ট ফুলপ্যাণ্ট পরা তরুণ। একজন পক্ককেশ সম্ভ্রান্ত-দর্শন প্রৌঢ়—একজনের গালে সশব্দ চপেটাঘাতে পার্কের ভিড় কমিয়ে ফেললে। দুটি বেণী ঝুলানো তরুণীকে তিরস্কার করে বললে—ফের যদি এ পাড়ায় বা এখানে ঘুরতে দেখি তো ভাল হবে না।

একটি মেয়ে সাহস করে বলেছিল—কি করব? খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো।

প্রতুল বলেছিল—কে বললে বাঁচতে হবে! মরে যাও। গলায় দড়ি দিয়ে।

—কেন? তা কেন দেব?

—দিয়ো না। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে সৎপথে হাঁটতে হবে। সন্ধ্যার পর বেণী ঝুলিয়ে ঠোঁটে রং মেখে পার্কে বা এ পাড়ায় হাঁটা চলবে না।

—কি করবেন? পুলিশে দেবেন? দিন।

—পুলিশে তোমাদের মধ্যে মধ্যে ধরে নিয়ে যায় সে জানি। খবরের কাগজে দেখেছি। নিজে স্পেশাল কনস্টেবল, সুতরাং ভিতরের খবর জানি—ধরে নিয়ে গেলে, কোথাও থেকে উকিল এসে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। পুলিশে

আমি দেব না। কাল থেকে আমার বোনকে সঙ্গে আনব। আমি যেমন ·ওই· ছোঁড়াদের চাঁড়িয়ে সোজা করেছি সে-ও তোমাদের চড় মেরে সোজা করবে।

প্রতুলের বোন সম্পর্কে প্রতুল বাড়িয়ে বলেনি। ওর বোন অসীমা ঠিক দাদার মতোই। আই. এ. পড়ে, স্কিপিং করে, ছোরা খেলে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতো ঘুরিয়ে কাপড় পরে হন হন করে হেঁটে বেড়ায়। সাহসে-প্রকৃতিতে-মতবাদে সে দাদার অনুগামিনী।

এই তো কিছুদিন আগে কি-একটা উপলক্ষে বামমার্গিণী কয়েকটি অত্যাধুনিকা বাক্স এবং রসিদ-বই হাতে বাড়িতে এসেছিল চাঁদা আদায় করতে। এরা শুধু চাঁদা চেয়েই ক্ষান্ত হয় না, আদায় করে ছাড়ে। বাগ্‌যুদ্ধে এরা অত্যন্ত পারদর্শিনী।

প্রতুল সোজাসুজিই বলেছিল—আমাকে মাফ করবেন।

সবিস্ময়ে একজন বলেছিলেন—আপনি দেবেন না ?

—না।

—কেন ? দেবেন না কেন ?

—সেটা তো আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে না দিতে।

—তার মানে, আপনি পারেন দিতে তবু আপনি দেবেন না। এই তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ তো অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। এত মানে করবার দরকার কি ?

—আছে।

—কি আছে বলুন ?

—এমন ইচ্ছে আপনার হবে কেন ? কোটি কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য—

বাধা দিয়েই প্রতুল বলেছিল—সে কল্যাণের ভার আপনাদের দিলে কে ?

—কে দেবে ? এ কেউ দেয় না। নিজ হতে নিতে হয়।

—আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি কোটি কোটি মানুষের কল্যাণের ধুয়ো তুলে ধুলো উড়িয়ে যারা বেড়ায়, তারা আসলে চায় নিজের কল্যাণ, নিজেদের প্রতিষ্ঠা।

—আপনি বুঝি কংগ্রেসী।

—না।

—তবে হিন্দু মহাসভা ?

—হিন্দু বটে। তবে হিন্দু মহাসভা নই।

অন্য একটি মেয়ে হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বলে উঠেছিল—চল্—চল্। উনি হিন্দু নয়, হিন্দু মহাসভায়েট নয়। কংগ্রেসী নন। কিছুই নন উনি। উনি হলেন রি-অ্যাকশনারি—পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল—উইদাউট এনি হিপোক্রিসি। চল্ চল্।

এবার প্রতুলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। পুরুষ হলে এর জবাব সে দিত হাতে-নাতে। ঘাড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে অবাঞ্ছিত বেড়াল ছানার মতো তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কিন্তু এই নারীবাহিনীর বিরুদ্ধে তার কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মের মতো শরবর্ষণ সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তবুও সে বলেছিল—যাই হই আমি, কারুর বাড়ি গিয়ে তাকে গালাগাল করার মতো প্রগতিবাদী আমি নই, এটা ঠিক। এবং আমার বাড়িতে এসে আপনারা গালাগাল করবেন আর আমি পুণ্যসঞ্চয় করছি ভাবব এমন অতিথিপরায়ণও আমি নই। সুতরাংএবার আপনাদের আসতে অনুরোধ করব।

—অর্থাৎ যেতে বলছেন। বেশ তো তাড়িয়েই দিন না?

ঠিক এই মুহূর্তেই অসীমা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে বলেছিল—সেটা আমি দেব। তুমি বাড়ির ভিতর যাও দাদা। এবং এগিয়ে এসে মুখপাত্রীর হাতখানি খপ করে চেপে ধরে বলেছিল - গালাগাল করছেন কেন? ওই গালাগালি ফেলা-থুতু চেটে তোলার মতো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে, নইলে আমি ছাড়ব না।

বোধকরি অসীমার হাতের চাপ একটু রূঢ় হয়েছিল। মুখপাত্রী মুখ একটু বিকৃত করে বলেছিলেন—কি? মারবেন না—কি?

—সেটা তো গালাগালির পরের পর্যায়। আপনি গালাগালি করেছেন। গালাগালির উপর আমার ঘেন্না আছে। আর ওটাতে আপনাদের দখল বেশি। আমার দখল পরের পর্যায়ে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আমি সেই পর্যায়ে নেমেছি।

—ছাড়ুন। আমি চলে যাচ্ছি।

—উঁহু, সে হবে না। গালাগালি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—ছাড়ুন।

—না।

আরও দুজন এসে এবার অসীমার হাত ধরেছিল – ছাড়ুন।

হেসে অসীমা বলেছিল—একসঙ্গে তিনজনে লড়বেন? তা হলে কিন্তু লড়াইয়ের ধারা পাল্টাব আমি। দুই হাত-পা একসঙ্গে চালাব আমি। আপনারা বরং ভ্যানিটি ব্যাগগুলো রাখুন। ভিতরের আয়না ভেঙে গেলে যাবার সময় মুখে পাফ্ বুলিয়ে চেহারা ঠিক করে নিতে পারবেন না।

ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হত বলা শক্ত। হঠাৎ প্রতুলের মা এসে পড়ে ব্যাপারটায় ছেদ টেনে দিয়েছিলেন। মেয়ে কটি ছাড়া পেয়ে, হুড়মুড় করে না-হোক, বেশ দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে বলেছিল—ফ্যাসিস্ট!

অসীমা বেরিয়ে দরজার গোড়ায় এসে বলেছিল—এবার ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙবে। অ্যাণ্টি-টিটেনাস সিরাম ইন্‌জেকসন নিতে হবে। গালাগাল দিলে আমি তাড়া করব।

এমন ঘটনা অনেক প্রতুলের জীবনে।

এই তিনদিন আগে প্রতুলের অফিস পাড়ার একজন কংগ্রেসী পাণ্ডা এসেছিলেন—তাঁর এই কাজ এখুনি করে দিতে হবে। এবং এই নিয়ে আর. ও. অর্থাৎ রেশনিং অফিসারের সঙ্গে রীতিমতো বাকযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। এবং শেষে বলেছিলেন—আমি ফোন করব এখুনি। বলে টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড কিল মেরেছিলেন।

প্রতুল তৎক্ষণাৎ এসে তাঁর হাত ধরে টেনে বাইরে এনে বলেছিল—বাইরে গিয়ে ফোন করুন বাড়ির টেবিলে কিল মেরে ভাঙুন গিয়ে। এখানে বেশি চেঁচাবেন না। please—please.

এই ইলেকসনের সময় পাড়ার কংগ্রেস অসীমাকে বলেছিল কংগ্রেসের কাজ করবার জন্যে। কিন্তু প্রতুল বলেছিল—মোটা খদ্দর আমি বা অসীমা কেউ পরতে পারিনে। ভোট ক্যানভাস করবার জন্য খদ্দর পরতে পারবে না অসীমা। তাছাড়া ও আবার স্পোর্টস কম্পিটিশনে নাম দিয়েছে। টো-টো করে বেড়িয়ে শরীর খারাপ করতে পারবে না। ও-সব হবে না।

এই মানুষ প্রতুল। সে শুধু নিজেই এই ধারায় মানুষ নয়। তার ধারাতেই সে নিজের সংসারে, আপনার আশপাশটুকুকেও যথাসাধ্য মনের মতো করে গড়ে নিয়েছে। যা ভাল লাগে তাই করে। তবে তার ভাল লাগার মধ্যে ভাল বোঝার স্থানটা গোড়াতেই। ভাল বোঝার সঙ্গে ভাল লাগার সামঞ্জস্য না ঘটলে ভাল লাগাটাকেই সে মন থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়।

বোন অসীমার বিয়ে দিতে পারলেই আর বুড়ী মাকে ওপারে ভালয়-ভালয় পাঠাতে পারলেই সে মুক্ত-পুরুষ হয়ে উঠবে। তবে কৌপীন পরে বের হবে কি ধুতি পাঞ্জাবি বা পায়জামা শেরওয়ানি অথবা সাহেবি পোশাক পরে বের হবে সেটা ঠিক সে করেনি।

তবে প্রতুল বেরসিক নয়।

রস এবং রসিকতা যদি নির্ভেজাল এবং খাঁটি হয় তবে সেটুকু তার পরম প্রিয় বস্তু। নিজে একটু কাটখোট্টা ধরনের মানুষ বলেই বোধ হয় এই দিকে তার রুচিও আছে, তৃষ্ণাও আছে। সকালবেলা উঠেই কি শীত কি গ্রীষ্ম গঙ্গাস্নান সেরে এসেই আসনে বসে একালের সংজ্ঞায় প্রতিক্রিয়াশীলের মতো গীতাপাঠ সে নিত্যনিয়মিতই করে, আবার সন্ধ্যার পর আরাম করে বসে একটা বড় কাপে চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে পরশুরামের 'গড্ডলিকা' বা 'কজ্জলী' কি এই ধরনের সরস-মধুর রসের কোনো বই পড়ে খিল খিল করে হাসে। বাড়ির ছাদে অনেকগুলি মাটির টবে এবং বড় চৌকো প্যাকিং বাক্সে ফুলের গাছের শখেও প্রতুলের রস-পিপাসার কিছু পরিচয় আছে।

ঠিক এই কারণেই পঞ্জাবী বুড়ীর সরস কথাগুলিতে তার এই মেয়েটির

সন্ধানে আসার ব্যাখ্যায়, যে বক্র ইঙ্গিতই থাকুক তাতে সে রাগ করলে না। সে-ও হাসলে।

বুড়ী তখনও হা-হা করে হাসছিল।

প্রতুল হেসে বললে—এ কথা যখন বললে তুমি, তখন তোমার ছবি আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তোমার মতো মিঠি মিঠি বাত যে বলতে পারে, নাই বা থাকল তার নওজোয়ানীর উমর। তোমার এই সফেদ চুলে, এই নানীয়ার মতো চেহারায় যে কি এক আলাদা সুরত আছে সে সেইদিন তোমাকে দেখিয়ে এর পাল্টা জবাব দিয়ে যাব। দেখো, যেন সেদিন আবার তুমি সরমকে মারে সফেদ চুল ঢাকবার জন্যে ওড়নাটা আলনা থেকে টানাটানি করো না। আচ্ছা, আজ চলি।

বুড়ী খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে বলে—বস, বস বাবুয়া, একটু বস। তোমাকে এক গ্লাস লসসি খাওয়াব আমি। এই ধুপের তেজ। এর মধ্যে তুমি এসেছ—তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে! এতক্ষণ আমি বলতাম, কিন্তু সাহস পাইনি বাবুয়া। তখন 'বাবুজী' বলেছি। 'হুজুর' বলেছি 'বাবুয়া'। বস!

বুড়ী শুধু তাকে পরিপাটী করে তৈরি-করা ঘোলের সরবৎই খাওয়ালে না! চমৎকার একখিলি পানও খাওয়ালে। বললে—এইবার তোমার ছুটি। দুনিয়াতে ভাল কথাই হল সবের সার। যে ভাল কথা তুমি বললে। তার বদলে এ গরীব বুড়ীয়া তোমাকে কি দিতে পারে? দুনিয়াতে কোনো দৌলতই তো আমার নাই। প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

প্রতুল মুহূর্তে আবার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে ছবি তুলে নিল।

বুড়ীর ওখান থেকে বেরিয়ে প্রতুল গেল ময়দানে।

গ্রীষ্মকালের ময়দান। ওপাশে চৌরঙ্গীর রাস্তার পিচ গলে উঠেছে। ফুটপাথ প্রায় জনহীন। বড় বড় দোকানগুলোর দরজায় দরজায় খশখশের পর্দা ঝুলছে। ট্রাম-বাস চলছে—সেগুলিও প্রায় খালি। ময়দানেও লোক বড়-একটা নেই। মনুমেণ্টটা দাঁড়িয়ে যেন পুড়ছে, আর একটু দক্ষিণে বড় বড় গাছের ছায়া। সেখানে দু-দশজন লোক, কেউ দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। কেউ বসে আছে, দু-চারটে ছাগল গরু ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে, চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট একটা ছাগলছানা শৈশব-চাপল্যে তড়াক-তড়াক করে আপন মনেই লাফাচ্ছে।

প্রতুল ছাগল ছানাটার একটা ছবি তুলে নিল। ঘুমন্ত লোকগুলিরও ছবি তুললে। আরও দক্ষিণে যাদুঘরের ওখানে লোকজন কিছু রয়েছে। যাদুঘর দেখতে এসেছে সব। গ্রাম্য মানুষ এবং বেহার উত্তর প্রদেশের লোকই বেশি। রঙীন কাপড়গুলি গ্রীষ্মের দুপুরের রৌদ্র যেন একটু উগ্র হয়ে উঠেছে। সামনে এপাশে গাছের ছায়ায় ফেরিওয়ালারা খাবার বেচছে। লিমনেড সোডা

সরবতের দোকান, আইসক্রীমের গাড়ি-বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইসক্রীম ওয়ালারা। দু-তিনটে জলসত্রও রয়েছে।

এদিকে ওদিকে খেলার মাঠের সবুজ তাঁবুগুলি ধুলো পড়ে ধূসর দেখাচ্ছে। দুটো-একটার উপর নতুন সবুজ রং দিয়েছে সেগুলো যেন ঝলছে।

মিউজিয়মের কার্নিসে কার্নিসে কয়েকটা বাঁদর বেড়াচ্ছে। একটা বাঁদরের মাথার উপর দুটো কাক উড়ছে, সুবিধে পেলেই ঠোকর মারছে। বাঁদরটা কখনও উঠে দাঁড়াচ্ছে। কখনও মাথা নামিয়ে নিচ্ছে। কখনও লাফিয়ে সরে গিয়ে হাত দুটোতে ভর দিয়ে পা দুটো নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করছে।

প্রতুল দেখতে দেখতে ছবি তোলায় মশগুল হয়ে গেল।

পঞ্জাবী বুড়ী থাকল তার ক্যামেরার কাঁচা নেগেটিভে। মেয়েটাও থাকল নেগেটিভে। ওর নেগেটিভটা ডেভেলাপ করা। খামের মধ্যে পকেটে রয়েছে সেটা।

মানিকতলার খালের ধারে গলির মধ্যে পাঁচ ইঞি ইটের দেওয়াল, পাকা মেঝে, অ্যাসবেস্টসের-ছাউনি দু-খানা ঘর বারান্দা ঘেরা,—রান্নাঘর-কল-বাথরুম—নিয়ে বাসাটির স্বাচ্ছন্দ্য কম। কিন্তু এদিকে দেখতে ঝকঝকে। উত্তর-মুখী ঘর বারান্দা। গ্রীষ্মকালে রোদে তেতে একেবারে যেন অগ্নিগড় হয়ে উঠেছে। আশেপাশে বস্তী এবং কারখানা আর গুদাম। বিকেল হয়ে এসেছে, তবু গ্রীষ্মের অবসন্নতা কাটেনি। এখনও বস্তীজীবন কোলাহল ও কলহমুখর হয়ে ওঠেনি। কলে জল আসেনি এখনও। বস্তী থেকে দু-একজন করে ঘড়া-বালতি-কলসি নিয়ে সদ্য এসে দাঁড়াচ্ছে। কলের মুখ থেকে পরের পর সাজিয়ে রাখছে।

এরই মধ্যে ওই পনেরোর-দশের-সি-এর দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। সারকুলার রোডের দোকানের সেই কালো মেয়েটি একখানা ঘরের মধ্যে বসে পড়ছিল অর্থাৎ রীতিমতো লেখাপড়া করছিল। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে চকিত হয়ে মুখ তুলে এক মুহূর্ত শুনে ভুরু কুঁচকে উঠে বেরিয়ে এল। কড়া নাড়ারও একটা ঢং আছে—প্রতিটি মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো প্রতিটি জনের কড়া নাড়ার শব্দেরও একটা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। শব্দটা অপরিচিত মনে হল তার।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সে সে প্রশ্ন করলে—কে?

—হামি রে মেইয়া। নানীয়া।

—নানীয়া? বিস্মিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে!

—তুই? তুই কি করে এখানে এলি? ঠিকানা পেলি কি করে?

হেসে পঞ্জাবী বুড়ী বললে—আমি মন্তর শিখে ফেলেছি মাইয়া। সেই মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলাম এই তসবীর। বললাম—চল্ তো তসবীর, কাঁহা গয়ি মেরি রাধা, বাতা দে তো পাতা। তসবীর চলতে লাগল—আমি পিছে পিছে চলে এলাম।

বলে তারই সেই ফটোখানি তার সামনে ধরলো।

অবাক বিস্ময়ে মেয়েটি ছবির দিকে চেয়ে রইল। মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখে ফুটে উঠল ওই ছবির মতো হাসি ও প্রসন্ন মাধুর্য।

অনেকক্ষণ পর সে বললে—এ ছবি তুই কোথা পেলি? ও, সেই ভদ্রলোক তোর ওখান পর্যন্ত গিয়েছিল বুঝি।

—আমার ওখানে কেন যাবে? তোর ওখানে গিয়েছিল।

—হুঁ। কপালে তার বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল—কি রকম ভদ্রলোক?

বুড়ী প্রতিবাদ করে উঠল—না, না, না। ও কথা বলিস নে। ভারি ভাল লোক সে। আমার তসবীর তুলে নিয়ে গেছে। বলে গেছে দিয়ে যাবে। তোর তসবীর তুলেছে, তোকে দিতে এসেছিল। দোকানে পায়নি। গিয়েছিল ওখানে। আমি নিয়ে নিলাম ছবিখানা। তোর ছবি তোকে তোর দোকানে দিয়ে যাবে। বড় আচ্ছা আদমী, সাচ্চা মানুষ। কিন্তু তুই আমাকে তোর নতুন ঘর-দোর দেখাবিনে? আমি কি তোর মনের মানুষ—মহব্বতির পিয়ারা সাহেবকে ছিনিয়ে নেব, মনে হচ্ছে তোর? সে কই, দেখা আমায়?

—ও কে কৃষ্ণা? পিছনে ঘরের দরজা খুলে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

বুড়ী একটু বিস্মিত হয়ে গেল। এ আবার কে? এমন ঢং-এর মেয়ে এখানে কেন? ববছাঁটা-চুল ভুরু-কামানো, অত্যন্ত রংচং-এ একখানা শাড়ির আধখানা কোমরে জড়ানো রয়েছে—বাকিটা মাটিতে লুটচ্ছে, গায়ে ব্লাউজ অবশ্য আছে; মেয়েটা বোধহয় ঘুমচ্ছিল, সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। মেয়েটির মুখে-চোখে একটি অবসন্নতার ছাপ পড়েছে। রংটা মেয়েটির পরিষ্কার—সে রং যেন রক্তহীনতায় সাদা হয়ে গেছে।

পঞ্জাবী বুড়ীও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে। ও কে মেইয়া?

পিছন থেকে মেয়েটি বললে, অ। ও বুঝি সেই তোমার পঞ্জাবী বুড়ী।

—হ্যাঁ।

—ও এখানে এল কেন? উনি জানলে কিন্তু রাগ করবেন ভাই। তুমি শীগ্‌গির ওকে বিদেয় কর। কখন আবার এসে পড়বেন, সঙ্গে হয় তো প্রডিউসার কি ডিরেক্টার থাকবে, কি মনে করবে তারা?

কৃষ্ণার ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একবার ঘুরে তার দিকে তাকালে, তারপর বুড়ীর দিকে ফিরে চেয়ে বললে, ওর কথায় তুই কিছু মনে করিসনে নানী।

বুড়ী হেসে বললে। কি মনে করব মেইয়া? ও ছোকরী তো ঠিক বাত বলেছে ভাই। ভদ্দর আদমী বড়া আদমী যারা, তারা তো আমাকে দেখে খুশি হবে না। জরুর পুছবে ও এখানে কেন? আমি ভাই থাকব না, বসব না, তোর ঘর-দোর দেখতে এসেছি। কেমন ঘর পেতেছিস। কিন্তু ভাই মনে যে ধাঁধা লাগছে। ও ছোকরী কে?

একটু চুপ করে থেকে বিচিত্র হাসি হেসে কৃষ্ণা বললে, ও হলো সেই ওস্তাদের স্ত্রী।

সেই ওস্তাদের বহু? সেই ওস্তাদ, যে তোর মনের মানুষ? যার সঙ্গে তুই সেদিন এখানে চলে এলি।

—হ্যাঁ নানী।

—তবে?

—কি তবে নানী?

—তবে তুই এ কি করলি? কেন এলি?

একটু হেসে কৃষ্ণা বললে, তার বড় দুঃসময় নানী। রোজগার নেই। গান গেয়ে টাকা পায়। কিন্তু আগে থেকেই সে টাকা অগ্রিম নিয়ে খরচা করে বসে আছে। অনেকের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে। তারপর দেখেছিস তো ওর বউয়ের কি অবস্থা? আসছে মাসেই বোধহয় প্রসব হবে। বুঝতে তো পারিস। তোদের দেশেও ছিল, যারা গান গায়, গীত বানায়, ছবি আঁকে, বই লেখে—এরা হয় দুনিয়ার মোহিসেবী মানুষ। আসলে একেবারে ছেলেমানুষ। এ মানুষটাও তাই। ওই যে মেয়েটি দেখছিস, ওকে সে গান শেখাত, তারপর মেয়েটি ভালবেসে ফেললে। সে কি কান্না। বলে, জহর খেয়ে মরবে। কাজেই হিসেব করলে না। বললে যা হয় আমার ভাগ্যে হবে, তোমাকে জহর খেতে হবে না। আমি নিয়ে করছি তোমাকে। এখন জ্বলে মরছে। শুনলি তো ওর কথাবার্তা।

ঠিক এই মুহূর্তে গলির মোড়ে মোটরের হর্ন শোনা গেল। গ্যাস ছেড়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করলে যেন।

কৃষ্ণা মেয়েটি চকিত হয়ে বললে, ওই বোধ হয় এল।

ইঙ্গিতটা বুঝলে পঞ্জাবি বুড়ী। বললে, তবে আমি যাই। কিন্তু তুই ভাই খুব সমঝে চলিস। এ আমি ভাল বুঝতে পারছি না-রে! আমার বহিন, ভাল লাগছে না। মেয়েটি হাসলে, বুড়ী আবার বললে, সেই বাবুটি বলে গেল, কথাটা আমার খুব মনে লাগল। বললে, ফুলের কুঁড়ির ভিতর যে হাসি লুকিয়ে থাকে বুড়ীয়া, সে দেখা দেয় ফোটার বাহারে। মন যদি ফুলের কুঁড়ির মতো খুশি হয়, নরম হয়, তবে হাসলেই ফুল ফোটার বাহার খেলে যায়। কিন্তু সে কুঁড়িতে যদি দুঃখের পোকা ধরে থাকে কিংবা হিংসে ক্ষোভের বিষে জ্বরে গিয়ে থাকে, তবে সে বাহারও পোকায় কাটে। হাসিতে সে সুরত আর ফোটে না। তুই যতই হাসিস, আমি বুঝতে পারছি। আমি বুঝতে পারছি।

—তুই এখন যা বুড়ীয়া। ওরা আসছে।

কৃষ্ণা বুড়ীকে বললে, যারা নাকি গান গায়, গীত বানায়, ছবি আঁকে, বই

লেখে—তারাই দুনিয়ার বেহিসেবী মানুষ। কথাটা সত্যি-কি-মিথ্যে সে নির্ধারণ করা খুব একটা বড় হিসেবসাপেক্ষ। দুনিয়ায় এ পর্যন্ত যত এই ধরনের মানুষ জন্মেছে তাদের জীবন নিয়ে হিসেব কষতে হয়, দেখতে হয় শতকরা কতজন এরা বেহিসেবী, কতজন হিসেবী। কৃষ্ণা সে হিসেব করেনি কোনো দিন, এবং তার জীবনে যা শিক্ষা-দীক্ষা তাতে দুনিয়ার এইসব মানুষদের জীবন সম্পর্কে তার ধারণা বা জ্ঞান অত্যন্ত সামান্য। তবে এমনি ধরনের একটি ধারণা যে প্রচলিত আছে, সে কেউ অস্বীকার করবে না। এবং এই বেহিসেবীপনা এই সব মানুষের জীবনে চাঁদের বুকে কলঙ্কের ঈষৎ কৃষ্ণাভার মতো অধিকতর মনোরমই করে এসেছে। সে এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ—সব দেশেই। ও-সব দেশের কথা কৃষ্ণা জানে না। এ-দেশের দু-চারজনের কথা জানে। বইতে পড়েছে। সিনেমায় দেখেছে। চণ্ডীদাসের জীবনে রামীকে ভালবাসার বেহিসেব, বিদ্যাপতির জীবনেও ওই বেহিসেব, ছবিতে দেখেছে আর কেঁদেছে। আরও কতজন সম্পর্কে কত কথাই না শুনেছে সে। শুধু কি ভালবাসার বে-হিসেব? টাকা-পয়সার বেহিসেব দেখেছে, পড়েছে সে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-নিয়ে ছবিতে এবং বইয়ে। এই বেহিসেবী লোকেদের মধ্যে একটা যেন যাদু আছে কোথাও। মনে হয় এদের বেহিসেবই অতি কঠিন, অতি নীরস হিসেবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীঘেরা-দুনিয়াকে কোমল সরস এবং প্রসারিত করে দেয় বলেই দুনিয়ার মানুষ বেঁচে আছে। হিসেবের দুনিয়া যেন কবুতরের জন্যে তৈরি-করা ছোট ছোট খুপরিওয়ালা কাঠের প্যাকিং বাক্স। সেই বাক্সে বন্ধ বন্দী পায়রার মতো মানুষ অকস্মাৎ যখন এই বেহিসেবী মানুষদের আকাশচারী পারাবতের মতো মুক্তপক্ষ বিস্তার করে উড়তে দেখতে পায় তখন জীবন মুক্তির আশায় ভোর হয়ে যায়। চোখে রঙীন নেশা ধরে। জীবনে নতুন স্বাদ অনুভব করে।

এমন মানুষ কৃষ্ণা ছবিতে দেখেছে। বইয়ে পড়েছে তাদের কথা। একালের রক্ত মাংসের দেহধারী দু-একজনকে দূর থেকে চোখে দেখেছে। লোকের কাছে তাদের গল্প শুনেছে; কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া কারও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেনি। সে মানুষ এই মানুষটি। একাধারে কবি ও গায়ক। নিজে গান তৈরি করে তাতে সুর যোজনা করে গেয়ে বেড়ায়।

প্রথম কৈশোরে ওর সঙ্গে তার পরিচয়।

ঢিলে কড়া-ইস্ত্রি ধপধপে পায়জামা পরনে। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল-পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে কাবলী জুতো। কোনো-দিন-বা তালতলার শুঁড়-তোলা লাল-চটি, কোনো দিন বা কটকী চটি, মাথায় অবিনস্ত লম্বা রুখু চুল। দীর্ঘাকৃতি এই লোকটি একদিন ওদের পাড়াটা প্রায় তোলপাড় করে তুলেছিল গানের সুরে। বছর আষ্টেক আগে। কৃষ্ণার বয়স তখন চোদ্দ।

কলকাতার উত্তর-প্রান্তে করপোরেশনের শেষ সীমার এ-পারে ও-পারে তখন

বস্তী বাগান ভেঙে নতুন নতুন কলোনী গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তেমনি একটি কলোনী। পল্কা-হাল্কা ছোট ছোট বাড়ি। থার্ডক্লাস ইট এবং মসলায় তৈরি-করে নানা ব্যবসায়ী- প্রতিষ্ঠান সস্তা কিস্তিতে বিক্রি করছে। বড় রাস্তা থেকে দশ ফুট পনের ফুট রাস্তা টেনে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সঞ্চয়ী গৃহস্থেরা বাসাবাড়ি ছেড়ে নিজের ঘর কিনে সেখানে এসে কল্পনা করেছে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সুখে ভোগ-দখল করবে। এই পল্লীতে কৃষ্ণার বাপের বাস ছিল। কৃষ্ণাই বাপ, মা, এক ভাই, চার বোন। ভাই সব থেকে বড়। বোনেদের মধ্যে বড়। সামনে করপোরেশনের বড় রাস্তাটার ওপারে ছিল কৃশ্চান মিশনারীদের গির্জে, অরফ্যানেজ—অরফ্যান ছেলেদের জন্যে একটা কারখানা এবং একটা ইস্কুল। ওই কারখানায় বড় ভাই কাজ শিখত। বোনেরা ওই ইস্কুলে পড়ত। সে পড়ত কিছু দূরের গার্লস হাই স্কুলে। মিশনারীদের ইস্কুল থেকে সে তখন ওখানকার পড়া শেষ করেছে। মিশনারী ইস্কুলের বড় মেমসায়েবই তার ইস্কুলের খরচ যোগাতেন। নিজে থেকে দিতেন। কৃষ্ণা পড়াশোনায় ভাল ছিল। মেম তাকে বড় ভালবাসতেন।

কলোনীর চারিদিকে প্রাচীন কলকাতার শহরতলীর পুরানো পাড়া। লোনাধরা দেওয়াল। ফাটধরা ছাদ, বাড়ি, সরু আঁকাবাঁকা গলি। একহাঁটু খাল ড্রেন; অধিকাংশ বাসিন্দাই ছোটোখাটো চাকুরে। দশটায় অফিস যায়। পাঁচটা-ছটায় ফেরে। তারপর এখানে ওখানে বড় জোর তাশ বা পাশার আসর বসে—এই পর্যন্ত। এ ছাড়া স্তব্ধ হয়ে থাকে সব। ইলেকট্রিকও তখন এমন ছড়ায়নি, ছড়াবার মুখেই যুদ্ধের বাধায় আটকে গেছে। অধিকাংশ ঘরেই কেরোশিনের আলো, রাস্তায় দূরে দূরে গ্যাসবাতি রাত্রের অন্ধকারকে আবছা করে দিয়ে আরও গা ছম্‌ছম্‌ করে তোলে, লোক দেখা যায়—চেনা যায় না, বোঝা যায় না—চোর কি সাধু! কলোনীটা একেবারে অন্ধকার। ওখানকার রাস্তা করপোরেশন হাতে নেয়নি, কাজে-কাজেই গ্যাসবাতিও ছিল না।

এই কলোনীতে সদ্য তৈরি গোলাপী রঙের সবচেয়ে ফ্যাশনেবল বাড়িখানায় এল একটি পরিবার। বাড়িখানার সামনের অংশটা গোল, ছাদের আলসেটা কাটা-কাটা। সব মিলিয়ে দেখায় যেন পুরনো আমলের দুর্গের মতো। আর সিঁড়ির সামনেটা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জাফরী কাটা। বড় চটকদার বাড়ি। এবং বাড়িটির মতোই বাড়িতে আগন্তুক পরিবারটিও চটকদার, ফ্যাশনেবল। সরকারী চাকুরে ছিলেন কর্তা। সার্কল অফিসার ছিলেন—রিটায়ার করে বাড়িটি কিনে এসে উঠলেন। সঙ্গে দুই মেয়ে এবং স্ত্রী। কর্তার পরনে ঢিলে পায়জামা, হাফ শার্ট, স্ত্রী মোটাসোটা, পাকা চুলে পাতাকেটে চুল বাঁধতেন, ফেরতা দিয়ে রঙীন কাপড় পরতেন, মেয়েদের চুল রুখু—স্যাম্পু করত, হাত খালিই থাকত, বের হবার সময় বাঁ-হাতে কালো ফিতে এঁটে-বাঁধা রিস্টওয়াচ, ঠোঁটে দিত লিপস্টিক এবং মুখে পাউডার।

বাড়ি সামনেটা আধা গোল—ঐ বের-করা গোল অংশটার দু-পাশে দু-খানা বড় মাদুরের মতো দু-টুকরো পতিত জমি পড়ে ছিল, মাপে দশ ফুট-বাই ছ ফুটের বেশি নয়, তারই এক টুকরো ছিল লন, এক টুকরো ছিল বাগান। বিকেলে এই লনে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে চায়ের আসর পড়ত। মেয়েরা খিলখিল করে হাসত। গিন্নী কুরুশকাঁটায় কিছু বুনতেন, কর্তা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়তেন। বাড়িতে ইলেকট্রিক হয়নি। রাত্রে একটা জোরালো গ্যাসের লণ্ঠন জ্বালা হত। ব্ল্যাক আউট তখন হয়েছে। জানলায় নীল পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রে মেয়েরা অর্গান বাজিয়ে গান করত—আধুনিক গান। এবং এই গীতিকারের গানই বেশি গাইত। কাজী নজরুল ইসলাম তখন আধুনিক সঙ্গীতে যেন জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। লিখতেনও না, বেশি লিখতেন শ্যামা সঙ্গীত। কাজী সাহেবের স্থান তখন ইনিই যেন পূর্ণ করতে আবির্ভূত হয়েছেন। অন্য গীতিকারেরা নাগাল পাচ্ছেন না এঁর। তাঁরা শুধু গানই লেখেন, সুর দিতে পারেন না।

ওঁর আসল নাম কি সে কৃষ্ণা আজও জানে না। গীতিকার ও সুরকার আনন্দ রায় তখন সন্ধ্যার আকাশে শুক্রগ্রহের মতো উঠতে শুরু করেছেন। আজও কৃষ্ণা তাঁকে আনন্দ রায় নামেই জানে। আসল নাম সে আর জানতেও চায় না। কি হবে জেনে? আনন্দ রায় সত্যই আনন্দের রাজা।

আনন্দ রায়ের নিজের কণ্ঠে মধু আছে, তাঁর সুরের জালে যাদু আছে, তাঁর বাক্য এবং ভাব যোজনায় স্বপ্ন আছে কিন্তু ওই আগন্তুক পরিবারের মেয়ে দুইটির না ছিল গলা, না ছিল গানের ব্যাকরণে জ্ঞান, যার ফলে সুন্দর গান কদর্য হয়ে উঠত। পাড়ার লোকেরা প্রায় তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল কয়েক দিনের মধ্যেই। কৃষ্ণাও হয়ে উঠেছিল। আর তেমনি ছিল মেয়ে দুটোর কথায় তিক্ততা।

কৃষ্ণা যাচ্ছিল ইস্কুলে। স্কুল ছিল সকাল বেলায়। ওই নূতন পরিবারটি বাড়ি আসবার দিন-দুই পরেই বোধ হয়। মেয়ে দুটি ভোরে উঠে ওদের সেই মাদুর-পরিমাণ টুকরো জমিতে বাগান করতে শুরু করেছে সেদিন। বাখারির বেড়ার মধ্যে খুরপি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল। তার অপরাধের মধ্যে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বড় মেয়েটা তাকে ডেকেছিল—এই! কি দেখছিস দাঁড়িয়ে।

অপ্রস্তুত হয়ে কৃষ্ণা চলে যাচ্ছিল।

ছোটটা আবার বলেছিল, এই মেয়েটা, কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিস যে? অ্যাঁ?

কৃষ্ণা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনম্র কণ্ঠেই বলেছিল, আপনারা কি করছেন দেখছিলাম।

—দেখতে পাচ্ছিস নে, বাগান করছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোদের বাড়িতে বাগান নেই? উঠোনে গাছপালা পুঁতিস নে?

—না।

—কেন? জায়গা নেই? একটুও নেই?

—না।

—টবে গাছ পুঁতিস নে কেন? গাছ পোতা খুব ভাল। বুঝলি।

কৃষ্ণা এবার বলেছিল, আমরা খুব গরীব।

—তাতে কি হল? ফুল হলে গরীব বড়লোক সমান আনন্দ পায়, বুঝলি? তোর নিজের ফুল ভাল লাগে না?

—তা লাগে। কিন্তু টব-ই বা পাব কোথায়?

—মাটির হাঁড়িতে পুঁতিস। ভাঙা বালতিতে পুঁতিস। চারা নিয়ে যাস আমাদের কাছে।

হেসে কৃষ্ণা চলে যাচ্ছিল। আবার তাদের একজনকে ডেকে বলেছিল, শোন, শোন।

—আমার ইস্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—কোন ক্লাশে পড়িস?

—ক্লাশ এইটে।

—ক্লাশ এইটে! কিন্তু মাথায় এত তেল দিস কেন? ওই তো তোর কালো রং। তারও উপর তেলে চুল কপাল চকচক করছে বার্নিসের মতো। যেন রোদ্দুরে অ্যালকেটুরা। আলকাতরা-রে-আলকাতরা।

ছোট মেয়েটা আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল!

কৃষ্ণার চোখে সেদিন জল এসেছিল। তাড়াতাড়ি সে চলে গিয়েছিল।

তার পরের দিনও আবার দেখা হয়েছিল। সেদিন বড় মেয়ে ডলি তাকে ডেকেছিল। এই কেলে মেয়েটা, কথা না বলে চলে যাচ্ছিস যে?

সেদিন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কেন বলুন তো?

—ও-রে বাপ রে, তুই যে একেবারে ফোঁস করে উঠলি রে!

—হ্যাঁ। কালো সাপের বিষ বেশি জানেন তো।

ও-রে মা। গালে হাত দিয়ে ডলি বলেছিল, কালো মেয়ে বলায় রাগ করেছিস বুঝি? কিন্তু তুই তো কালোই।

—হ্যাঁ। কালোই। কিন্তু কেলে নয়। কেলে হয় কুকুর। তা ছাড়া আমার একটা নাম তো আছে। আপনাদের ওই তো কণ্ঠা-বের-করা চেহারা। যদি হাড়গিলে কি ফড়িং বলে ডাকি আমি?

কৃষ্ণা আবার চলতে শুরু করেছিল। এর পর আর দাঁড়ানো কি যায়? আবার কিন্তু ওদের ছোট বোন বেবী তাকে ডেকেছিল, ও ভাই। শুনুন—শুনুন। শুনুন না ছাই, রাগ করেন কেন?

—বলুন।

—আপনার নামটি কি ভাই? আমার নাম বেবী, দিদির নাম ডলি।

এইবার আপনার নামটা দয়া করে বলুন।

কৃষ্ণা বলেছিল, আপনাদের নাম আমি জানি। দিন রাত্রি আপনার বাবা মায়ের হাঁক শুনছি। আমার নাম রেণু।

—সুন্দর নাম, চমৎকার নাম। কিসের রেণু ভাই? কোনও ফুলের, নীল অপরাজিতার?

—না। গরীবের মেয়ে। আপনাদের, মানে বড়লোকের চরণের রেণু ধরে নিতে পারেন। আমার বাপ মায়ের কাছে অবশ্যি আমি শুধুই রেণু।

চলে গিয়েছিল সে। আর কোন মতেই দাঁড়ায়নি। এবং পরের দিন থেকে সে রাস্তা বদল করেছিল। অন্যপথ দিয়ে ইস্কুলে যেত।

তার নাম কৃষ্ণা নয়। তার নাম রেণু। রেণু ঘো—। না—থাক্, সে পরিচয় থাক্। কৃষ্ণা নাম তাকে দিয়েছিলেন আনন্দ রায়। কালো বলেই নাম দিয়েছিলেন কৃষ্ণা। ওই মেয়ে দুটো তাকে ডেকেছিল, কেলে মেয়েটা বলে; ঠিক সেই কারণেই আনন্দ রায় তাকে বলেছিলেন, তোমার নাম তো রেণু হতে পারে না। তোমার নাম কৃষ্ণা। তুমি কালো মেয়ে, তোমার এক-পিঠ ঘন কুঞ্চিত কালো চুল, অমাবস্যা রাত্রির মতো। ফুলে ফেঁপে ওঠে খোলা থাকলে। তুমি কৃষ্ণা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা। সেদিনও তার চোখে জল এসেছিল। কিন্তু দুঃখে নয়। বেদনায় নয়। আনন্দে, সুখে। মনে হয়েছিল, কৃষ্ণা নাম করণের জন্য সে যেন অকস্মাৎ অপরূপা হয়ে উঠেছে।

আনন্দ রায় কিন্তু এ পাড়ায় এসেছিলেন ওই ডলি বেবীদের বাড়িতেই।

মনে পড়ছে সেদিনের কথা। সেদিন রাত্রে ডলি বেবীদের বাড়িতে আনন্দ রায়ের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ পাড়াটায় সুরের বন্যা বইয়ে দিয়ে সকলকে জাগিয়ে রেখেছিল রাত্রি দু-প্রহর পর্যন্ত। পাড়ার প্রতিটি বাড়ির জানলা খুলে গিয়েছিল। প্রতি জানলায় মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেরা এবং বয়স্কদের অনেকে নতুন বাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গান শুনেছিল। তার দাদাও গিয়েছিল গান শুনতে। সে তাদের ভাঙা জানলায় দু-প্রহর রাত্রি পর্যন্তই জেগে বসেছিল। দাদা ফিরে এসে বলেছিলো, ক্যাইসা গান, শুনলি?

—কে দাদা?

—**The Magical musician,** বল তো কার গান? রেডিওতে গায়। গ্রামোফোন রেকর্ড আছে।

কি করে বলবে কৃষ্ণা? বাড়িতে রেডিয়ো গ্রামোফোন কোথায় সে শুনবে। আনন্দ রায়ের গলা। আনন্দ রায় এসেছে ওদের বাড়িতে।

পরের দিন সকালবেলা কৃষ্ণা অনেকদিন পর আবার ডলি বেবীদের বাড়ির পাশ দিয়ে ইস্কুলে গিয়েছিল—যদি আনন্দ রায়কে দেখতে পায়।

রাত্রে সে অনেকক্ষণ ঘুমুতে পারেনি। চোখ বুজলেই কানের পাশে যেন আনন্দ রায়ের গান শুনতে পাচ্ছিল।

দাদাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—আনন্দ রায়কে দেখেছ দাদা।

—না। বাড়ির মধ্যে গাইছিল, কি করে দেখব? তবে ছবি দেখেছি।

—আছে তোমার কাছে?

—নাঃ। সে তো গ্রামোফোন রেকর্ডের বিজ্ঞাপন। বেশ হ্যাণ্ডসাম লোক। বেশ লম্বা। টল ফিগার।

—আজ ওদের বাড়ি থাকবে। না?

—থাকবে কেন? চলে যাবে। ওরা হল সেলিব্রিটির দল। ট্যাক্সি ডাকবে। চলে যাবে।

তা বটে। রাত্রি হয়েছে। বাস চলছে না বলে ওরা থাকবে কেন? ট্যাক্সি ডাকবে, চলে যাবে। তবু ভোরবেলা উঠে ইস্কুলে সে ওই পথেই গিয়েছিল এবং আনন্দ রায়কে দেখতেও পেয়েছিল। আনন্দ রায় রাত্রে ট্যাক্সি ডেকে চলে যায়নি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে ওখানেই ছিল। ভোরবেলা ডলি এবং বেবীর সঙ্গে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। চলে গেল বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে।

কৃষ্ণা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘাকৃতি আনন্দ রায়কে বড় ভাল লাগল তার। একটা কথা তার কানে এল। পথ চলতে চলতেই কথা বলছিল ডলি এবং বেবী। আনন্দ রায় বার বার মাথা ঝাঁকি দিয়ে লম্বা রুখু চুল-গুলিকে পিছনের দিকে ফেলে তার উপর হাতের তালুর টানে বসিয়ে দিচ্ছিলেন এবং চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে হেসে নিজেই ভেঙে পড়ছিলেন। সে কি উল্লাসের হাসি। কৃষ্ণার মনে হয়েছিল, আনন্দ রায় নাম সার্থক। ওর দাদা রাত্রে বলেছিল, আনন্দ রায়—আনন্দের রাজা। তাই বটে।

আনন্দ রায়ের সঙ্গে ডলি এবং বেবীও পাল্লা দিয়ে হাসতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে হাসি ওরা হাসবে কি করে? সে প্রাণ কোথায়? সমতল ভূমির বাগিচায় পরিপাটী করে কাটা বাঁধানো নালা-নদী আর পাহাড়-ঝরা নদের হাসি কি এক! তবুও সেদিন নদের জল বাগান ভাসিয়ে বাঁধানো নালার জল জুগিয়েছিল বলে ডলি বেবীর হাসিতে জোয়ার ধরেছিল।

ডলি তাঁকে বলেছিল, কেন? সন্ধ্যের সময় আসবেন না কেন? ছটা থেকে আটটা কি সাতটা থেকে নটা।

ঘাড় নাড়লেন আনন্দ রায়। তার মানে উঁ-হু। চুলগুলো মাথার নাড়া খেয়ে এলোমেলো হয়ে গেল। আবার তিনি মাথা ঝাঁকি দিলেন। কিছু বললেন, সে কথাটা শুনতে পেলে না কৃষ্ণা। সেও তাঁদের পিছনেই চলেছিল—সেটা যে তার ইস্কুলের উল্টোদিক সে তার খেয়াল ছিল না।

এ কথার উত্তরে বেবী ডলি সবিস্ময়ে একসঙ্গে সরু গলায় প্রায় চিৎকার

করে বলে উঠল, মেম সাহেব ?

ঘাড় দুলিয়ে হেসে আনন্দ রায় সামনের দিকে ঝুঁকলেন, অর্থাৎ, হ্যাঁ।

তার পর আরও কতকগুলো কথা বলে হাসতে শুরু করলেন। বেবী ডলি দু-জনেই দু-পাশ থেকে তাঁর দুই কাঁধ ধরে আবদারের ন্যাকা সুরে বললে, একবার। একবার। একবার !

এবার আনন্দ রায় গান গেয়ে উঠলেন—বুঝতে পারলে না কৃষ্ণা। সে কি গান। তবে সুরটা দেশী।

পরে আনন্দ রায়ই কৃষ্ণাকে বলেছিলেন সে গানের কথা। আলাপের পর কৃষ্ণা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আনন্দ রায় ডলি ও বেবীকে গান শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। গত রাত্রে ছিল তারই দীক্ষা-উৎসব। নারা বাঁধা। ডলি এবং বেবী চেয়েছিল আনন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আসেন, কিন্তু আনন্দ রায় চেয়েছেন সকালে আসতে। সন্ধ্যায় তাঁর গানের একটি টিউশন আছে। এক খাঁটি মেম সাহেব বাংলা গান শিখছেন। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, মেম সাহেবের গানের কথা। সহজ সুর দেখে আনন্দ রায় মেম সাহেবকে হারমোনিয়মের স্কেল চিনিয়ে রোমান অর্থাৎ ইংরেজি হরফে বাংলা গানখানি লিখে দিয়ে এসেছিলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় গিয়ে বারান্দায় উঠেই শুনলেন, মেম সাহেব গান করছে। সুরটা সেই সুর। নিখুঁতই প্রায় তুলেছে ! কিন্তু গানের ভাষা পাল্টে গিয়েছে। রোমান হরফে বাংলা গান লিখে দিয়েছিলেন—'তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবল সাধের দিন মণি'। **'Timire dhire dhire dublo sadher dinomoni'** ; মেম সাহেব কাগজখানাকে সামনে রেখে গাইছে 'টাই মারা—ঢারা ঢারা ডাবলো সাঢার ডাইনোমনি।'

সে গান শুনে বেবী ডলি হেসে গড়াগড়ি দিতে চেয়েছিল যেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আনন্দ রায় বলেছিলেন, এত না, এত না।

ডলি বেবী থামলে তিনি বলেছিলেন, সন্ধ্যায় না, সকালে। এবং সপ্তাহে একদিন—রবিবার সকালে। তাও মাত্র তিন মাসের কড়ার। তার বেশি না।

—কেন !

—তোমরা যদি অযোগ্য ছাত্রী হও। যদি আমার ভাল না লাগে ! বুঝেছ না ? আমরা হলাম আর্টিস্ট মানুষ। দুনিয়ার নিয়মে তো আমরা চলি না। সে আমাদের—অন্তত আমার পক্ষে অসহ্য। অবশ্য সবটাই নির্ভর করবে তোমাদের ওপর। যোগ্য ছাত্রী হওয়াও বটে, আমার ভাললাগা—তাও বটে। রবিবার সকাল।

—তা হলে এখানে এসে চা খাবেন। আপনি না এলে আমরা চা খাব না।

—উঁ-হুঁ। তা হলে তোমাদের চা খাওয়াই হবে না।

—মানে আপনি আসবেন না।

—আমি আসব। চা খাওয়ার আরামের সময় চলে যাবে। আসতে ন-টাও

বাজতে পারে, দশটাও পারে, সাড়ে-দশটাও হতে পারে। কোনো হিসেব করে আমি চলি না। সংসারের দাঁড়ে হিসেবের শেকলে বাঁধা কাকাতুয়া আমি নই। আমি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম। বুঝেছ। তাতে খেতে পাই ভাল, না পাই কুছ পরোয়া নেই। এই তো আজ তিন দিন কেটেছে ছোলা খেয়ে। তিন দিন আগে পকেটে ছিল একশো পাঁচ টাকা। গ্রামোফোন কোম্পানি দিয়েছিল। পকেটে নিয়ে বের হলাম। এই পাজামা কিনলাম জুতো কিনলাম, সিনেমা দেখলাম ন-টার শোয়ে। ফারপোতে গিয়ে খেলাম, তারপর ট্যাক্সি নিলাম। বাসায় ফিরলাম রাত্রি তিনটেতে। পকেটে রইল কটা টাকা! তিনটে কি চারটে। তাও সকালে গেল দেনা শোধ করতে—বাসার কাছে চায়ের দোকানে ধার জমেছিল। দিয়ে দিলাম। যা রইল, তার থেকে ডাইং-ক্লিনিং-এর দামটা রেখে। ছোলা কিনে আনলাম এক সের। বাস্! তাতেই চলছিল। হঠাৎ তোমরা গিয়ে হাজির হলে। তিরিশটা টাকা দিলে। এখন চলবে ক-দিন। আবার এই মেম সাহেবের কাছে পাব ষাট টাকা। সেদিন হোটেলে খাব। সেদিন শনিবার হলে রবিবার সকালে উঠতে নিশ্চয়ই দেরি হবে। আসতেও দেরি হবে। সুতরাং—

ওদের দুজনের দিকে তাকিয়েই একটু হেসে বললে, রবিবার সকালের চা-টা আমার থেকেও কোনো বাঞ্ছিত জনকে বা জনদ্বয়কে নিয়ে পান করো। তোমরা মডার্ন মেয়ে, বড় হয়েছ, অবশ্যই বুঝতে পারছ। এবং তাই-ই চাও। সে আমি জানি। তোমাদের ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ। বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার চায়ের আসরে এই ছন্নছাড়া গাইয়ে কবি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবে। কেমন?

ছন্নছাড়া গাইয়ে কবি! বেহিসেবী। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম। আনন্দ রায় সেদিন যেন তার জীবনকে সূর্যের আলোতে আকাশ পাতাল জুড়ে আবার ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

পরের রবিবারের প্রত্যাশায় কৃষ্ণা দিন গণনা করেছিল। শুধু কৃষ্ণা নয় পাড়ার অনেকেই। কৃষ্ণার মুখ থেকেই কথাটা শুনেছিল ওর দাদা। দাদা বলেছিল কারখানার ছেলেদের। তারপর ছড়িয়েছিল পাড়ায়। রবিবার সকালে ডলি বেবীদের বাড়িতে নজর রেখে এখানে-ওখানে জটলা পাকিয়ে লোকেরা প্রতীক্ষা করেছিল।

বেলা সাড়ে ন-টায় ট্যাক্সি করে এসে হাজির হয়েছিলেন আনন্দ রায়। সেদিন পাঞ্জাবির উপরে ছিল বাসন্তী রং-এর একখানা চাদর। আর মাথায় একটা মুসলমানদের মতো মখমলের বুটিদার টুপি। চোখে নীল রং-এর গগলস্।

সেই যে জমে উঠল পাড়াটা।

রাত্রে ব্ল্যাক আউট। মানুষ আতঙ্কিত। কখন বাজবে সাইরেন! তারই

মধ্যে হঠাৎ এ পাড়ার লোক উল্লসিত হয়ে উঠল। কখন আনন্দ রায়ের গান শোনা যাবে! মনে আছে, কলকাতায় যেদিন প্রথম বোমা পড়ল, সাইরেন বাজল সাড়ে-নটায়, সেদিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী। ডলি বেবীদের বাড়িতে বারান্দায় গান করছিলেন আনন্দ রায়। আলো ছিল না। চাঁদের আলোয় আসর বসিয়েছিলেন। শীতকাল, কিন্তু আনন্দ রায়ের কাছে শীতের চেয়ে চাঁদের আলোর দাম বেশি। সাইরেন বাজা সত্ত্বেও আনন্দ রায় গান বন্ধ করেননি।

তখন কৃষ্ণার সঙ্গে আনন্দ রায়ের পরিচয় হয়েছে।

রেণুকে কৃষ্ণা নাম আনন্দ রায়ই দিয়েছিলেন। পরিচয়ের প্রথম দিনই দিয়েছিলেন।

সে স্মৃতি আনন্দের স্মৃতি! কতদিন যে স্মরণ করেছে কৃষ্ণা। স্মরণ হলেই চোখে জল আসে। বলেছিলেন, এরা এই রকমই বটে!

ওই বেবী এবং ডলির সম্পর্কে বলেছিলেন এই কথা। মাস ছয়েক পরে বোধ হয়।

আনন্দ রায় প্রথম মাসটা সপ্তাহে ওই রবিবার সকালেই আসতেন ডলি বেবীদের বাড়ি। নটা-দশটায় এসে এদের এখানেই কোনদিন খাওয়া দাওয়া করে যেতেন, কোনদিন একটা-দেড়টার সময়েই বেরিয়ে পড়তেন। গায়ের চাদরখানা ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যেতেন। এক হাতে অনবরতই প্রায় সিগারেট থাকত। ডলি বেবীদের বারান্দায় ওদের আসর বসত। বারান্দাটা ছিল কৃষ্ণাদের বাড়ির সামনেই।

বিঘে খানেক জমি। লোকে বলত—জমিটা বিঘে খানেক পতিত পড়েছিল দুই বাড়ির মাঝখানে। তার উপর একখানা বাড়ির শুধু ভিত হয়েই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অনেক দিন থেকে। মুসলমানেরা বাড়িটা ওই ভিতের পরই বন্ধ করে দিয়েছিল। ওটা নাকি তাদের পুরনো কবরের জমি। সেদিন মুসলমানেরা যখন লাঠি হাতে এসে জবরদস্তি গাঁথনি বন্ধ করেছিল,, তখন কৃষ্ণা যত পেয়েছিল ভয়, তত হয়েছিল মুসলমানদের উপর বিরক্ত। কিন্তু আনন্দ রায় সেদিন থেকে ডলিদের বাড়িতে গান শেখাতে আসতে শুরু করলেন এবং তাদের বাড়ির দিকের ওই বারান্দাটাই গান শেখাবার স্থান নির্বাচন করলেন, সেদিন থেকে সে মনে মনে মুসলমানদের ধন্যবাদ দিয়েছে। ভাগ্যে বাড়ির গাঁথনি বন্ধ করে দিয়েছিল তারা! না-হলে ওই বাড়িটা আজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকত অচলায়তনের মতো। আনন্দ রায়কে দেখা যেত না। গানও শোনা যেত না, গেলেও এমন ভালভাবে শোনা যেত না! কৃষ্ণাদের একতলা পুরনো বাড়িটার ছাদে দাঁড়ালে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যেত সব। প্রথম রবিবারটা ছাদে উঠে এমনিতেই দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ গান শুনেছিল সে। কিন্তু এরই মধ্যে দু-তিনবার

ডলি এবং বেবী তাকে লক্ষ্য করেছিল। বার দুই আঙুল দেখিয়ে ও কি বলেছিল, হেসেছিল। নিজেও একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। তারপরই সে একদিন বিকেলবেলা গিয়েছিল মিশনারী ইস্কুলের মেম সাহেবের কাছে। মেম সাহেব বড় ভালবাসতেন কৃষ্ণাকে। কৃষ্ণা তখন রেণু; তিনি ডাকতেন— রিণি।

উচ্চারণ একটু বাঁকা হ'লেও বেশ বাংলা বলতেন। যে মেমেরা 'টাইমারা টারা টারা' বলে সে মেম ছিলেন না তিনি। তিনি বলতেন, গরীবের বেটী— কালা মেয়ে তুমি রিণি। খুব লিখাপড়া করো। এম. এ. পাস করো মাই ডটার। ভাল চাকরি করবে। ডোণ্ট ম্যারী। কোটা কোন্ খারাপ ঘরে বিয়া হবে। বহুট ডুখ পাবে মাই বেবী। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

পরক্ষণেই রুমাল বের করে হাত মুছে বলতেন, এত টেল কেনো দাও রিণি?

নাক সিঁটকে বলতেন, উঁহু। উঁহু। সঙ্গে সঙ্গে হাসতেন। কৃষ্ণা সেদিন গিয়ে তাঁর কাছে গোটা ছয়েক পুরানো ফুলের টব চেয়ে নিয়ে এসেছিল।— আমি ছাদে বাগান করব। ওই পুরনো টবগুলো দেবেন আমায়?

—দ্যাটস গুড। ভেরী গুড আইডিয়া রিণি। গ্ল্যাডলী—খুব খুশির সাথে দিলাম। গাছ লাগাবে। বাগান করবে। খুব ভাল। ভেরী গুড।

আঃ ছি ছি।

আর স্মরণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কৃষ্ণার। লজ্জায় কেমন যেন বারবার মাথা নাড়তে ইচ্ছা করছে। অন্তর যেন বলে উঠতে চাচ্ছে। না—না—না।

মেম সাহেব সেদিন টব দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আর কয়েকটা কথা বলেছিলেন। তার মায়ের কথা।

ছি! ছি! ছি! তার মা রাক্ষসী সর্বনাশী!

থাক! অতীতের কথা স্মরণ আর করবে না সে! স্মরণ করবার সময়ও নেই।

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আনন্দ রায়ের পাণ্ডুরকান্তি স্ত্রী। এ হল সেই ডলি এবং বেবীর বেবী। বেবীর গলা চিরকাল তীক্ষ্ণ চিলের মতো।

চিলের মতো গলায় সে বললে, তুমি কি ধ্যানস্থ হয়ে গেছ নাকি! তোমাকে ডাকছেন! শুনতে পাচ্ছ না? ওঁরা এসে বাড়ি ঢুকলেন, আর তুমি এসে ঘরে ঢুকলে। কি ব্যাপার বল তো? চায়ের জল চড়িয়ে দাও। উনি ডাকছেন তোমাকে তুমি অত্যন্ত নেগলেক্ট করছ, এ আমি না-বলে পারছি না।

ম্লান হেসে কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার শরীর আজ ভাল নয়, বেবীদি। বড় ক্লান্তি বোধ করছি। বলুন গিয়ে, আমি আসছি।

—তোমার শরীর ভাল না। আমার এই হাল, তা হলে চলে কি করে বল?

—চলবে বেবীদি, চলবে। আমিই চালাব। আমি যাচ্ছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে চলে গেল রান্নার শেডের দিকে। রান্নার চালাখানা একেবারে পশ্চিমমুখী। রোদ্দুরে একেবারে ফেটে যাচ্ছে। উনোনে কয়েকখানা ঘুটে গুঁজে দিয়ে পাখার হাওয়া দিতে দিতে সে হাঁফিয়ে উঠল। কাশি উঠল। চমকে উঠে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আবার সেই কালব্যাধি যদি উঠে।

পরক্ষণেই একটু হাসলে সে। ওঠে উঠবে। মরবে, আনন্দ রায়ের জন্যে সে মরবে। কি হবে তার বেঁচে থেকে?

—কৃষ্ণা।

চমকে উঠল কৃষ্ণা। আনন্দ রায় খালি পায়ে কখন এসে উঠানে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

—এমন করে ধোঁয়ার মধ্যে তোমার যাওয়া ঠিক নয়। আমি উনুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

—না!

—না নয়। সরো।

—না। বেবীদি রাগ করবে। আর আপনি জল গরম করবেন! সে কি? না!

—আপনি নয়, তুমি!

—না আপনি চিরকাল আপনি।

—না। পরক্ষণেই হেসে বললেন, আচ্ছা, সে মীমাংসা এখন থাক। পরে হবে, দু-মাস পর। ওদিকে উনুন জ্বলেছে। তুমি জলটা চাপিয়ে দাও, ভূপতিবাবু বসে আছেন। যতটা লিখেছেন শোনাবেন, এস।

—আমি কি শুনব বলুন?

—**Truth is stranger than fiction** বুঝেছ? যেখানটা সত্যের গরমিল হবে, সেখানটা বলে দেবে—এখানটা এইরকম হবে।

—না। সে আমি পারব না। কেন আপনি এর ওপর ঝোঁক দিচ্ছেন। না। এ করবেন না।

আনন্দ রায় ঘাড় নেড়ে বললে, নইলে আর উপায় নেই কৃষ্ণা। আমি অনেক কষ্টে প্রডিউসারকে ডিরেক্টারকে রাজী করিয়েছি। দু-হাজার টাকা দেবে। এই দেখ আজ দুশো টাকা নিয়েও এসেছি। চল, আজ সন্ধ্যেবেলা হোটেলে যাব। ভাল করে খাব। ট্যাক্সিতে বেড়াব। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ধারে বসে থাকব। নতুন গান তৈরি করে সুর দিয়ে গাইব।

তার খোঁপাটা ধরে একটু টান দিয়ে বললে, হারি আপ! মেক হেস্ট!

চলে গেল সে গলির মুখে পথের দিকে। সিগারেট কিনে আনি।

আনন্দ রায়ের ঘাড়ে এসে বেবী চেপেছে। কি করবেন আনন্দ রায় ? অকস্মাৎ একদিন পথে বেবীর সঙ্গে দেখা। শীর্ণকায় পাণ্ডুর দেহবর্ণ। তার উপর ওই অবস্থা। আসন্ন মাতৃত্ব সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে তাদের পরিবারে। বাবা মরেছে, মা কোথায়, ডলি কোথায় সে জানে না। আনন্দ রায়কে দেখে বেবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

আনন্দ রায় কি করবেন ? বলেছেন ভয় কি তোমার ? আমি নিলাম তোমার সকল বোঝা ঘাড়ে তুলে। চল, কালই গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে আসি।

সেই বেবী তাঁর স্কন্ধে চেপেছে।

কৃষ্ণার চোখে জল আসে। বেহিসেবী লোক ছাড়া কি এ কেউ পারে। তবে আনন্দ রায় কৃষ্ণাকে বলেছেন তোমাকে যখন খুঁজে পেয়েছি কৃষ্ণা, তখন মাতৃত্বের দায় থেকে বেবী মুক্তি পেলেই ওকে ওর প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করতে ওকে বাধ্য করব।

বেবীর সঙ্গে সর্ত আছে। বেবী আনন্দ রায়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, প্রসবের পরই সে তাকে মুক্তি দেবে। চলে যাবে সে।

কৃষ্ণা বলেছিল, না না, তা হলে ওর দুঃখের অবধি থাকবে না—

—তুমি যদি বল, তবে ও-ও থাকতে পারবে ; কিন্তু আনন্দ রায়ের প্রিয়া হিসেবে নয়—পোষ্য হিসেবে। সে ভার আমি বইব। কিন্তু না। তুমি যখন ফিরে এসেছ। তখন ওর স্থান আর হয় না। কখনও ছিল না আর তা হতেও পারে না।

কৃষ্ণা সজল চক্ষেই বলেছিল, ছি।

নিজের সুখের জন্য অপরকে সে বঞ্চিত করবে ? যে সুখ যে আশ্রয় যে সান্ত্বনা বেবী ভিক্ষুকের মতো ভিক্ষা করে পেয়ে আজ বেঁচেছে, তাই সে কেড়ে নেবে ! আনন্দ রায় স্বেচ্ছায় যা উদার হাতে ঢেলে দিলেন, দান করলেন, তাই তিনি ফিরিয়ে নেবেন ! ছি !

সর্বস্ব হারিয়েছে বেবী। ঘর হারিয়েছে। পথ হারিয়েছে। মানুষ হারিয়েছে—দুনিয়ায় আপনার জোর ফুরিয়ে গেছে তার। সে সত্যকারের ভিখারিণী। পৃথিবী-জোড়া বিপর্যয়ের মধ্যে বহু লক্ষ বলি হয়ে গেল দশটা বছরের মধ্যে। যারা মরে গেছে তারা বেঁচেছে। তারা মুক্তি পেয়েছে। যারা মরেনি তারাই মুক্তি না পেয়ে প্রতিযোগীর যন্ত্রণা ভোগ করেছে। অথচ তার অপরাধ কতটুকু। অপরাধ তার, সে তার সংসারের শিক্ষা অনুযায়ী ভেবেছিল —সকল বিচারের ঊর্ধ্বে সে। সংসারের প্রচলিত পাপপুণ্যের নাগালের বাইরের মানুষ সে। পৃথিবী-জোড়া অনিয়ম বিশৃঙ্খলার আসরে বেরিয়ে

পড়েছিল উল্লাসে মত্ত হয়ে। অথচ এত দুর্বল এত অসহায় যে সামান্য পিচ্ছিলতায় পা দিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ে। পড়ে আর উঠতে পারে না। নিষ্ঠুর পৃথিবীর মানুষ চারিপাশে দাঁড়িয়ে হাসে। আর এরা করুণাভরে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদে। আনন্দ রায় তার হাত ধরে টেনে তুলেছেন। তার সর্বাঙ্গের ধুলো কাদা নিজের উত্তরীয় দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক এই কারণেই করুণার বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণা বেবীকে কিছু বলে না। ওর সকল কটু কথা সহ্য করে যায়। দুর্বল অসহায়, ভিখারিণীর মতোই হতভাগিনী। পথে বের হবার আকাঙ্ক্ষা ওদের অদম্য কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভরসা একমাত্র পরের করুণা। ওরা হাত পেতে বের হয়। নিজের শক্তি ওদের কিছুই নেই। তাই ভালবাসার ভুলকে স্বীকার করে নিজের নাড়ি-ছেঁড়া ধনকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ওরা পারে না। রাত্রির অন্ধকারে ডাস্টবিনে পরিত্যাগের কল্পনা করে। না হয় খোঁজে দয়াবান প্রাণবান মানুষকে। আনন্দ রায়ের মতো মানুষকে।

আর সেই বর্বর অমানুষেরা? যারা বেবীর পাপের অংশীদার, তারা? তারা বোধ করি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ!

সে নিজেও এ দশ বছরের বিপর্যয়ের বলি। কিন্তু বেবী, তোমার মতো নয়। তার লালসার দায় নেই। কৃষ্ণার কথা তো তুমি জান না।

সে দাঙ্গার সময় পিশাচ বর্বর গুণ্ডাদের দেখেছে। তারা তাকে খেলনার মতো লোফালুফি করেছে। তারা হিংস্র। তারা উন্মত্ত, তারা পশু। তাদের সামনে কি দাঁড়িয়েছ?

—কি হ'ল?

চমকে উঠল কৃষ্ণা আনন্দ রায়ের প্রশ্নে।

আনন্দ রায় ফিরে এসেছেন সিগারেট নিয়ে। তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন।

—আরক্ত মুখে কৃষ্ণা বললে, না। কিছু না।

—কিছু না? বলেই কবি গায়ক গেয়ে উঠলেন—

'চোখে তোমার রক্ত শিখা উঠল জ্বলে কি কারণে?
ও কি আগুন?
না কি ফাগুন?
ফাগুন কি ফুটল রাঙা পলাশ তোমার দু'নয়নে?'

বেবী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে উঠল কি করছ? এত ঢলাঢলি করতে কি একটুকু লজ্জা হয় না তোমার? তোমার কি?

স্তব্ধ হয়ে গেল সে। হঠাৎ যেন কেউ তার টুঁটি টিপে ধরেছে। কৃষ্ণা দেখলে—শীর্ণ দীর্ঘকায় ঈষৎ নামিত আনন্দ রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চোখ দুটো রাগে ধকধক করে জ্বলছে।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি গিয়ে বললে, ছি ?

বেবী প্রায় ছুটে পালিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে ঘরে মানুষ রয়েছে। আনন্দ রায়ের সঙ্গের ভদ্রলোক। বেবী বুঝতে পারলে তার অবস্থা। সে নিজেই ঘরে ঢুকে তাকালে, বেবীদি।

বেবী মুখ ফেরালে। পাণ্ডুর মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণা বললে, তুমি আমার ঘরটায় গিয়ে বস। বরং একটু শুয়ে পড়। তোমার বিশ্রাম চাই।

তিক্ত হাসিতে বেবীর মুখ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, চোখ ফেটে জল আসছে। কিন্তু কাঁদতেও পারছে না। করুণায় ভরে উঠল কৃষ্ণার অন্তর। হায় রে, যেখানে জোর নেই সেখানে দাবি নেই, সেখানে অভিমান এমনিভাবেই নিজেকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে, কাঁদতে পারে না। চোখের জল লজ্জা পায়। কি বলে কাঁদবে বেবী ?

কৃষ্ণা তার হাত ধরে আকর্ষণ করে বললে, এস, উঠে এস !

বেবী উঠে এল। দ্বিরুক্তি করলে না। কিন্তু বাইরে এসে হাতখানা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই কৃষ্ণার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত আবেগে বেবী প্রায় আছড়ে পড়ল বিছানার উপর। কিন্তু পরক্ষণেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল, বিছানা থেকে প্রায় যেন পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে এসে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে তার আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

রেণুর টি. বি. হয়েছিল। ভীষণ ভয়ঙ্কর টি. বি.। সাক্ষাৎ মৃত্যু। নিশ্বাসের সঙ্গে বুকে গিয়ে বাসা বাঁধে। ঝাঁজরা করে দেয় বুক। রক্ত উঠে আসে মুখ দিয়ে। ওর বিছানাতেই সেই বিষ ছড়ানো আছে।

দেখতে দেখতেই তার মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। সে হাসিতে মর্মান্তিক তিক্ততা। অপরিমেয় ক্ষোভ ; কিন্তু সে হাসি পরিধিতে অত্যন্ত অল্প—এ যেন সাপের বিষের একটি বিন্দুর মধ্যে মৃত্যু-সিন্ধু উথলে ওঠার মতো।

কি ভয় ? কেন ভয় ? ছি-ছি-ছি ! আর কি বাঁচার প্রয়োজন আছে।

ওই একটা নিতান্ত দীন-হীন পরিবারের মেয়ে—শিক্ষাহীন মর্যাদাহীন ঘরে জন্ম। ওই রেণুর অনুগ্রহে তাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

রেণু নয়, ও আজ কৃষ্ণা। হায় রে দুনিয়া, হায় !

ভিখারীর ঘরের মেয়ে। ওর মা সত্যি সত্যি ভিক্ষে করত। বোধ করি ছ-মাস আগেও বেবী তাকে ভিক্ষে করতে দেখেছে। ওই মেয়েটা নিজে ক্রিশ্চান মিশনরীদের কাছে ভিক্ষে নিয়ে ইস্কুলে পড়ত। কালো রং, নির্বোধ মুখ, ব্যঞ্জনাহীন দৃষ্টি। তার উপর তেল চকচকে চুল, চকচকে মুখ—মেয়েটা বেণী ঝুলিয়ে ইস্কুলে যেত। ভঙ্গিতে আড়ষ্ট গ্রাম্য কথাবার্তা ছিল রেণুর, ফ্যাল ফ্যাল করে গরুর মতো ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকত। খোঁচা দিলে ঝগড়া

করত—খাঁটি গেঁয়োর মতো। সেই রেণু হয়ে গেল কৃষ্ণা।

হায় আনন্দ! আজ তার নাম দিয়েছেন কৃষ্ণা!

'জীবনে যবে প্রখর তাপে পরাণ কাঁদে মম
মরুর মতো জাগিল খর তৃষ্ণা।
বক্ষ-ভরা সুরার জ্বালা
দুনিয়া-জোড়া ও-পানশালা
আঁচল-ভরা কাজল-কালো শীতল জল সম—
আসিলে তুমি নাম কি তব কৃষ্ণা?'

কবি-আনন্দ রায় এই কবিতা রচনা করে রেণুর 'কৃষ্ণা' নামকরণ করেছেন। বক্ষ-ভরা সুরার জ্বালা। দুনিয়া-জোড়া ও-পানশালা—ডলি বেবীকে ইঙ্গিত করেছে। তারা সুরা।

চীৎকার করতে ইচ্ছা হয় বেবীর। একটানে আনন্দের মুখের ওই কবি নামের মুখোসটা খুলে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়।

আঁচল-ভরা কাজল-কালো শীতল জল। পানা-পচা রৌদ্র-স্পর্শহীন ডোবার জল কালোও বটে, শীতলও বটে।

রেণুর মাকে তো দেখেছো। তাকে তো জান। উঃ, সে কি হীনতা! কঙ্কালসার জীর্ণ দেহ, হাড়ের উপর চামড়া-ঢাকা মুখ, খাঁড়ার মতো নাক, আছে শুধু দুটো ড্যাবা চোখ; ওই চোখে পলকহীন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে অতি মন্থর পদক্ষেপে এসে ঘরে ঢুকবে। যেন একটা চেতনাহীন ঘোরে আচ্ছন্নহীন মানুষ হেঁটে আসছে।

যেদিন তারা তাদের নতুন বাড়িতে এসে উঠল, সেই দিনই সে এসেছিল তাদের বাড়িতে। অশুভ অলক্ষণের মতো, দেখে তারা শিউরে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল।

সুখের সংসার আনন্দের জীবন ছিল তাদের। বাবা-মা, তারা দুই বোন। বাবা সরকারী পেনশন পেতেন, উদার শিক্ষিত মানুষ। শুধু শিক্ষিত বিশেষণে বাবাকে ঠিক বোঝানো যায় না। বিজ্ঞানবাদী, কুসংস্কার বর্জিত খাঁটি আধুনিক। হায় শুধু যদি তিনি দুনিয়াকে একটু কম বিশ্বাস করতেন! তাহলে বোধকরি আজ তার এ দুর্দশা হত না। পরনে ঢিলে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি কি কামিজ যা হোক আর পায়ে শ্লিপার, মুখে চুরুট, হাতে বই। দিনরাত্রি শুধু বই—বই-আর-বই। সামান্য কৌতুকেও হেসে উঠতেন, সামান্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, বলতেন **That's wonderful.**

সেদিন নতুন বাড়িতে এসে বলেছিলেন **Is n't wonderful?** নিজের বাড়ি। অ্যাঁ? এই ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গা, নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম, তোদের নিয়ে কাটিয়ে দেব জীবনটা। মনিব নেই, ওপরওয়ালা নেই, সারকুলার

নেই, কনফিডেনসিয়াল নেই ! Oh, it is wonderful ! তোরা কিন্তু টপটপ করে পাসগ্লো করে নে মামি ? তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত।

এই সময়ে রেণুর মা এসে ঘরে ঢুকল। বিচিত্র সে স্থির-দৃষ্টি। কাউকে বা কিছুকে যেন সে দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় না—পলকহীন, বিস্ফারিত, চোখের তারা স্থির, শূন্য, তার সম্মুখে সব যেন শূন্য।

বেবীর মা শিউরে উঠেছিলেন ; তার বাবা ইজিচেয়ারের উপর খাড়া হয়ে বসেছিলেন। বেবী মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডলি শুধু প্রশ্ন করেছিল—কি চাই। কাকে চাই ? কে তুমি ?

তবু কথা বলেনি। এগিয়ে আসছিল, যেন অনিবার্য সে।

ডলি চীৎকার করে উঠেছিল—সিপাহী ! সিপাহী !

উপর থেকে ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিয়েছিল টেরিয়ারটা। বাঁধা ছিল।

ডলি বলেছিল—কথা বল না কেন ? এবার আমি কুকুর খুলে দেব। এই মেয়ে !

—আমি বড় গরীব। আপনাদের পাশেই থাকি। ওই যে, ওই ভাঙা বাড়িটায়। আপনারা এসেছেন, আপনাদের প্রণাম করতে এসেছি, কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছি। বড় গরীব আমরা !

কুকুরটার ঘেউ ঘেউ চীৎকারের বিরাম ছিল না। সে চীৎকার—আক্রমণ ঘোষণার চীৎকার। ওরা বুঝতে পারে, জানতে পারে। গায়ের গন্ধ থেকেই সিপাহী বুঝেছিল, অমঙ্গল এসে ঘরে ঢুকেছে।

তার বাবা অপ্রস্তুত হয়ে হেঁকে বলেছিলেন—চুপ ! সিপাহী ! চুপ ! স্টপ ! এ—!

একটা টাকা দিয়েছিলেন তিনি।

রেণুর মা তবু বিদায় হয়নি। চোখের দৃষ্টির মতোই তার কথা বলবার ভঙ্গিও বিচিত্র। সে যেন মানুষের টুঁটি টিপে ধরে—শুনতে শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসে।

—আমি বড় গরীব। স্বামী রুগ্ন, ইস্কুলে পণ্ডিতি করে নিতান্ত অল্প মাইনে। ছেলেটা লোহার কারখানায় কাজ শেখে, বড় মেয়েটা ভিক্ষে করে পড়ে। আরও তিনটে মেয়ে আছে। কোলের একটা ছেলে না-খেতে-পেয়ে মরে গিয়েছে।

কথা বন্ধ করে স্থির দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল। হাতখানা তেমনি পাতা।

মা কথা বলছিলেন এবার—ওই তো যা আমাদের সাধ্য দিয়েছি।

ডলি ধমক দিয়ে উঠেছিল, আর নেই। যান।

তবু তেমনি দাঁড়িয়ে, অনড় স্থির বিস্ফারিত পলকহীন মরা মানুষের মতো দৃষ্টি।

—যা-ন। ডলি আবার ধমক দিয়েছিল। এবার ধমকটা জোর হয়ে উঠেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করেছিল রেণুর মা। চোখ দুটো কেমন করে উঠল, টলতে লাগল, মনে হলো পড়ে যাবে। মরে যাবে হয়তো।

শঙ্কিত হয়ে বাবা ডলিকেই ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ডলি, ছি! না, না আপনি কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। দেব, আবার দেব। বুঝলেন।

—আমি আর চাই না আজ। মাঝে মাঝে গরীবকে সাহায্য করবেন। তাই বলছিলাম। আর।

লজ্জা দিয়েছিল রেণুর মা। সুচতুরা ভিখিরি মেয়েদের, যারা কচি ছেলে ভাড়া নিয়ে ফুটপাথে শুইয়ে ঘোমটা টেনে হাত পেতে নির্বাক হয়ে বসে থাকে, চুপ করে থাকার মধ্যেই অনেক কথা বলার চেয়েও বেশি কথা বলে বা বলবার চেষ্টা করে। রেণুর মা 'আজ আর আমি চাই না' কথাটি বলে তাঁদের চেয়ে চাতুরি খেলেছিল। শুধু শুধু করুণারই উদ্রেক করেনি। লজ্জাও দিয়েছিল। সত্যি সত্যি, সবাই তারা লজ্জা পেয়েছিল। এই কারণেই ওর বাবা ওর কথার শেষ কথাটা ধরে প্রশ্ন করেছিলেন, বলুন, আর কি করতে পারি বলুন।

—যদি কিছু খাবার-টাবার থাকে—

—দাও, দাও মনো। কিছু খাবার দাও ওঁকে।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল তখন। তখনও আটা চিনি দুষ্প্রাপ্য হয়নি। খানকয়েক লুচি এনে দিয়েছিল ডলি।

বাবা বলেছিলেন মেয়ে আমার বুঝতে পারেনি। বুঝলেন না। নইলে ও আমার ভয়ানক লক্ষ্মীমেয়ে আর তেমনি কোমল মন। গরীব দুঃখীর জন্যে কত যে দুঃখ ওর। কত যে খাটে। ওদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে—'নারী-অনুশীলন সঙ্ঘ', তা থেকে গরীব মেয়েদের সাহায্য করে। দুধ দেয়। কাপড়-চোপড় দেয়। ডলি তার মস্ত পাণ্ডা। ডলি, তোমরা নিশ্চয় কিছু সাহায্য করতে পার। অন্তত দুধ কিছুটা দিতে পার। পার না?

—এদিকের ব্রাঞ্চটা খোলা হলেই পারব। এখন রেড ক্রশ যা দেয় তাতে কুলুচ্ছে না। নর্থ সাউথ দুটো ব্রাঞ্চ হলেই ওরা দুধ বাড়াবে বলেছে।

—তাহলে তাড়াতাড়ি কর; খুলে ফেল ব্রাঞ্চ। নর্থ ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে তুমি কিন্তু সেক্রেটারি হয়ে যাবে। আর বেবীকেও একটা কিছু করে দিও। আই লাইক ইট। আই লাইক টু সি ইউ ইন দ্য ফোর ফ্রন্ট অব দ্য ফ্রন্ট লাইন।

এরই মধ্যে রেণুর মা যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই চলে গিয়েছিল। বিদায়-সম্ভাষণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ নমস্কার ওসব কিছুর ধার ধারে না। আজ বেবী বলতে পারে ওটাও তার অভিনয়। এটা তারই অংশ। বোধ করি এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই যে ভালো ঘরের মেয়ে ভিক্ষে করে এতই লজ্জা পেয়েছে যে, আর কোন কথা বলবার বা নমস্কার করবার মতো মনের অবস্থা তার নেই। নিজের লজ্জায় নিজেই মরে গেছে হতভাগিনী।

আসলে হয়তো এই সব কথা তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠেছিল—নিজের

স্বার্থের কথা ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুর কোন অর্থ তো রেণুর মায়ের ছিল না—সমিতির কথা। দশের ভাবনার কথা তার ভাল লাগবে কেন?

নারী-অনুশীলন-সঙ্ঘের সমারোহের সেই দিনগুলি বেবীর জীবনের বোধ-করি শ্রেষ্ঠ সুখস্মৃতি। আবার তাদের সংসারের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

বিরাট একটা বিপ্লব এসে নাড়া দিয়ে গেছে সারা দেশে। দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান ঘরের গৌরবান্বিতা মেয়েরা নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির অধিকারিণী তাঁরা। দেশে তখন যুদ্ধ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ বিদেশী এসেছে। ইংরেজ-আমেরিকান-ক্যানেডিয়ান-ফরাসী। তারা সঙ্ঘের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে একবাক্যে তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মেয়েদের সঙ্গে সমকক্ষতা স্বীকার করে গেছে। বলে গিয়েছিল—হ্যাঁ, সেই বহু জীর্ণ পৌরাণিক সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি পেয়েছে, অর্জন করেছে বাংলাদেশের নারী সমাজ। পুরুষ ও নারী সমান অধিকারের পর্যায়ে পেঁীচেছে।

আনন্দ রায় গান রচনা করেছিল এই নব উদ্বোধনের।

'নূতন জীবন জাগল রে অগ্নিশিখায়,
চোখে আলোক লাগল রে রক্তরেখায়,
তপস্বিনী তপতী আজ তপঃশেষে
দাঁড়াল আজ দীপ্ত করে সূর্যকে সে;
ধরার মেয়ে পাতাল হতে
কি মহিমায় উঠল যে রে দীপ্ত প্রভায়।'

সে গান যারা গেয়েছিল, তাদের মধ্যে কণ্ঠস্বরের দাবীতে ঠিক না হলেও। উৎসাহের এবং ইউরোপীয় সুরের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য ডলি আর বেবী অগ্রণীদের মধ্যেই স্থান পেয়েছিল। চোখের উপর সে ছবি ভাসছে। তখন ব্ল্যাক-আউটের দিন এবং প্যান্ডেল বাঁধায় অনেক হাঙ্গামা—খরচও বেশি। তাই উত্তর কলকাতার খুব বনেদী বড়লোকের বাড়ির হলে উদ্বোধন হয়েছিল। সঙ্ঘের নেত্রী যাঁরা, তাঁরা সম্ভ্রান্ত সমাজে গৌরবান্বিতা বা গরবিণী দুই-ই। তাঁরা অনায়াসেই হল সংগ্রহ করেছিলেন। চমৎকার সাজানো হল, চারিদিকে বড় বড় মানুষের সমান উঁচু আয়না। নানা আসবাব। মাঝখানে ফরাশ। লোকও কম হয়নি। সভাপতির আসন হয়েছিল ছোট একখানি চৌকির উপর। কার্পেটের উপর গালিচার আসন। দু-দিকে মাজা চকচকে পিতলের ঘটির মুখে পদ্মের গুচ্ছ। সেই গুচ্ছ ভেদ করে ঠিক মাঝখানে এক আঁটি রজনীগন্ধা। সভাপতির আসনের ঠিক পাশেই টেবিলের উপর হারমোনিয়ম রেখে মেয়েরা গান গেয়েছিল। তারা সবশুদ্ধ ছিল পাঁচজন। ডলি হারমোনিয়ম বাজিয়ে-ছিল। বেবী ছিল তার ডান দিকে। দূরে সামনের দেওয়ালে আয়নায় বেবীদের প্রতিবিম্ব পড়েছিল। ডলি বেবীর চেয়ে সুন্দর মেয়ে ছিল দুজন। কিন্তু ডলি বেবীর সজ্জার গুণে তাদের চেয়ে ডলি বেবীকে অনেক বেশি সুন্দর

লেগেছিল। ওরা সেদিন চুলে সাবান দিয়েছিল। পরনে ছিল একটা লাল গেরুয়া রঙের বেনারসী, ব্লাউজের রংও তাই। গলায় ছিল ছোট আকারের পলার হার। হাত ছিল খালি। রিস্টওয়াচ পর্যন্ত পরেনি। শুধু ঠোঁটে লিপস্টিক পাতলা করে ঘষে নিয়েছিল। সত্যিই তাদের দুজনকে দেখাচ্ছিল অগ্নিশিখার মতো। তপস্বিনীর মতো।

আয়নায় বেবী নিজের প্রতিমূর্তির দিকেই তাকিয়েছিল। অকস্মাৎ একসময় ডলি দিলে তাকে হাঁটুর মৃদু ধাক্কা। আত্মস্থ হয়ে কারণ খুঁজতে গিয়ে শুধু হারমোনিয়ম-বাদনরতা ডলির মুখে অতি-প্রচ্ছন্ন এক টুকরো হাসি ছাড়া আশেপাশের কিছু দেখতে পায়নি বেবী! বুঝতে পারেনি বেবী, ডলি কি ইঙ্গিত করছে। ডলি চট করে একবার মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামালো। এবার বেবীর চোখ পড়ল সভাপতিকে। দীপ্ত বিস্ফারিত চোখে সভাপতি তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। দৃষ্টির মজা হল, দুটো দৃষ্টি মুখোমুখি না হলে বোঝা যায় না—কে কার দিকে তাকিয়ে আছে। সভাপতি ছিলেন গীতিকার কবি-গায়ক আনন্দ রায়। আনন্দ রায় লজ্জা পায় না এমনভাবে তাকিয়ে থাকত। তার চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টির দীপ্তি দেখে ধরা যায় না তার মানে। তায় কারণ আনন্দ রায় নিঃসঙ্কোচ।

গানের শেষে আনন্দ রায় নিঃসঙ্কোচে তাদের দুই বোনকে ডেকে বলেছিলেন—তোমরা তো দুই বোন। নিশ্চয় আমার ভুল হচ্ছে না। এক বৃন্তে দুটি ফুলের মতো সাদৃশ্য! অ্যাঁ!

বেবীই আগেভাগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল—হ্যাঁ।

—হুঁ তাই তো দেখলাম। কবির চোখ তো ভুল দেখে না!

অথচ সত্যি বলতে ডলি এবং বেবীতে খুব সাদৃশ্য ছিল না। ডলি শ্যামবর্ণা। বেবী ফরশা। ডলি একটু মোটা মাথায় খাটো। বেবী পাতলা লম্বা। ডলির নাক-মুখ-চোখ মায়ের মতো, গোল মুখ, নাক একটু ছোট, ঈষৎ খ্যাঁদা, চোখ ডাগর, চুল কোঁকড়া; বেবীর নাক-মুখ-চোখ বাবার মতো—অনেকটা পঞ্জাবীদের মতো। একটা দ্রাবিড়ী ঢং, একটা আর্য ঢং। তবু আনন্দ রায় চিনতে ভুল করেননি।

ডলি খুব বেশি প্রগল্‌ভা। সে ছোট্ট রুমালখানায় ঢাকা দিয়ে হেসে বলেছিল—কবিদের দিব্যদৃষ্টি হয় শুনেছিলাম, আজ তা দেখলাম।

—মিথ্যে বলিনি গো। তা হলে বলি শোন। তোমাদের তো শুধু ওই সহোদরা সম্পর্কই আবিষ্কার করিনি, আমার দৃষ্টিতে আরও দেখেছি, দেখেছি—আমার গানের অগ্নিশিখা তোমাদের বেশে-বাসে-রুচিতে, সুরের প্রাণ মাতানোয়, দৃষ্টির দীপ্তিতে মূর্তি ধরেছে। কি নাম গো তোমাদের?

—আমার নাম ডলি ও হল বেবী!

—উঁহু। তুমি বহ্নি ও শিখা। আমি দিলাম নতুন নাম।

এই সময়েই একটি ছোট মেয়ে নিয়ে এল মালা। রজনীগন্ধার মালা একগাছি। ছোট্ট মেয়ে ভড়কে গেল বেচারা। থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পিছন থেকে নেত্রীস্থানীয়া সুচারুদি বললেন—দাও। পরিয়ে দাও।

মেয়েটি মালাটা ঝপ করে পরিয়ে দিল ডলিকে। দোষ কি বেচারীর। ডলিই ছিল গানের দলের নেত্রী, গোটা আসরে সে-ই ঘুরঘুর করে গোড়া থেকে ঘুরছিল, জোরে ঘোরানো লাটিমের মতো, সকলের দৃষ্টি—সে-ই আকর্ষণ করেছিল গোড়া থেকেই।

লোকে হেসে উঠেছিল। সপ্রতিভ ডলি মুহূর্তে ভুলটা সংশোধন ক'রে নিয়েছিল। মেয়েটির মাথায় টোকা মেরে তাকে সস্নেহে 'বোকা মেয়ে' বলে তিরস্কার করে মালাগাছি গলা থেকে খুলে—আনন্দ রায়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে আবার মেয়েটিকে বলেছিল—এঁর গলায়। ইনিই সভাপতি।

আশ্চর্য! ডলির সপ্রতিভ ভঙ্গির জন্য এতটুকু হাসি উঠতে পায়নি সভার মধ্যে। আনন্দ রায় হেসেছিলেন পলকের জন্য? তারপর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বললেন—এবার সভার কাজ আরম্ভ হোক।

সুচারুদি বলেছিলেন—একটু বাকী আছে। চন্দনের তিলক দেবে।

—একটু তাড়াতাড়ি করুন। আমার আবার আটটায় একটা এনগেজমেন্ট আছে।

—ডলি। চন্দনের বাটিটা ওখানে রয়েছে। ওই যে চৌকির ওপর রুপোর বাটিতে। দাও। বাটিটা ছিল বেবীর হাতের কাছে। এবার সে তুলে নিয়েছিল বাটিটা। ডলিটা সর্বত্র তাকে পিছনের ছায়ায় ঢেকে ফেলে এগিয়ে যায়। বেবী ভাবতে ভাবতে ও কাজ করে ফেলে। সেদিন সে সুযোগ ছাড়েনি; এবং বোধকরি জীবনে সেই প্রথম ডলিকে পিছনে রেখে আনন্দ রায়ের সামনে বসে, তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল।

—দাঁড়াও। আনন্দ রায় বাটি-সমেত তার হাতখানা ধরেছিলেন—দাঁড়াও আমি দিই তোমাকে তিলক।

তাকে তিলক দিয়ে ডেকেছিলেন—সুচারু দেবী, আপনি আসুন। আজ সবাইকে দেব চন্দন তিলক। আজ আপনারা আমাদের পাশে এসে কর্মজগতে স্থান নিলেন। সেই শুভ পুণ্য অনুষ্ঠানে আমাকে বরণ করেছেন পৌরোহিত্যে। পুরোহিত হিসেবে আজ আমি আপনাদের সকলের ললাটে চন্দন-তিলক দিয়ে বরণ করে বলব—শিবাস্তে পন্থানঃ। আমার গানকে বাস্তবে আপনারা রূপ দিয়েছেন। সেই রামচন্দ্রের কালে মর্যাদায় আঘাতের অভিমানে ভারতবর্ষের যে সীতা 'মা ধরণী দ্বিধা হও' বলে পাতালবাসিনী হয়েছিল সেই সীতা—আজ নূতন জন্মে নূতন রূপে মৃত্তিকাগর্ভ থেকে সকল মালিন্য ঝেড়ে ফেলে পুড়িয়ে ফেলে অগ্নিশিখারূপিণী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন। ভারতবর্ষ এতকাল অসীম সহ্যশক্তিশালিনী সীতার আদর্শ আঁকড়ে

ধরে পড়েছিল শোকার্ত মায়ের কন্যার শব বুকে পড়ে থাকার মতো। আজ নতুন জন্মে বীর্যবতী জ্বালাময়ী সীতাকে পেয়ে সকল শোকমোহ তিনি সম্বরণ করবেন। বেগবতী শক্তিমতী মুক্তিরূপিণী ভারতকন্যা—সকল বন্ধনকে ছিন্ন করবে, সকল আবর্জনাকে দহন করবে, সকল দুর্বলতার লজ্জাকে সকল অসঙ্কোচ হাস্যমুখরতায় লজ্জিত করে সে চলবে সম্মুখপথে—সার্থকতার পথে—নব মহিমার পথে।

এই আমার ভাষণ। আমি সকলকে তিলক দিয়ে সমাপ্তি-সঙ্গীত গেয়ে—আমিই গাইব, আমার সঙ্গে আপনারাও গাইবেন। তারপর আপনারা আপনাদের নির্বাচন ইত্যাদি শেষ করবেন। আসুন সুচারু দেবী।

অল্প কয়েকটা মিনিটের মধ্যে সে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-সমারোহের সৃষ্টি হয়েছিল। যাদুকর ভিন্ন এ কেউ পারে না। আনন্দ রায় যাদুকর। সে যেন এক অভিনব বিজয়াতিথি। আজও বেবী শিউরে ওঠে। এমন সাফল্য সেদিন কেউ কল্পনা করেনি।

তিলক শেষ করে আনন্দ রায় হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে ডেকেছিলেন। এস—তোমরা দুজন দু-পাশে দাঁড়াও। বহ্নি এবং শিখা। জান তো রবীন্দ্রনাথের 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা ?' বলেই সানাইয়ের মতো সতেজ সুরেলা কণ্ঠে গান ধরেছিলেন—

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো-আগুন জ্বালো।'
'আজকে রাতের অন্ধকারে।
আমি চাই পথের আলো।
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।'

—আগুন জ্বালাতে গিয়ে আবর্জনার সঙ্গে প্রাণটাকে যদি কেউ নিজের দোষে পুড়িয়ে ফেলে তবে সে দোষ কার, বল ? আবর্জনায় লাগাবার আগুন আমি দিয়েছিলাম তা সত্যি। কিন্তু তার জন্যে তার পুড়ে মরার দায় কি আমার ?

—তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল আনন্দ।

আনন্দ হাসতে লাগল। সিগারেটে টান দিয়ে হেসে বললে—তুমি ভাই প্রডিউসারের ডান হাত। তুমি এখন যা বলবে সইতে হবে আমাকে। বল যা ইচ্ছে।

কৃষ্ণা ও-ঘরে বেবীর কাছে উঠে গেছে। বেবীর কান্নার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। সে আর থাকতে পারেনি। এই অবসরে সিনেরিও-লেখক আনন্দকে বললে—কতগুলি মেয়েকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করলে আনন্দ ?

আনন্দ হেসে বললে, 'আজকে রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।' তার জন্যে আবর্জনায় আগুন জ্বালাতে গিয়ে আবর্জনার সঙ্গে যদি কেউ নিজের প্রাণটাকে পুড়িয়ে ছাই করে তবে, সে দোষ কার, বল ?

এই সূত্রেই কথাগুলি চলছিল।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আনন্দ রায় বললে তবে আমার ওপর অবিচারই করলে, জেনে শুনে অবিচার করলে। দুঃখ পাই আমি এইখানে। স্কাউণ্ড্রেল আমি নই। আমার একটা প্যাশন আছে। তার ওপর আমার হাত নেই। ছিল না এমন নয়, ছিল, কিন্তু দুনিয়ার একটা বড় দল মিলে সে হাত আমার পঙ্গু করে দিলে বা সে প্যাশনের আগুনে ইন্ধন গুঁজে দিয়ে তাকে এমন প্রবল করে দিলে যে, আমার হাতের মানা আর মানলে না। কি করব আমি? তুমি জান না এসব? সব জেনে শুনে তুমি আমাকে গাল দিলে?

হাসলে আনন্দ রায়।

প্রথম যৌবনে আনন্দ রায় ছিল পাবক-শিখা।

তিরিশ সালে প্রথম প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল সে। ষোল-সতের বছরের কিশোর ছেলে। সতেজ সুতেল বাঁশীর মতো সুমধুর কণ্ঠস্বর। সবে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বাড়ির সঙ্গতি অভাবে পড়ার সুযোগ হয়নি। বাড়িতে বসে গোপনে কবিতা লিখত আর মাঠে গিয়ে ইস্কুলের সঙ্গীদের মধ্যে বসে গান করত। কাজী নজরুলের গানে তখন দেশ মাতোয়ারা।

এই সময় এল তাদের গ্রামে আন্দোলনের ঢেউ। মিটিং হল, এলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। সেই মিটিংয়ে গান গাইতে ডাকলেন তাদের গ্রামের কংগ্রেস-সেক্রেটারী। ভীতু লোক, তবু সভাপতির হুকুম তামিল করতে সভার আয়োজন করেছিলেন। জায়গা মেলেনি গাঁয়ে। গাঁয়ের বাইরে একটা গাছতলায় জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে সভা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, কি গাইব?

—যা হয় একখানা গেয়ে দে বাবা। শুধু প্রেম-সঙ্গীত বাদ দিয়ে। 'বন্দেমাতরম্' কি 'ভুবনমনোমোহিনী' জানিস?

—না।

ছাই জানিস তবে। যা জানিস তাই গা। 'আমার জন্মভূমি' গা। না—তাও জানিস না?

সভাপতি আয়োজন দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি যত শীঘ্র পারেন, এখান থেকে অন্যত্র যেতে চান। যোদ্ধা ব্যক্তি তিনি। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরামদের সমাবেশের মধ্যে মেরে ফেলা পাঁকাল পুকুরে বৃহৎ মৎস্যের মতো পালাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন। আরম্ভ হোক সভার কাজ।

—হ্যাঁ। প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত।

—সঙ্গীত। সে আবার গাইবে কে? হারমোনিয়ম কই?

—হারমোনিয়ম লাগবে না। শুধু গলাতেই গাইবে।

সভাপতি উঠে নিষ্প্রাণ নিরুৎসাহ ঘোষণা জানিয়ে দিলেন। প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত।

আনন্দ গান ধরলে! কাজী নজরুল ইসলামের—

'কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।'

প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পাষাণ-বেদীর দীর্ঘ ঈকারের লম্বা এবং উচ্চতম গ্রামে গলা এসে যেন খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ঝকমক করে উঠেছিল। থরথর কম্পনে সে যেন নিপুণ যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত শাণিত তীর। মানুষের অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ করেছিল। রুদ্ধদ্বারের ভীতির অর্গল নিমেষে খান খান হয়ে গিয়েছিল। সভাপতির চোখ জ্বলে উঠেছিল। গান শেষ হবা মাত্র তিনি নিজেই আবেগভরে ধ্বনি দিয়ে উঠেছিলেন, 'বন্দেমাতরম্।'

জনতা সাড়া দিয়েছিল সমান আবেগে—বন্দেমাতরম্।

—ইন কিলাব

—জিন্দাবাদ!

—ইন কিলাব

—জিন্দাবাদ!

—ইন কিলাব

—জিন্দাবাদ!

সভাপতি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কারাগারের লৌহকপাট ভাঙতে হবে। শিকল-দেবীর পূজাবেদী বিচূর্ণ করতে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষই আজ একটি বিশাল কারাগার।

সভা শেষ হল যখন, তখন পঞ্চাশজন প্রায় পাঁচশোয়ে উথলে উঠেছে। সভার শেষে সভাপতি তাকে বলেছিলেন, চল আমার সঙ্গে। আর একটা সভা আছে সীতাপুরে, সেটা সেরে ফেরবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাব।

মোটরে জেলা-কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে একসিটে বসে সীতাপুর। সারা পথটা তিনি তার পিঠে হাত রেখে গিয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সেই শুরু। কোনদিন এ জিনিস সে পায়নি। ইস্কুলে পড়াশোনায় সে ভাল ছিল না। অঙ্কে ভূগোলে খুব কাঁচা ছিল। সংস্কৃতেও ভাল ছিল না। ব্যাকরণ মুখস্ত করতে ভাল লাগত না। গানে ছিল ঝোঁক, আর ছিল সাহিত্যে—কাব্যে। ইস্কুলের পাঠ্য পড়বে কখন? মাস্টাররা এই কারণে কখনও একটা মিষ্টি কথা বলেননি। আজ গানেরও সমাদর হয়েছে ইস্কুলে। সেকালে গাইয়ে ছেলেরা ছিল বকাটে ছেলে।

কংগ্রেস সভাপতি গাড়িতেই তার সমস্ত খবর খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাছে যে দেশের বড় একটা পাওনা রয়েছে। যিনি তোমাকে এই সুন্দর গলা দিয়ে এই দেশের মাটির মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন তিনি নিশ্চয় চান যে, এই দেশের কল্যাণ হোক এই সম্পদে। আজ এ দেশের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ

হল পরাধীনতা-মোচনে। গান দিয়ে সেই দিক দিয়ে তুমি সাহায্য কর:। আজ আন্দোলন এসে গিয়েছে—তুমি চল আমার সঙ্গে, আমার বাড়িতে থাকবে। সভায় সভায় গান গেয়ে বেড়াবে। তারপর দেশ স্বাধীন হলে তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব। আর যদি গান শিখতে চাও। স্বাধীন দেশে সব চেয়ে বড় গায়কের শিষ্য করে দেব। কি বল?

বুক তার গুরু গুরু করে উঠেছিল। প্রত্যাশার এবং আশঙ্কার দুটি বিপরীতমুখী মেঘে সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছিল। চোখে তার জল এসে পড়েছিল।

বাড়িতে মত দেননি তার বাবা। মা ছিলেন না। মানুষ করেছিলেন বিধবা মাসি। মাসি তাকে স্নেহ করতেন কিন্তু সে তাঁকে ভক্তি করতে পারত না। সামাজিক নিন্দা তাকে পীড়া দিত। বাবা এবং মাসিকে নিয়ে সামাজিক নিন্দা ছিল গ্রামে। তাই মাসির মতামতের কোন মূল্য তার কাছে ছিল না। সে তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেনি। তিনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হ্যাঁ অনু, রায় মশায় সব কি বলছিলেন বাবা? কি বলেছিস তাঁকে? না, না, ওসব মতলব করিস নে বাবা, তুই বড় ছেলে, কত আশা তোর ওপর।

—হ্যাঁ, আশার ফল আকাশ থেকে ঝরে পড়বে মাসি। বাবা বলছে প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করতে, পঁচিশ টাকা লিখে কুড়ি টাকা নিতে হবে। ওতেই বাবার সংসার সোনা দিয়ে মোড়া হয়ে যাবে। আর আমি সশরীরে স্বর্গে চলে যাব।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল সে।

সেই বেরিয়ে আসাই সম্পর্কচ্ছেদ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি ইস্কুলের ছেলের কাছে আড়াই টাকা ধার ক'রে একেবারে ট্রেনে চেপে বসেছিল। এই সুবিধেটা তার বরাবর আছে; ভাল গান গাইতে পারে, লিখতে পারে চেহারাতে রূপ না থাক একটা ধাঁজ আছে, লোকে তার প্রীতিভাজন হতে চায় —তারাই প্রীতি নিবেদন করে আগে, তার নিদর্শন আনন্দ সেই কিশোর বয়স থেকেই আদায় করতে শিখেছে। এ জীবনে কত জনের কাছে কত টাকাই যে সে পেয়েছে—কেউ প্রীতিবশত দিয়েই দিয়েছে। কেউ বা ধার হিসেবে দিয়েছে। কিন্তু আনন্দ সে শোধ করেনি। আগে লজ্জা হত, এখন আদৌ হয় না। কেন হবে? এ তার পাওনা। দুনিয়ার গুণী সে, সে কষ্ট পাবে টাকার অভাবে আর কতকগুলো বেনে মুদী এরা লোক ঠকিয়ে টাকার স্তূপের উপর বসে থাকবে। কোন্ আইনে কোন্ নিয়মে? সে অনিয়ম যে কোন পথে লঙ্ঘন করে সে চলে। বেশি উপার্জন যখন সে করেছে তখন সে যে কত লোককে দিয়েছে তার হিসেব ভদ্রসমাজ জানে না। সে নিজেও রাখে না। ভিক্ষুক জানে। কিন্তু তারা কে-কোথায়—কে জানে? কিন্তু এক জায়গা খুঁজলে আজও মিলবে! কিন্তু সে যাক। কীর্তির অহঙ্কার তার আছে। সেই বলেই তার হিসেব দিতে যাবে না সে।

হিসেব। হিসেব করে কি ঘর ছেড়েছিল সে? হিসেব করে জেলে গিয়েছিল সে?

১৯৩১ সালেই সে জেলে গিয়েছিল। সভাপতি মশায় তখন জেলে গেছেন, বাড়িতে বলে গেছেন। আনন্দ এখানেই থাকবে। ওর ভরণপোষণের সব ভার আমি নিয়েছি।

আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। আনন্দ তখন শহরে সুপরিচিত। শহরের ভাল একজন গাইয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। সেখানে গান শেখে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ইস্কুলের ছেলেরা তাকে আঙুল দেখিয়ে কথা বলে। গার্লস ইস্কুলের মেয়েরা দেখতে পেলে পরস্পরের গা টিপে ইশারায় কথা বলে। সে খুশি হত নিশ্চয়। কিন্তু তার বেশি কিছু না। বিশ্বাস কর। আনন্দ মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ স্টেশন এবং শহরের মধ্যে যে প্রান্তরটা পড়ে আছে, সেই প্রান্তরে একদিন সন্ধ্যার সময় ডাক লুঠ হয়ে গেল। রানারকে আক্রমণ করে তাকে ঘায়েল করে পোস্টব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেল কারা। আহত রানার বললে, তাদের মাথায় পাগড়ি ছিল, মুখে কাগজের ফেটি বাঁধা ছিল, সংখ্যায় জন-চার কি পাঁচ।

বাস বিখ্যাত বা কুখ্যাত সামসুদ্দিন এস. পি. ডাকাতিটাকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করলে কংগ্রেস সভাপতির মেজছেলেকে আর একজনকে তার সঙ্গে তাকে।

সে অত্যাচারের কথা স্মরণ হলে আনন্দ রায়ের দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। ওঃ! কংগ্রেস সভাপতির ছেলেটির বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিল।

আনন্দ রায়ের এই যে সামনে দুটো দাঁত সোনা-বাঁধানো—এই দুটো বুট সুদ্ধ পায়ের লাথি মেরে নিজে ভেঙেছিল সামসুদ্দিন এস. পি.।

তাকে বার বার অ্যাপ্রুভার হতে বলেছিল। বলেছিল, তুমি অ্যাপ্রুভার হয়ে যাও। আমি কোরান ছুঁয়ে বলছি। তোমাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেব গান শিখতে; গোয়ালিয়র যেতে চাও। সেখানে পাঠাব। পাঁচ বছর তোমার শেখার খরচ গভর্নমেন্ট দেবে।

আনন্দ রায়কে আজ তুমি স্কাউন্ড্রেল বললে? বল! সে দিন প্রচণ্ড নির্যাতন সহ্য করতে আনন্দ মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। সামসুদ্দিন এস. পি. অধীর হয়ে উঠে—মুখ খুলবি নে তুই রাস্কেল হারামীকে বাচ্চা। বলেই বুটসুদ্ধ পায়ে মারলে লাথি মুখে। দুটো দাঁত ভেঙে গেল। রক্ত গড়িয়ে এল। পড়ে গেল আনন্দ। পড়েই থাকল। কিন্তু মুখ সে খোলেনি। পিঠে পাঁজরায় লাথির-পর-লাথি চালিয়ে গিয়েছিল এস.. পি। কতক্ষণ বা কতগুলো লাথি হাঁকড়েছিল সামসুদ্দিন এস. পি. তার হিসেব আনন্দ রাখেনি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ছ-মাস বিচারধীন অবস্থায় রেখে অবশেষে মামলা তুলে নিয়ে তাদের ডিটেনশনে রেখে দিয়েছিল সামসুদ্দিন সাহেব। আনন্দ ছিল বছরখানেক।

আনন্দর জীবনে বেহিসেবির মধ্যে হিসেবিদের চেয়ে বেশি ফল ফলে আসছে চিরকাল। জেলখানার দেড়টা বছর তার শ্রেষ্ঠ ফল ফলার সময়।

গাইয়ে আনন্দ কবি হয়ে উঠল। স্বল্পবিদ্যা আনন্দ ছিল পুকুর ঘাটের ছোট্ট শিশু। সে অকস্মাৎ বেড়ে উঠে জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবুরী না হোক পাকা সাঁতারু হয়ে উঠল। মণিরত্ন না পাক। ঝিনুক শাঁখ কুড়িয়ে পেল অনেক।

মণিরত্নের উপর ঝোঁক ছিল না তার। ঝিনুক শাঁখ তার খেলার উপকরণ। আসলে সে ধরতে চেয়েছিল তিনটি জিনিস। তাই ডুব দেওয়ার চেয়ে উপরে সাঁতার দিয়ে ভেসে থাকার দিকেই ঝোঁক পড়েছিল। সে সংগ্রহ করতে চেয়েছিল সমুদ্রের কল্লোলের মধ্যে যে বিচিত্র সঙ্গীত আছে—তারই সুর, তারই ভাষা, তার ঢেউয়ের দোলায় দোলায় যে নৃত্য ছন্দ আছে সেই ছন্দ আর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ছড়ানো মাখানো যে চন্দ্র-সূর্যের প্রতিবিম্ব তারই দীপ্তি। জেলখানায় বই পড়লে আর গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজালে। গান লিখলে সুর দিলে। এরজন্যে তুমি বিলাসী বল? বলতে পার।

আনন্দ তো হিসেবি নয় কোন কালে। সে মণিরত্ন সংগ্রহ করে ধনী হতে পারলে পুজো পাওয়া যায় জেনেও এবং সে শক্তি তার থাকলেও ও-হিসেবের দড়িতে আটকা পড়েনি কোন কালে।।

কিন্তু বিশ্বাস কর। সে ঠকাতে চায়নি পৃথিবীকে।

সে তখন অগ্নিশিখার মতো প্রদীপ্ত পবিত্র, পৃথিবীকে পুড়িয়ে খাঁটি করতে চায়। তবে হ্যাঁ, হবিতে কামনা ছিল বইকি।

ওগো। এ তোমাদের পুরনো উপমার হবি নয়। নারী নয়। হবি বলছি যশকে অর্ঘ্যকে মহাশক্তির কাছে আনন্দ চিরদিন চেয়েছে—'বিদ্যাবন্তং যশোস্বন্ত মাং কুরু!' লক্ষ্মীবন্তং শব্দটা ওর সঙ্গে জুড়তে চিরদিনই বাধে তার। তবে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'—এ সে অকুণ্ঠ জিহ্বায় উচ্চারণ করে।

তা তার প্রার্থনা তার অন্তরস্থ মহাশক্তি শুনেছেন। পূরণ করেছেন। রূপ তার আশ্চর্য রকমে বিকশিত হয়েছে। সে যদি বাড়িতে পিতৃভক্ত সন্তান হয়ে থাকত। তবে সে শীর্ণ অপটুদেহ পল্লীবাসীর রূপ পেত। পুরনো পল্লীবাসীর কথা তুলে না। জেলখানায় ডিটেনশান ভাল খেয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করে তার দেহ আশ্চর্য রূপ ও সুষমা লাভ করেছে। সে লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল। দেহ পেশীপুষ্ট হল। মাথায় লম্বা চুল। মার্জিত মুখচ্ছটা। জেলখানা থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে যখন সে এল—তখন তাকে দেখে সভাপতি পুলকিত হয়ে বলেছিলেন—আনন্দ! আরে। এ যে আনন্দময় মূর্তি নিয়ে ফিরে এলে!

উপবিষ্ট এক বৃদ্ধকে বলেছিলেন—ডাব-মতো সেই মুখচোরা গ্রাম্য বালকটিকে মনে আছে? আবার তার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—এ যে তুমি হিরো হয়ে উঠেছ হে।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে তাঁরই অনুরোধে সে গান শুনিয়েছিল। সেদিন অন্য কারও গান সে গায়নি। শুধু নিজের গানই গেয়েছিল। প্রথমেই গেয়েছিল, তার সেই বহু বিখ্যাত গানটি—

'বন্ধনজর্জর চিত্তের ক্রন্দনে নয়নের
অশ্রু সম্বর রে!
ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে ঘনঘটা ছেয়ে দিক বিশুদ্ধ
জীবনের অম্বর রে।
ডম্বরু বাজবে, ডম্বরু বাজবে, নটরাজ নাচবে
নটরাজ নাচবে।
বন্ধন নাশবে মুক্তি সে আসবে—
গৌরীর হাস্যে শিবরূপে প্রশান্ত হবে মোর
অশান্ত শঙ্কর রে।
নয়নের অশ্রু সম্বর রে।'

এমনি সুর যে, মুহূর্তে যেন দৃপ্ত ঘোষণায় শঙ্খ বেজে ওঠে। তার উপর নিজের কণ্ঠে গাওয়া নিজের গান। ঘরসুদ্ধ লোক আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখে চোখে জ্বলে উঠেছিল আলো। গান শেষ হতেই সভাপতি প্রশ্ন করেছিলেন—কার গান হে?

একটু হেসে আনন্দ বলেছিল—আমার।

—তোমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি গান লিখতে পার?

—জেলখানায় বসে এবার ওই করেছি।

—গাও। আর একখানা গাও তোমার গান।

আট-দশখানা গান সেদিন সে গেয়েছিল।

গানের শেষে সভাপতি বলেছিলেন—তুমি আর পলিটিক্স করো না আনন্দ। তোমার পথে তুমি চল। কলকাতায় যাও তুমি। এখানে থেকো না। এখানে তুমি মরে যাবে। অবশ্য কলকাতা গেলেই বাঁচবে—তা বলি না। তবে বাঁচতেও পার। কিন্তু এখানে মরতেই হবে।

আজ আনন্দ রায়কে তুমি স্কাউন্ড্রেল বলছ? বল। মনে করো না, আনন্দ রায় স্বীকার করে নিচ্ছে দায়ে পড়ে। কারণ তোমার কাছ থেকে আজ অনেকগুলি টাকার প্রত্যাশা করছি। না, তা নয়। সংসারে সাধারণ মানুষের

আদর্শবাদ অভাবের তাড়নায় তিলে তিলে মরতে থাকে—সামান্য যখন অবশিষ্ট থাকে তখন হঠাৎ একদিন সবটাই ধ্বসে যায়। নদীর ধারের চড়া এমনি করে ভাঙে।

আমি তা নই।

আমি তো ভাঙিনি। অভাব আমার কোনও ক্ষতি করেনি। যত অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, আমি তত কঠিন হয়েছি। ঝড়ে-কম্পনে-আঘাতে যা ভাঙে না, যা ফাটে না, যার ক্ষয় হয় না, তেমনি উপাদান ছিল আনন্দ রায়ের জীবনে। শুধু একটা কথা সে জানত না। বর্ষণে সে গলে।

সেই বর্ষণ—সমাদরের প্রশংসার অজস্র বর্ষণ আনন্দ রায়কে এমন করেছে। আরও একটা সত্য আছে। হ্যাঁ। আরও আছে। সেটা বলবার আগে তোমাকেই প্রশ্ন করব কয়েকটা। উত্তর দাও তো।

উত্তেজিত হয়ে আনন্দ রায় হাত চেপে ধরলে সিনেরিও লেখকের।

—বল। উত্তর দাও। পাপ পুণ্যে বিশ্বাস কর? বল, মিথ্যা কি না ওগুলো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে আনন্দ রায়ের মুখের দিকে। আনন্দের চোখ জ্বলছে। মাথার চুল উড়ছে। সে বললে—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি; বল, ধ্যান ধারণা ধর্ম ঈশ্বর অন্ধ সংস্কার কি না?

—কিন্তু ন্যায় অন্যায় আছে আনন্দ।

—তার ভিত্তি কি? তার বল কি? জোর কিসের? সেও তো এমনি আর একটা ধারণা আর একটা বিশ্বাস?

—তার থেকেও আরও কিছু আছে। সেটা প্রত্যক্ষ, সেটা বাস্তব, সমাজের জোর, আইনের জোর।

—আইনকে বাঁচিয়ে অনেক কিছু করা যায়। শক্তি থাকলে আইনকে ভেঙে ফেলা যায়। আর সমাজ? অট্টহাসি হেসে উঠল আনন্দ।—সমাজকে পরিচালনা করে প্রধানে। প্রধান যারা—সে যে ধনেই হোক, রাষ্ট্রীয় শক্তিতেই হোক আর বিশেষ কোন গুণেই হোক—তারা কেন ভয় করবে সমাজকে।

হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

—তুমি এমন করে হেসো না আনন্দ।

—ভয় হচ্ছে? অট্টহাসি বেড়ে গেল তার।

—না। সইতে পারছি না আমি।

আরও জোরে হেসে উঠল আনন্দ রায়।

তারপর হঠাৎ একসময় সে থেমে গেল। চিন্তাকুল হয়ে সে বাইরের পাঁচিলের ওপাশে বস্তির খোলার চালগুলোর দিয়ে তাকিয়ে রইল। রোদে অপরাহ্ণের আমেজ ধরেছে ঠিক যেন গৌরবর্ণা কোন মহিলার প্রৌঢ়ত্বে ঈষৎ

হরিদ্রাভ বর্ণচ্ছটা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে ক্লান্তিও আছে পরিপূর্ণতার প্রসন্নতাও আছে। দু-চারটে কাক চালের উপর উড়ে এসে বসছে। বাইরে জনকোলাহল সাড়া দিয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আনন্দ রায় বললে—দেখ, সংসারে মানুষ যদি সবচেয়ে বেশি ভয় করে বেশি করে মানে তো সে মানে নিজেকে। তাই নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে অনুভব করার উপলব্ধি করার একটা বিশ্বাস ছিল, সাধনার পদ্ধতি ছিল। যা কিছু মহৎ, যা কিছু শুচি, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পুণ্য পবিত্র, তাই ছিল ঈশ্বরের বিভূতি-মহিমা। সেই মহিমায় নিজেকে মহিমময় করতে পারলেই সিদ্ধ হত মানুষ। ছেলেবেলা থেকে তাই শিখেছিলাম। তাই দিয়ে নিজেকে গড়েছিলাম। তাই দুঃখে বল, আঘাতে বল, কম্পনে বল, ঝড়ে বল—এতটুকু বিচলিত হইনি। অনড় ছিলাম। কলকাতায় ,এলাম, প্রতিষ্ঠা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পেলাম এ যুগের শিক্ষা। ঈশ্বরকে ভাসিয়ে দিলাম কলকাতার খালের জলে। বস্তুজগতের প্রতীক হাতুড়িতে করে ভেঙে টুকরোগুলো একটা করে খালের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আর তাতেই পেলাম হাজার বাহবা—অজস্র করতালি।

একটা ছোট ঘটনা বলি শোন।

মধ্য-কলকাতায় তখন থাকি। একটি বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওখানে যেতাম। স্বামী, স্ত্রী আর তাঁর একটি ছোট মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসার অভাব ছিল না। স্ত্রী ছিলেন শিক্ষিতা আধুনিক। বড় ভাল লাগত। তখন আমি গাইয়ে হিসেবে সমাদর পেয়েছি। কিন্তু কবি হিসেবে সমাদর খুব পাইনি। আমার গানের রচনায় তখন ভাঙার কথা থাকলেও ভগবানের নাম থাকত। সমঝদারেরা বলতেন—এখনও আবেগকে ছাড়তে পারেনি আনন্দ রায়। বাস্তব সত্যকে ধরতে পারেনি।

মধ্যে মধ্যে হ'ত। তর্ক করতাম আমারই বয়সের অতি-আধুনিকদের সঙ্গে, যারা নাকি লিখত—

'আহত অণুর অঙ্গের সদ্যজাগা বস্তুর আলোকে
প্রাণপক্ষী স্বরূপে প্রকট শোলার
তৈরি ফুঃ—মিথ্যা আত্মারাম!
হে আত্মারামের প্রভু মিথ্যে ভগবান—
এবার গুটাও পাততাড়ি
সেলাম প্রণাম।'

এটা অবিশ্যি এমনি এখনি বানিয়ে বলে দিলাম। তবে এমনি ধারায় কবিতা তারা লিখত। ওদের সঙ্গে তর্ক করতাম। বলতাম—তাই যদি হয়, তবে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে যত কল্পনার নীতি আমি মানব কেন? কেন আমি নিজের মুখের খাদ্য অন্যকে দেব? কেন আমি আমার মতো কিছু

প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করব না? ভোগের পথ ছেড়ে কেন যাব ত্যাগের পথে? হাজার 'কেন' আমি একের-পর-এক হাজির করতাম তাদের সামনে।

আনন্দ রায়ের বিদ্যাবুদ্ধি তাদের থেকে কম থাকলেও প্রাণশক্তিতে সে সবল প্রবল চিরদিন। তারা অভিভূত হয়ে যেত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাসত। বলত—মেনো না। ওই সব মেনেই তো আমরা আজ দুর্বল জীর্ণ খোঁড়া কুঁজো। চেয়ে দেখ ইউরোপের দিকে। চেয়ে দেখ।

এই বন্ধুটির সঙ্গেও এই তর্ক হত। বন্ধুর স্ত্রী হাসতেন। মধ্যে মধ্যে তর্কেও যোগ দিতেন। এই তর্কে মধ্যে মধ্যে আর দুজন আসতেন। একজন বন্ধুর স্ত্রীর বান্ধবী—ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বন্ধুর স্ত্রীরই সমবয়সী। আর একজন হলেন আমার বন্ধুটিরই ভাই। সকলে একদিক—আমি একা এক দিক। তর্কে হেরে রাগ করে উঠে চলে আসতাম। থাকতাম একটা খোলার বস্তিতে। আমার দেশের কটি ছেলে সেখানে থাকত। কয়লার ডিপো ছিল তাদের সেখানে। পাইস হোটেলে খেয়ে কাটাতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিকদের বাড়িতে কাগজের অপিসে আড্ডা দিয়ে ফিরতাম। গোগ্রাসে গিলতাম নতুন কালের তত্ত্ববাদ। বিশ্বাস করতে চাইতাম।

প্রকাণ্ড বড় একটা নতুন কাগজের অপিসে যেতাম। সেখানে তখনকার উদীয়মান জ্যোতিষ্কবৃন্দ সপ্তর্ষি মণ্ডলের মণ্ডলটির মতোই একটা বড় চৌকো টেবিলের চারিপাশে বসে থাকতেন—সপ্তর্ষি মণ্ডলের লেজের মতো ওদেরই সঙ্গে যোগ রেখে আর একটা টেবিলে বসত আমার এক বন্ধু—কাগজের সহকারী সম্পাদক তার আড়ালে বিশ্বস্ত অরুন্ধতীর মতোই জুগজুগ করতাম আমি সব পিছনে।

এখানেও ওই কথা। ওই আলোচনা।

ওঃ এখানে যে একদিন বড় বিয়ারের বোতল দেখেছিলাম। এত বড় বিয়ারের বোতল আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সেদিন মনে হয়েছিল। বুঝি বা ওই বোতলটা থেকেই এই সব তত্ত্বগুলো আরব্য উপন্যাসের বোতল-বন্দী দৈত্যের মতো বেরিয়ে এখনও ধোঁয়ার আকারেই ঘুরছে! দৈত্যটা যেদিন চেহারা নেবে, সেদিন কি হবে তাই ভেবে শঙ্কিত হতাম।

যাক। শোন।

হঠাৎ আমার আবার জেল হল।

কবিতায় রাজদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল। একবছর পরে ফিরে এলাম। ফিরে এসেই সন্ধ্যাতেই গেলাম সেই বন্ধুর বাড়ি।

দেখলাম। বন্ধুর স্ত্রী এবং তাঁর বান্ধবী বসে আছেন। আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু সুরটা যেন কাটা কাটা। কি হল? প্রশ্ন করলাম। অমর ফেরেনি এখনও, বলেই আমি যেন বজ্রাহত হয়ে গেলাম। সামনের দেওয়ালেই একখানা ছবির দিকে নজর পড়ল। ফোটো। দেখলাম বন্ধু

অমরের শবদেহের ফোটো। ফুল দিয়ে সাজানো।

ফিরে তাকালাম বন্ধুর স্ত্রীর দিকে। কিছু বুঝতে পারলাম না। বন্ধুর স্ত্রী অনীতার সেই সধবা বেশ। মায় মাথার সিঁদুর।

অনীতার বান্ধবী বললেন, অমরবাবু আজ ছ' মাস হল টাইফয়েডে মারা গিয়েছেন।

আমি অনীতার দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। অনীতার সধবা বেশের অর্থ। সে কি মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে এমন ভাবে অমরকে অনুভব করে যে বৈধব্যকে সে স্বীকার করে না?

অনীতার বান্ধবীর নাম ছিল বোধহয় সুমিত্রা। সুমিত্রা আমার দৃষ্টি দেখে একটু রুষ্টভাবেই বললে, এমন করে তাকিয়ে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে আনন্দবাবু?

আমি অকপটে বললাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সুমিত্রা দেবী।

অনীতাই এবার বললে। আমি আবার বিয়ে করেছি আনন্দবাবু।

—বিয়ে করেছেন? আমি এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অমরকে আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম। তার তর্কে যতই বুদ্ধির ধার থাক সে আমাকে কোপ মারবার সময় সপ্রেমে মর্মস্থলটিকে বাদ দিয়ে মারত। মধ্যে মধ্যে একান্তে বলত। আনন্দ কি জানিস ভাই, মধ্যে মধ্যে মনে হয় হয়তো তুই-ই ঠিক, কিন্তু—। এরই জন্যে অমরের মৃত্যুর পর ছ-মাসের মধ্যে অনীতা বিয়ে করেছে শুনে আঘাত পেলাম। তাই বিস্ময়ের সুরের সঙ্গে হয়তো খানিকটা ভর্ৎসনাও মিশে গিয়েছিল।

অনীতা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কথার জবাব দিতে পারলে না।

সুমিত্রা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললে, বিধবার বিয়ে বুঝি আপনি সমর্থন করেন না? এত বড় রি-অ্যাকশনারী আপনি? ওই মেয়েটার সুদীর্ঘ জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টি পড়ছে না আপনি এত কুসংস্কারে অন্ধ? আর আপনি সাহিত্যিক?

আমি বললাম। অনীতা দেবী আরও দু-বার চারবার বিয়ে করুন আমার আপত্তি নেই। তবে অমরের স্ত্রী এত শীগগির অমরকে ভুলে গেল তাইতে আমি আঘাত পেয়েছি সুমিত্রা দেবী। আর একটা কথা বলব, মেয়েটির সুদীর্ঘ জীবন বলে বেশ একটি মনোরম লাগসই লাইন বলে গেলেন। তারই উত্তরে বলব। আপনিও তো নারী, দেহটা তো আপনারও রক্তমাংসের। জীবন তো আপনার সম্মুখেও সুদীর্ঘ, শুনেছি আপনি চিরকুমারীই থাকতে চান। এ যুগে শিক্ষিতা মেয়ে, আজীবন কুমারীও অনেকে আছেন। তাঁরা যদি থাকতে পারেন, যে দুঃখটা পান তাকে সইতে পারেন এই ভেবে যে, সত্যিকার প্রিয়জনকে যখন পেলাম না তখন দেহের কষ্ট সহ্যই করব। তা হলে সে কষ্ট সহ্য করে মেয়েটাকে অবলম্বন করে অমরের স্মৃতিকে নিয়ে নয়

আজীবন বৈধব্যই পালন করত অনীতা।

আমি আর দাঁড়াইনি। চ'লে এসেছিলাম।

অনীতা কাকে বিয়ে করেছিল জান? বিয়ে করেছিল। অমরের সেই প্রগতিবাদী ভাইকে। যে অমরদের আসরে আসত, তর্ক করত, এবং প্রেমটা হয়েছিল কখন জান? অমরের মৃত্যুশয্যায়। টাইফয়েডে অমরের সেবা করতে এসেছিল ওই ভাইটা। কি নাম যেন? আজকাল সে একটা খুদে নেতা হে!

এমনি করেই একে একে আমায় মনের ঈশ্বর—মাটির পুতুল হ'ল, ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলাম ফেলে খালের জলে।

ওদিকে আমাকে কেন্দ্র করে হতে লাগল বর্ষণ।

সে যেন আমি মরুর বুকের পাহাড়। হঠাৎ কোন্ মন্ত্রে কোন্ কুহকে মাথার উপরে জমে এল, মেঘের মধ্যে সর্বোত্তম মেঘ, পুষ্কর মেঘ—

কালিদাস পড়েছ?—

'জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং—
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।'

পড়েছ? পড়নি!

হাসতে লাগল আনন্দ রায়।

আনন্দ বললে, তারপর আনন্দ রায় মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আকণ্ঠ পান করলে বিষ!

হাসলে সে ভূপতির দিকে অর্থাৎ সিনারিও-রাইটারের দিকে তাকিয়ে। বললে—তুমি রামায়ণ-মহাভারত পড়নি। পড়লেও ভুলে গিয়েছ—চেষ্টা করে ভুলে গিয়েছ। বিশ্বাস কর না। থুথু ফেল।

—কি যা তা বলছ তুমি? ক্যানাবিস ইন্ডিকা খেয়েছ নাকি?

—উরুদেশে গদাঘাত করছ?

—এ যুগে গদার মতো একটা বর্বর স্থূল অস্ত্র আমি ব্যবহার করি না আনন্দ।

—ভাল যদি বলি, কোমরবন্ধের নিচে লাথি মারছ?

—**That's good**—ওটা চলতে পারে। কিন্তু তা আমি করিনি।

হেসে আনন্দ বললে। এই মন্তব্যই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। ওতেই প্রমাণ আছে—তুমি মহাভারত ভুলে গেছ।

—**I see!** সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ ছেড়ে ভূপতি বললে, তোমার চাতুরী দেখছি ইতি গজের চেয়ে কম নয় আনন্দ। হা-হা করে হেসে উঠল আনন্দ, বললে। মহাভারত প্রমাণ করছ? তা হ'লে লজ্জা পেয়েছ দেখছি। পাবারই কথা। খাঁটি বাঙালীর—বিশেষ খাঁটি বাঙালী হিন্দুর মতোই কথা বলেছ হে। এইটেই হচ্ছে আমাদের আসল চেহারা।

—কোন্ দিকে তাড়িয়ে কোন্ কোণে পুরতে চাচ্ছ বল তো ?

—ঠিক যে কোণের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়ে আমরা তাণ্ডব নৃত্য করছি।

—কোন্ কোণ সেটা ? ঈশান, না অগ্নি, না নৈঋত, না বায়ু ?

—উঁ-হু, ও চারটের কোনটা নয়।

—তবে এটা কোন্ কোণ ?

—দিক আর বিদিকের মধ্যের কোণ এটা অথবা না-ঘাট ও না-ঘরের মধ্যের কোণ বলতে পার। পাকিস্তান থেকে ঈশ্বরের যে রূপ এবং নামকে যে পদ্ধতিতে উপাসনা করবার অধিকার বাঁচাবার ভয়ে ঘর-দোর-বিষয়-সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে যে কোণে দাঁড়িয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে নিরীশ্বরবাদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলে বস্তুবাদের ধ্বজা ওড়াচ্ছি এটা সেই কোণ হে। দিক আর বিদিকের মধ্যেও বলতে পার আবার মর্ত এবং রসাতলের সন্ধিস্থলও বলতে পার ? আমি তো পশ্চিমবঙ্গের লোক ভূপতি—বঙ্গ বিচ্ছেদে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষতি হয়নি। তুমি পূর্ববঙ্গের লোক। বল তো তুমি পালিয়ে এলে কেন ? স্রেফ জাত মানে হিন্দু ধর্মটাকেই বাঁচাতে নয় কি ? ইণ্টেলকচুয়ালি যেটাকে তুমি বরবাদ দিতে চাও ? তুমি তো নিরীশ্বর-বাদী হে। খাঁটি মেটিরিয়ালিস্ট, ভেবেচিন্তে জবাব দিয়ো তো।

ভূপতি চুপ করে রইল। মুখখানা তার লাল হয়ে উঠেছে।

আনন্দ বললে ভূপতি। এই কালটা আমাদের জীবনের সেই কালের মতো কাল হে, যে-কালে সমুদ্রমন্থনে অমৃত আর বিষ উঠেছিল এবং মহাকাল মোহিনী মায়ায় ভুলে ওই বিষ আকণ্ঠ পান করে হতচেতন হয়ে তাণ্ডবে সব ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। মোহিনী-মায়ায় ভুললে ওই হয়।

হঠাৎ আবার আনন্দ পাল্টে গেল। চোখে-মুখে ক্ষুব্ধ দীপ্তি ফুটে উঠে বিষণ্ণ অথচ প্রখর তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। বললে, সেকালে আনন্দ রায়েরও হয়েছিল তাই। মহাভারতের ভারতবর্ষে জন্মে যে আনন্দ রায় জীবন-সাধনা শুরু করেছিল ব্যাস-বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথের পথে সে হঠাৎ মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বস্তুসর্বস্বতাবাদের বিষ আকণ্ঠ পান করে এই আনন্দ রায় হল।

আর একটা গল্প বলি শোন।

ওই সুমিত্রা। অমরের স্ত্রীর বান্ধবী, যে আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছিল। সে আমাকে একদিন প্রকাশ্য সভায় অপমান করলে। অমর নেই, অমরের স্ত্রী বিবাহ করেছে সে বাড়িতে আমি আর যেতাম না। এই নিয়ে সুমিত্রা আমার নিন্দা করে বেড়াত। কিন্তু তাতে আনন্দ রায়ের ক্ষতি ছিল না। আমার গানের ভাবের আদর থাক বা না থাক কণ্ঠস্বরকে অবজ্ঞা করবার তো শক্তি কারুর নেই। ওই গুণে আমার সমাদর বাড়ছিল। সুমিত্রা মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখত। তর্ক করত।—এইসব কেন লিখছেন ? কেন দেশকে উস্কেয়ে দিচ্ছেন ? ভবিষ্যতে দেশের লোক আপনাকে মুছে দেবে ইতিহাস

থেকে। আমি একবার লিখেছিলাম—সে ইতিহাসকে মহাকাল মুছে দেবে এ আমি স্থির জানি। তাই ইতিহাসে নামের জন্য আমি ব্যস্ত নই। তার উত্তর সে কি গালাগাল দিয়ে পত্র।

এই সুমিত্রা একদিন আমার কাছে এল। সঙ্গে আরও কজন অতি-আধুনিক বিদগ্ধ ব্যক্তি। কি? না, একজন আধুনিক সাহিত্যিককে অভিনন্দিত করা হবে। টাকার তোড়া দেওয়া হবে। সেই সভার উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে হবে আমাকে। কিছু বলতেও হবে।

আমি খুশি হয়ে রাজী হলাম। সাহিত্যিকটির মতবাদ বা সাহিত্যকর্মের উপর আমার অনেক বিরুদ্ধতা ছিল। কিন্তু এই মানুষটির উপর শ্রদ্ধা ছিল। যাকে বলে খাঁটি আদর্শবাদী লোক। ভিতরে-বাইরে-বিশ্বাসে-কর্মে দু-প্যাঁচের খেলা খেলতেন না তিনি। ফলে একটি শুদ্ধ মানুষের সম্ভাবনা তাঁর জীবনে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। এই কারণেই রাজী হলাম এবং ফর্দ দেখলাম যে যাঁরা আসছেন সভায়, তাদের মধ্যে ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের প্রভৃতি নেই কে? নেই বলতে এক সূর্য অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। ওটাও একটা আকর্ষণ ছিল। কুবের ছিলেন সভাপতি।

হঠাৎ হাসলে আনন্দ।

বললে ভূপতি। একটা কথা বলতে পার?

—বল। চেষ্টা করব। তোমার কথা এমন বাঁকা যে তাকে সোজা করে নিয়ে জবাব দিতে সময়ের দরকার করে।

—এটা কিন্তু খুব সোজা ভূপতি।

—বল।

—আচ্ছা। কুবেরের সারা জীবনে তো একবার একটি পুণ্যকর্মের সন্ধান পাই। সেই সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার সময় শিবানীকে রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে-ছিল। স্বর্গলোক বরবাদ যাক হে, ওখানে যেতেই কেউ চায় না; সেখানে যা হয় তা হয় কিন্তু মর্ত্যলোকে বিংশ শতাব্দীর ইনকিলাবি-যুগে সে কেন ভাই আমাদের মধ্যে মধ্যমণি সেজে বসে?

ভূপতি গম্ভীরস্বরে বললে, আনন্দ, আবার তোমাকে বলছি তুমি স্কাউণ্ড্রেল।

—বল। বলতে পার। ওটা আমার গায়ে লাগে না।

—হ্যাঁ, সবচেয়ে নিচে নেমে গেছ তুমি। ওঁর কাছে গিয়ে কখনও হাত পেতে দেখেছ।

—হাত আনন্দ জীবনে কারও কাছে ভিক্ষে নিতে পার্তেনি। ধার বলে নিয়েছে সর্বত্র। এত বড় মহাজনের কাছে তার যাবার প্রয়োজন হয়নি। রুচিও হয়নি। আজও তোমার সাহায্যে টাকা পেতে চাই আমি, কিন্তু বিনা কর্মে নয়। কর্ম করে নিয়ে। যাকগে, শোন। সভায় আমার গান শুনে সকলেই

খুব খুশি হয়েছিলেন। বোধকরি কর্মসূচীর মধ্যে আমার গানই হয়েছিল সবচেয়ে উপভোগ্য। আমাকে বক্তৃতা করতে বলা হল। বললাম আমি তাঁর শুভ্র-শুদ্ধ মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে বললাম। 'তিনি হলেন সর্বাগ্রে একটি বড় মানুষ। পবিত্রাত্মা মানুষ, ভাল মানুষ, ওইটিই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শিল্পীর চেয়েও এই মানুষটিকেই আমি বড় বলে মনে করি। এর চেয়ে বড়ত্ব আর সংসারে হয় না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁকে আমি আজ প্রণাম জানাচ্ছি।'

ঘাড় নেড়ে হাসতে লাগল আনন্দ।

বললে, হায় হায় হায়। তোমাকে কি বলব ভূপতি, আমি বসবার পর প্রতিটি বক্তা উঠে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে বললেন—মানুষের চেয়ে শিল্পী বড়। শিল্পীর জীবন কি শিল্প দিয়ে বিচার করব আমরা। সে কেমন মানুষ? কি তার চরিত্র সে বিচার বড় কথা নয়। একজন শিল্পী যদি ভ্রষ্ট চরিত্র হয় তার বিচার আমরা করব না।

সুমিত্রা তো উঠে আমাকে গালাগাল দিয়ে বক্তৃতা করলে। মায় সভাপতি পর্যন্ত। তাঁর অভিনন্দন সভায় তাঁর মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে আমার হ'ল লাঞ্ছনা। সভার শেষে আমি সভাপতির কাছে গেলাম। বললাম—আমি দুটো কথা জিজ্ঞাসা করব? হেসে ঘাড় নেড়ে সভাপতি বললেন—শিল্পীত্ব বড়, না, মনুষ্যত্ব বড়?

—হ্যাঁ। শিল্পসাধনাই বলুন আর যে সাধনাই বলুন, সে মানুষ করে কি জন্যে?

—মানুষের কল্যাণের জন্যে?

—আত্মশুদ্ধি আত্মবিকাশ আত্মকল্যাণ নয়?

—মানুষের কল্যাণের সঙ্গে তার যদি তা হয় তবে সেটা তার নিজের লাভ। মানুষ যদি কল্যাণ না পায় তবে তাকে তার প্রয়োজন কি? আপনার গানের কণ্ঠস্বর ভাল। অবশ্য আপনার রচনা আমার ভাল লাগে না। নতুন কালের ভাবের সঙ্গে তার বিরোধ আছে। সে যাক। এখন যদি আপনি মদ্যপ হন, ভ্রষ্টচরিত্র হন তাতে আমার কি? আমি গান শুনে তৃপ্তি পেলে আপনাকে ভালবাসব শ্রদ্ধা করব। কিন্তু আপনি যদি গান গাইতে না পারেন অথচ একটি নিরীহ সৎলোক হন তবে আপনাকে করুণা করতে পারি, ভিক্ষা দিতে পারি এই পর্যন্ত। তার বেশি কি?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তিনি হেসে আবার বললেন, পড়াশুনা করুন আপনি। আপনার মধ্যে ধাতু আছে। তাকে জ্ঞানের হাপরে পুড়িয়ে পিটে-গড়ে তলোয়ারের মতো শানিয়ে তুলুন।

আমি বললাম, ভ্রষ্টচরিত্র শিল্পীকে আমি প্রশংসা দেব। প্রণাম কেন

করব ! কারণ—

পিট চাপড়ে তিনি বললেন, পড়ুন পড়ুন। আজ আর সময় নেই ! আসবেন একদিন আমার বাড়ি।

হঠাৎ সুমিত্রা মুখ বাড়ালে পাশ থেকে। হেসে বললে—আনন্দবাবু গোঁড়া হিন্দু। উনি বিধবা বিবাহ পর্যন্ত সমর্থন করেন না।

—হে ভগবান। তাই নাকি !

পাশের লোকেরা হেসে উঠল।

সভাপতি বললেন, না-না-না। এসব চলবে না। আপনাকে প্রগ্রেসিভ হতে হবে !

বেরিয়ে এলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। কান দুটো থেকে যেন উত্তাপ বের হচ্ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলে সুমিত্রা।

—আনন্দবাবু। দাঁড়ান, দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম। আসতেই বললাম, আপনি অর্ধসত্যটাকে সত্য বলে চালালেন কেন। আমি তো তা ঠিক বলিনি।

—কি বলেছেন ?

—আমি আপনাকেই প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি আজও বিয়ে করেননি, শুনেছি করবেনও না। আপনার মতো একালে আরও অনেক মেয়েই রয়েছেন। সুতরাং অমরের স্ত্রী অমরের স্মৃতিকে নিয়ে—মেয়েটিকে নিয়ে বিয়ে না করে থাকার একটা মারাত্মক আত্মনির্যাতনের কথা ওঠে কি ক'রে ? আমি অভিযোগ করে থাকলে অমরকে ভাল না বাসার অভিযোগ করেছি।

—আপনাদের ওই ভালবাসার পরিকল্পনাটি যে অবাস্তব আনন্দবাবু। সুমিত্রার মুখে বক্রহাসি দেখা দিল।

কথা বলতে বলতে কোন্ পথে কোন্ দিকে চলেছি খেয়াল ছিল না। খেয়াল যখন হল তখন দেখি, সুমিত্রার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। সে ছাড়লো না। তা বাড়ি নিয়ে এল। বললে—অনেক গাল দিয়েছি। বাড়িতে কিন্তু মিষ্টিমুখ করাব।

চা খেয়ে জল খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। সুমিত্রা কয়েকখানা বই দিলে। বললে এগুলি আপনি পড়ুন। আনন্দবাবু, আপনি জানেন না আপনার মধ্যে কত শক্তি। আমি জানি। আপনি কিছু পড়াশুনা করুন তো ; তারপর ঝগড়া করবেন আমার সঙ্গে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আনন্দ বললে, বাস, ছ-মাসের মধ্যেই আমার পুরানো আমিকে মাটির পুতুলের মতো ভেঙে-চুরে গঙ্গার জলে না কলকাতার গালিফ স্ট্রীটের পাশের খালের জলে ফেলে দিলাম। গালিফ স্ট্রীটের পাশে যে মারাঠা ডিচ্, ওখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে জান ? যায় সুন্দরবনের দিকে !

ওই লঞে চড়ে সপ্তাহে একদিন করে আমি আর সুমিত্রা বেড়াতে যেতাম। আমি গান গাইতাম—নতুন গান। এই যে সব গানে আনন্দ রায় হাউয়ের গতিতে আকাশে উঠে ফুলঝুরি সৃষ্টি করেছে সেই সব গান। সুমিত্রা বলত এই তো। এই তো!

সুমিত্রাকে আমার গুরু বলব না। তবে সে আমার চোখে কাজল পরিয়ে জীবন এবং জগৎকে নতুন রঙে নতুন রূপে দেখিয়েছে। ও কথাটা বললাম কেন জান? এদেশের শাস্ত্রে একটা শ্লোক আছে যার অর্থ হচ্ছে—জ্ঞানাঞ্জনের শলাকা প্রয়োগে যিনি নতুন দৃষ্টি খুলে দেন তিনিই গুরু। সুমিত্রা আমার সখী আমার মোহিনী। তফাত একটু আছে। মোহিনী ধরা দেয় না। ধরতে গিয়েও ধরা যায় না। সুমিত্রাও তাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত মোহিনী পড়ল মোহে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে ডাগর চোখ মেলে অনুরোধ জানালে, ধর হাত।

কি করব আমি? আমার জীবনে তখন এসেছে বেগ। থামাই কি করে নিজেকে? আবেগ হলে সামনে যা পড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমার জীবনে তখন আবেগ কেটে গেছে। কাটিয়ে দিয়েছে ওই সুমিত্রাই। জীবনের গতিবেগ তখন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমার সামনে তখন ডলি আর বেবী।

ওই সুমিত্রাই তো আমার সামনে তাদের এনে ধরলে।

সুমিত্রার চরিত্র তো অনুমান করতে পার। ওর জীবনটা হলো কোন বাঁধ বা বাঁধন না-মেনে চলার জীবন। বাঁধ-ভাঙা জলস্রোত। কোন একটা নির্দিষ্ট খাত-পথ বেয়ে চলে না, সামনে যত খাত যত পথ মেলে খালের মুখে তার সব খাতেই সে খানিকটা খানিকটা জীবনস্রোত চালিয়ে দেয়। কোন একটা নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অথচ সকল দলের সঙ্গেই ছিল তার মাখামাখি। ফাইন আর্টস এক্‌জিবিশন থেকে নারী-অনুশীলন পর্যন্ত। ধন-কুবেরের পত্নী থেকে রাজনৈতিক দলের বিপ্লববাদিনী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই ছিল পরিচয়। শুধু যেখানে শাঁখা-নোয়ার দৃঢ়তা বেশি সেখানে সে যেত না। অর্থাৎ যে-সব বিপ্লববাদিনী ওগুলো মানত, তাদের প্রতি ছিল বিরূপ এবং তাদের সে স্বীকারই করত না বিপ্লববাদিনী বলে। শাঁখা নোয়া তো বন্ধন। ও সুমিত্রা মানতে পারে না। জীবনকে মুক্ত রেখে যতটুকু বন্ধন স্বীকার করা যায়, তার চেয়ে বেশি একটা চুলের বাঁধনও সইতে রাজী ছিল না।

মধ্যে মাঝে লঞে বসে এই প্রসঙ্গ উঠলে হেসে বলত, দেখ না! চুল ছেঁটে সেই জন্যে খাটো করেছি।

তার শ্যাম্পু-করা খাটো চুলগুলির মধ্যে আমি হাত বুলিয়ে দিতাম। রেশমের মতো নরম চুল, মিষ্টি একটি গন্ধ নাকে এসে ঢুকত। মধ্যে মধ্যে

একটা কথা মনে হতো। একদিন বলেছিলাম সুমিত্রাকে।

গতি গতি করে প্রচণ্ডবেগে ছুটতে ছুটতে যেন উল্টোপথে সেই পিছনে এসে হাজির হচ্ছিল সুমিত্রা।

—মানে ?

—দেখ, তোমরা সেই অতীত কালের ছাঁটা-চুল, সাদা-কাপড়, খালি-হাত করে ফেললে গো।

খিলখিল করে হেসেছিল সুমিত্রা। বলেছিল, মন্দ বলনি। কিন্তু তারই মধ্যে যে আমরা নতুন। কত প্রভেদ ভাব তো ? ছাইয়ের বদলে পাউডার !

হাসলে আনন্দ রায়।

কিন্তু ওইখানেই সুমিত্রার ভুল। ওই পাউডারের গন্ধে বিভোর হয়ে যারা থাকে তারা বুঝতে পারে না ফাল্গুন ফুরিয়ে গেল, ফুল ঝরে গেল, পরম লগ্ন চলে গেল ! বৈশাখী ঝড়ে জলে মুখের পাউডারের প্রলেপ উড়ে যাবে ধুয়ে যাবে—তখন নিজেই উঠবে শিউরে নিজের দিকে তাকিয়ে। গান গেয়ে ওকে সে কথা সেদিন বলতে চেয়েছিলাম।

'জীবন পরম লগন ক'রো না হেলা, ক'রো না হেলা, হে গরবিনী !'

সে হেসে আমার কপালে টোকা মেরে বলেছিল, আর তোমাদের রবি ঠাকুর চলবে না। এত ক'রেও তোমাকে ঠিক একালের নতুন মন দিতে পারলাম না।

সেদিন সুমিত্রা কিছু বললে না। পরের দিনই আমার আস্তানায় এসে হাজির হলো, দুই বন্ধুকে নিয়ে। একালের সাহিত্যিক রথী না হলেও, ঘোড়-সওয়ার বলতে পার। মাফ কর ভূপতি, বলা উচিত জিপ-সওয়ার। র‍্যাঙ্কে অফিসার হলেও বড় জোর ক্যাপ্টেন জাতীয়। হলে কি হবে, আমার চেয়ে স্পীড বেশি। বললে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, আপনাকে আমাদের আসরে। ওদের কাছেও শিখলাম অনেক।

এই এদেরই আয়োজন নারী-অনুশীলন সমিতি।

এদের দলের সঙ্গে সুমিত্রার বন্ধন ছিল না, কিন্তু যোগ ছিল। বলেছি তো সুমিত্রা কোন দলের মধ্যে বাঁধা ছিল না কিন্তু সব দলের সঙ্গেই ছিল যোগাযোগ। ডাকলেই যেত। দিনকতক সমিতির ওই হল নেত্রী। ওরই টানে আমি যেমন গেলাম, তেমনি এল—ডলি, বেবী। প্রথম দিনই সেই সভায় ওদের রুখু খাটো চুল, লাল বেনারসী, ঠোঁটের রক্তাভা, খালি হাত—বলে দিলে সুমিত্রার পরের মানুষ এরাই ; সুমিত্রা যতটা গিয়ে পড়বে, তারপর থেকে এরা দৌড়বে। দৌড়তে যখন হবেই এবং সুমিত্রার দৌড়শক্তির চেয়ে আমার দৌড়বার শক্তি যখন অনেক বেশি, তখন পথ-প্রদর্শিকা হিসেবে আর সুমিত্রার পিছনে ছুটব কেন ? মেয়ে দুটিও ডাকলে।

সভাতেই একটা কাণ্ড ঘটল।

যে সাত-আট বছরের মেয়েটিকে আমার গলায় মালা দিতে দিয়েছিল, সে মালাখানি পরিয়ে দিলে ওই দুই বোনের বড়—ডলির গলায়। ডলিকে দেখনি ভূপতি। দ্রাবিড়ী গড়ন, বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ রং, একটু খাটো একটু বাঁকা নাক। ঠোঁট দুটি ঈষৎ মোটা। মানে—শ্যামা বলতে সত্যি যেরূপ মনে ভেসে ওঠে সে তাই। ঋতুর মধ্যে বর্ষার সঙ্গে তার তুলনা। এমনি চঞ্চল, এমনি বর্ষণ-মুখর। বোঝ না ভাই, সভাপতির মালা তার গলায় ভুল করে পরিয়ে দেওয়ায় সে অপ্রতিভ হলো না, সে অসংকোচে মুহূর্তে মালাখানি নিজের গলা থেকে খুলে, ওই এতলোকের মধ্যেও আমার গলায় পরিয়ে দিলে। এই বেবীও তখন মাথায় ডলির থেকে লম্বা দূর থেকে মনে হতো পঞ্চাবিনী হবে বা। সে চট করে চন্দনের বাটি নিয়ে পরিয়ে দিল আমার কপালে।

সুমিত্রা সেই দিনই সন্দেহ করেছিল।

সভা থেকে বেরিয়ে এলাম। সুমিত্রা বিদায় দিতে এসে বললে, চমৎকার।

—কি? বক্তৃতা? বক্তৃতা আমি ভালই করি, তুমি জান?

—উঁহু শুধু বক্তৃতা কেন?

—ঈর্ষা? টুপ করে কথাটা ছুঁড়ে মারলাম।

সে মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে, খেলতে এসে হারিনে। হারলেও কাঁদিনে। আমি খেলুড়ে বন্ধু।

—তোমার জয় হোক। বলে চলে এসেছিলাম সেদিন।

তার পরই দুই বোনের হানা আমার আস্তানায়। আমাদের বাড়ি যেতে হবে। সোজা বললাম, দেখ আমি গরীব। আমার সময়ের দাম আছে। আমি গান গেয়ে টাকা নিয়ে থাকি।

ওরা বাইরে গিয়ে কি পরামর্শ করে ফিরে এসে একখানা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, ও আমরা শুনব না। যেতেই হবে আপনাকে। এই খামে ঠিকানা পথের ডিরেকশন সব লেখা আছে।

খামখানা হাতে দিয়েই ওরা চলে গেল। খামখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে কেমন সন্দেহ হলো। খুলে দেখলাম দশ টাকার নোট তিনখানা আর-একটা ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরো।

তিরিশ টাকা কটাই বা টাকা।

অংকমূল্যে অবশ্য তিরিশের বেশিও নয়, কমও নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদের কাছে তা নয়। অবস্থার তারতম্যে ওর মূল্য বাড়ে আবার কমে। আনন্দ রায় এর আগে তিরিশ টাকা হাসতে হাসতে দিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্সি চড়ে নব্বুই টাকা ভাড়া দিয়ে হাসতে হাসতে নেমে গেছে। তখন টাকা আপনি এসে তার পকেটে ঢুকতে শুরু করেছে। রেকর্ডের কমিশন, ফিল্মের গান গাওয়ার দক্ষিণা, গান রচনার দক্ষিণায় তার অবস্থা স্বচ্ছল। কিন্তু বেবী ডলি যেদিন ঐ তিরিশ টাকা দিয়েছিল, সেদিন সত্যি সত্যিই তার হাতে টাকা ছিল না।

দু-দিন আগে এক সন্ধ্যায় হোটেলে শূন্য পকেট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। যা ভাবছ তাই। ওই সময়েই শিখেছি মদ্য পান করতে।

শুনবে সে কথা? শোন। পার তো কোন ছবির গল্পে কাজে লাগিয়ো। একটা পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিল সুমিত্রা। তার সর্বত্র ছিল অবাধ গতি। আমার জন্যে কার্ড সংগ্রহ করে এনেছিল সে-ই।

বড় বড় লোক—দেশি বিদেশি; ফরেন এম্ব্যাসীর লোক। এদেশের বড় বড় অফিসার, বড় বড় ব্যারিস্টার, বড় ছোট বনেদী ঘরের ঘরোয়ানারা, বড় বড় ব্যবসায়ী, পলিটিকাল পার্টির লোক, হিন্দু মুসলমান, খবরের কাগজের সম্পাদক, সাহিত্যিক দু-চারজন, আর তাদের সঙ্গে গৃহিণী-বান্ধবীদের দল। টেবিলে টেবিলে গ্লাসে গ্লাসে দামী বিলিতি মদ। হুইস্কির সমাদরটাই বেশি। অবাক হয়ে গেলাম, দেখলাম পঁচানব্বুই জন গ্লাসের-পর-গ্লাস খালি করে চলেছে। এমন দু-একজনকে দেখলাম যাদের নাম করলে তুমিও হতভম্ব হয়ে যাবে। কি? কি বলছ?

হেসে ভূপতি বললে, না—তা হব না।

—তবু নাম করব না। থাক। আনন্দ রায় মদ্যপ সে মদ খায় এটা সে লুকিয়ে রাখেনি। তাঁরা রেখেছেন! রেখেছেন যখন তখন থাক।

—নিজের কথা বলো আনন্দ। পরের কথা কেন? তুমিও তাদের দেখা-দেখি গ্লাস তুললে মুখে। এই তো।

না। হাসলে আনন্দ। বললে, দেখ ভূপতি, তুমি হলে সিনেরিয়ো-রাইটার, এর-ওর-তার লেখা থেকে খানিকটা নিয়ে দু-একটা খুঁড়িয়ে-চলা গল্পও লিখেছ। তাও বিলিতি ছবির নকল করতেই করেছ। থাম তুমি। যদি সাহস থাকে তবে আমার জীবনের কথা শুনে গল্পটা লেখ, তারিফ পাওয়াটা অবশ্য নির্ভর করবে তোমার লেখার শক্তির উপর। তবে হ্যাঁ, সত্য সত্য বলে যে চীৎকার কর, সেই সত্য প্রকাশ করতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। শোন, গ্লাস আমি মুখে তুলিনি। গ্লাস আমার মুখে তুলে দিলে, আমার দাদা স্থানীয় ব্যক্তি। হ্যাঁ গো! সাহিত্যিক দাদা। বললে, আনন্দ তুই খা! আমি বলছি। আমি তোর দাদা, আমি খাচ্ছি। তোর চরিত্রের কথা জানি। কিন্তু তুই ভ্রান্ত। নিশ্চয় ভ্রান্ত। অন্তর তোর যতক্ষণ পবিত্র আছে ততক্ষণ মদ্যপানের দোষ তোকে স্পর্শ করবে না।

হেসে আমি বলে ছিলাম—নেশাও হবে না দাদা?

হা-হা করে দাদার সে কি হাসি। দিল তখন দরিয়ার মতো কলনাদিনী এবং বেগবতী বললেন—আনন্দ, মূর্খ আনন্দ! নেশা কি রে! দেখ সুমিত্রা দেবী খাবে। দেখ। সুমিত্রা মিস্, আজ একটু খাও তুমি! অন্তত আনন্দকে কুসংস্কারের এই নালাটা পার ক'রে দাও।

দিলে সুমিত্রা তাই।

এবং—

হাসলে আনন্দ। মাথা নেড়ে মুখে পিচ্ কেটে কি ভাব যে প্রকাশ করলে—অনুশোচনা দুঃখ না পরিহাসের উল্লাস সে কথা সেই বলতে পারে। মাথা নেড়ে পিচ কেটে বললে—ভূপতি, সেই দিন গরবিনী মেয়েটা—ওই সুমিত্রা কাঙালিনীর মতো—

আনন্দ রায় হ'ল আনন্দ রায়, মদ খেয়ে সে জ্বলে উঠল আগুন-লাগা বনস্পতির মতো। আর ওই আধুনিকা সুমিত্রা সে হয়ে গেল বহ্নিলোলুপ পতঙ্গ। আসববিহ্বলা সুমিত্রা কাঙালিনীর মতো সেদিন আমার বুকের বহ্নিদাহে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে এল।

হায় হায় ভূপতি। কি বলব তোমাকে এই সব কাঙালিনীর কথা। তুমি আনন্দ রায়কে বলেছিলে—স্কাউণ্ড্রেল। তোমার মতো স্কাউণ্ড্রেলের মুখেই ওই কথাটা সাজে। তোমাকে তো আমি জানি। তুমি তো গোড়া থেকেই এই পথের আনাচে-কানাচে ফিরেছ, এঁটো কুড়িয়ে খেয়েছ। কখনও এদের জন্য কেঁদেছ তুমি? আনন্দ রায় কেঁদেছে।

সুমিত্রাকে শান্ত করে বাড়ি পেঁাছে দিয়েছিলাম সেদিন।

কিন্তু ও তখন কাঙালিনী হয়ে গেছে। সাদা চোখে সুস্থ মনে যা দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি, তাই দেখলে আসববিহ্বল অবস্থায়। বুঝলে—

'বৃথায় কাটিছে বেলা সাঙ্গ হয় যে খেলা
সুধার হাটে ফুরায় বিকিকিনি।'

ফাগুন চলে যায়-যায়। ফুলের ডালার ফুল শুকিয়ে আসছে। বুঝতে পারলে।

তারপর সুমিত্রা যে কত করলে সে তুমি জান না। মাথার চুলে শাম্পু করলেও দীর্ঘ কেশ ছিল সুমিত্রার রূপের বিশিষ্ট অঙ্গ। সে ছেঁটে ফেলে বেবীদের মতো বব ছাঁটলে। মুখে রঙ মাখলে। অবশ্য অল্পস্বল্প। তারপর কখন তাকে দেখেছি কি না জানি না, বিলেত ঘুরে এসেছে, এখন আবার দীর্ঘকেশী হয়েছে, এমন রঙ মাখে এখন যে মনে হয় প্রিন্ট-করা রঙীন ছবি বুঝি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বোধ হয় টেকনিকলার সিনেমার নায়িকা বললে আরও স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ছবি পর্দায় বা আর্টপেপারে যা ছবি হিসেবে সহ্য করা যায় তা যদি রক্তমাংসের মূর্তি ধরে সামনে দাঁড়ায় তো কি বীভৎস লাগে বলো তো।

যাক গে। সুমিত্রা তার আপনার পথে মরতে চলেছে। যাক।

আমার কথা শোন।

আমিও মরতে চলেছি। আমিও মরব।

হোটেলে তখন নতুন নেশা জমেছে। রোজগার বেড়েছে। টাকা পেলেই হোটেলে যাই, মদ্য পান করি। দাদাদের সঙ্গে দেখা হয়। হাসি তাঁরাও হাসেন, এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনী জুটেও যায়। কেমন করে জোটে সে তোমাকে

বলতে হবে না। সে তুমি আমার থেকে ভাল ক'রে জান। এবং তারা কারা তাও জান। তাদের কতজন অভাবে আসে, কতজন স্বভাবে আসে, কতজন সুমিত্রার মতো স্বপ্নলোক রচনার বিভ্রমে আসে তাও জান। সিনেমাতে চান্স দেবার লোভে কতজন আসে তাও জান। আদালতের রিপোর্টেও তার হিসেব আছে।

এরই মধ্যে সেদিন শূন্য পকেটে তিরিশটা টাকার দাম আমার কাছে কম ছিল না। এবং ডলি বেবীর আহ্বান।

ওদের মধ্যে ডলি ছিল সত্যকারের ব্যঞ্জনাময়ী। এবং আশ্চর্য ছিল তার মনের কথা বোঝবার ক্ষমতা। সে সভায় পরিচয়ের সময় আয়নার মধ্যে আমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও ছিলাম তাদের দুই বোনের দিকে তাকিয়ে, সুতরাং চোখাচোখি হয়েছিল আয়নার ভিতর। তারপর প্রথম পরিচয়েই বললে—কবিদের যে দিব্যদৃষ্টি থাকে, তা বুঝলাম।

ও আমাকে টেনেছিল। আমারও ওকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু বেবীর জন্য সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে পরের কথা।

গেলাম ওদের বাড়ি।

ওদের বাবা পেনশন-পাওয়া সরকারী চাকুরে। ইংরেজীর অহঙ্কারে, ইংরেজী গৌরবে অহরহই মুখ বেঁকিয়ে নাক বেঁকিয়ে বসে আছেন, অহরহই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন এই হতভাগ্য দেশের লোকের জন্য। কথা বলেন বিজ্ঞ এ দেশের সব-কিছু উড়িয়ে দেন লাথি মেরে। আমাকে বলতেন বক্তৃতা করবে **always with some kicks. I always do it.**

হা-হা করে হেসে উঠল আনন্দ। বললে—অথচ লোকটার পায়ে বাত ছিল হে। বেতো পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে গাল পাড়ত।

প্রথম দিনই আমাকে মেয়েদের গান শেখাতে বললে।

আমি সোজা বললাম, আমার সম্বন্ধে একটু খোঁজ-টোঁজ নেবেন না?

হেসে ভদ্রলোক বললেন কি খোঁজ নেব? আপনার গাঁই-গোত্তর? না, স্বভাব-চরিত্র?

এবং আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই বললেন, গাঁই-গোত্তর আমি মানি নে। জাতও না। আর আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানবারও আমার দরকার নেই, কারণ আমার মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র আমি জানি। তাদের যদি কেউ আপনাকে ভালবেসে ফেলে, তবে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতেও আমার আপত্তি হবে না। কারণ আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতেও আমার আপত্তি হবে না। কারণ আপনার জীবনে কেরিয়ার আছে।

বলেই একটা ঢেকুর তুলেছিলেন।

ভক করে ব্রাণ্ডির গন্ধ এসে লেগেছিল আমার নাকে।

সে রাত্রে ওদের বাড়িতেই ছিলাম। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। ডলি বেবীর আতিশয্য। আমার চোখে রঙ। এক চোখে ডলি, এক চোখে বেবী।

তবুও মনে তখন দ্বিধা হতো।

মনে আছে পরের দিন ওরা ধরেছিল রোজ আসতে হবে।

আমি বলেছিলাম, উঁহু, সপ্তাহে একদিন। তারপর দেখি তোমরা কেমন ছাত্রী। কেমন তোমাদের আকর্ষণ। একটা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলেছিলাম। একটা দেশচলিত মেমসাহেবের বাংলা গান শেখা নিয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প। ওরা হেসে দু-জনেই সারা।

আমাকে স্কাউণ্ড্রেল বলছ!

আমাকে এই ভাবে ওরা উল্লাস করে আকর্ষণ করেছিল।

সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গিয়েছিল দুই বোনে। শুধু দুই বোনেই নয়। সুমিত্রার সেই সমিতির আরও ক-জনের মধ্যে। ওহে! এরা বিচিত্র, জান তো সাধারণ মানুষ যদি কেউ দুটো বিয়ে করে তবে এরা কি রকম খড়গহস্ত হয়ে ওঠে? কি গালাগালটাই দেয়? অথচ ভূপতি, এই মেয়েরাই, আনন্দের মতো লোকেরা যদি বিবাহিত হয়, তবু তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং সতীন থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করে। তিন আইনে হয় না। কারণ হিন্দু বিয়ের ডাইভোর্স নেই। তখন যে ধর্মকে ব্যঙ্গ না-করে, গাল না-দিয়ে জল খায় না, সেই ধর্মকে ধরে প্রজাপতি-ঋষি গায়ত্রীছন্দ ইত্যাদি আউড়ে সেইটুকুরই গায়ে সিঁদর ঢেলে বিয়ে ক'রে সতীনকে গলা ধাক্কা দিয়ে কপোতকপোতীসম নীড় বেঁধে, আবার চোস্ত ইংরেজীতে দেশ এবং ধর্মের বাপান্ত করে।

এইখানেই হঠাৎ একদিন দেখলাম—এই কালো মেয়েটিকে—

আনন্দ রায় হঠাৎ যেন আর এক মানুষ হয়ে গেল।

সে চুপ করে গেল; স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বস্তি-অঞ্চল বাড়িগুলির কোনটই উঁচু নয়। একটুকরা উঠান থাকলে, দরজার ভিতর দিয়ে আকাশ খানিকটা দেখা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বস্তিটার মধ্যে এখানে-ওখানে কয়েকটা দেবদারু গাছ নতুন কাঁচ পাতায় ভরে উঠেছে। জায়গাটা আগে ছিল সে আমলের ওক ধনীর বাগানবাড়ি। এখন হয়েছে বস্তি। বিলাসের উপকরণ ব্যবসায়ের আড়ত হয়েছে। ফুলগাছগুলি আগেই গেছে। কেয়ারীও গেছে। পুকুর একটা আছে। বাঁধানো ঘাটও আছে, আর আছে দেবদারু গাছের সারির কতকগুলো গাছ। সেই গাছের শাখা-পল্লবে এখনও ঋতু পর্যায়ের ক্রম অনুসারে প্রকৃতির নতুন নতুন রূপের ছবি এবং ছায়া তা যথা নিয়মে এসে পড়ে। কচিপাতায় অপরাহ্নের স্বর্ণাভ রৌদ্র এসে ছড়িয়ে পড়েছে; মাথার উপরে বৈশাখী দুপুরের উত্তপ্ত ধূসর আকাশ, প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর বিবর্ণ উত্তরীয়ের মতো মনে হচ্ছে। উদাস হয়ে গেছে আনন্দ রায়।

ভূপতি তার দিকে তাকিয়ে বললে, কিহে ? কি হলো ?

কি হলো ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে আনন্দ। একটু হাসলে ও।

—বেশ তো জমিয়েছিলে। থামলে যে হঠাৎ ? কালো মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার স্মৃতি কি—; কি বলব ? মনোরম ? বা চাবুকের আঘাতের মতো তীব্র মর্মদাহী ? কি ? তুমি লজ্জা পেলে ? তুমি বাবা তপস্যা করে বহ্নির মতো সর্বভুক। অথচ শুচি হয়ে উঠেছ তখন। অবশ্য যদিও আগুন দেবতাটির মাথার উপরে তাকালে দেখা যায় কতখানি কালি তিনি উদ্গার করেন। ওঃ, আকাশখানার সত্য সত্যই যদি অস্তিত্ব থাকত, তা'হলে আদি-কাল থেকে পৃথিবীতে যে পরিমাণ আগুন জ্বলেছে এবং কালি ছেড়েছে। তাতে কাজললতার মতো কালো হয়ে যেত।

আনন্দ হেসে বললে, এমনি ধারা আবোল-তাবোল অন্তসারশূন্য অর্থহীন কথাগুলো বলো এবং ভাব—খুব বড় বড় কথা বলছ, খুব স্মার্ট ক্যাচি কথা বলছ, এবং তার জন্যে বেলুনের মতো ফুলেও ওঠে বলেই তোমাকে আমার ভাল লাগে। স্মার্ট ইডিয়ট হলো মডার্ন যুগের শোভা হে। তুমি তাই। এবং বর্তমানে 'তুমি ছাড়া এ জীবনে কেহ নাই কিছু নাই গো !'

ভূপতি বললে, এইটুকুই তোমার ওস্তাদের মার আনন্দ। ওই খুব কড়া কথা বলে-টলে একেবারে শেষে বেশ একটু মিঠে মিঠে স্তাবকতার চাটনি পরিবেশন কর, ওতেই তেতোর স্বাদটা চ'লে যায় হে। অথচ ওর মধ্যে সত্য স্বীকৃতি আছে। তারপর বলে যাও। তোমার কথাই আগে শুনেনি।

আনন্দ বললে, তুমি আমাকে সর্বভুক বহ্নি বললে। এবং কালি উদ্গারের কথা বললে ! ভাল বলেছ হে। অগ্নির এই রূপটার নাম দাবাগ্নি। বনে আগুন লাগা দেখেছ ? কল্পনা করতে পার ? আমার রূপ তখন ঠিক তাই। হঠাৎ ওই কালো মেয়েটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল নীল সমুদ্রের মতো। মুগ্ধার মতো আহ্বান করলে অবয়ব জীবন, ভিতর বাইর সব দিয়ে আমাকে গ্রহণ করতে চাইলে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর জীবনের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে ওর জীবনের শক্তি এবং ধর্মকে অনুভব করে সভয়ে সরে এলাম। ওর সঙ্গে, ওর জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করলেই দাবাগ্নিকে হতে হবে বাড়বাগ্নি। সমুদ্রের বুকের আগুন। বুঝতে পারছ ?

—তত্ত্ব কথা রেখে ঘটনা বলে যাও কবি। কাব্য তোমার যত ছড়াবার ছড়িয়ো গানের মধ্যে। স্ক্রিপ্টে চাই ঘটনা।

—ঘটনা ? হ্যাঁ বলি শোন। তখন আনন্দ রায় দাবাগ্নির মতো লেলিহান শিখায় সব পুড়িয়ে চলছে। কত লতা যে পুড়ল। কি আশ্চর্য ভূপতি, লতাগুলির কাছে এলেই তারা শুকিয়ে সহজ দাহ্য হয়ে এলিয়ে পড়ে আপনা আপনি আমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করত। শুকিয়ে গিয়ে আপনি জ্বলে উঠত।

সহায় আমার বিপ্লববিলাসী ঊনপঞ্চাশ বায়ু। আমার গতি তখন কে রোধ করবে? একটু হেসে আনন্দ বললে; সূর্যের উত্তাপে বায়ুস্তর উত্তপ্ত হলে তখন তার অধিকার হয় মাথা নাড়াবার, ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হবার। শক্তির জাগরণও হয় তখুনি। ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ঝড়ের মতো বয়ে সৃষ্টির বুকটার উপর তাণ্ডব নাচ নাচবার তো উপায় নেই। আদ্যাশক্তি তার বিরোধী। অনিয়মের তিনি বিরোধী। তাই কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ সঞ্চয় ক'রে ঊনপঞ্চাশ বায়ু যখন ঝড়ের বেগে বয়ে তাণ্ডব নাচ নাচতে চায় তখন খাণ্ডব বনে আগুন লাগায়।

সভায় সমিতিতে আসরে মজলিসে এই ঊনপঞ্চাশ বায়ু আমাকে সামনে নিয়ে নিয়ে ফিরছে। সব-ভাঙা যাদের অভিপ্রায় তারা মমতাকে প্রশ্রয় দেয় না, কোন নিয়মনীতি-ধর্মকেও মানে না। তার উপর এ কাল। যে কালে ও সবই হয়েছে অর্থহীন সেই কাল। ঈশ্বর নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই এমন কি জন্মের আগেও জীবন নেই মৃত্যুর পরেও নেই। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী কটা দিন—সে দিনকটা শুধু হেসে নাও, খেয়ে-দেয়ে ভোগ করে নাও, বাস্ শুধু একটা বুদ্ধিমান ছাপ রেখো চেহারায়, কথায় বার্তায়। এইটেই এদের আসল বাসনা ভূপতি আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আনন্দ আবার বললে, যাক, শোন। এবার ঘটনা বলি। ডলি আর বেবীকে আমি বলেছিলাম, আমি ক-দিন আসব সেটা নির্ভর করে ছাত্রীদের যোগ্যতার উপর। ডলি আর বেবী কিন্তু প্রমাণ করেছিল যে তারা যোগ্য ছাত্রী। আমাকে আকৃষ্ট করলে তারা। সপ্তাহে পাঁচদিন-ছদিন আসতে শুরু করলাম। এদিক দিয়ে ডলির মতো মেয়ে আমি কদাচিৎ দেখেছি। বোধকরি চতুর্থ কি পঞ্চম দিনে সে একটা কবিতা লিখে এনে আমাকে দেখতে দিলে। বললে, কেমন হয়েছে দেখুন তো? সুতরাং সংশোধন করে দিন। কবিতার ছন্দ কাঁচা, ভাষা পঙ্গু, সুতরাং কবিতাটা মনে থাকবার কথা নয়, মনেও নেই আমার, তবে বক্তব্যটা মনে আছে।

'একটি লতা এক বনস্পতিকে বলছে—বনস্পতি, তুমি সুদূর ঊর্ধ্বে মাথা তুলে আকাশ পানে ছুটেছ। কিন্তু ভেবে দেখ, আকাশ তো শূন্য। তুমি যতই মাথা তোল, তাকে ছুঁতে পারবে না। অথচ আমি একটি ক্ষুদ্র লতা, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরার কামনায় ললিত-কোমল-শতবাহু বিস্তার করে ধরবার চেষ্টায় তোমার আশেপাশে ধুলোয় লুটোচ্ছি, আমার দিকে তোমার দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই। হায়, নিষ্ঠুর বনস্পতি! শূন্যলোক নীলিমার মরীচিকা কি লতাবল্লরীর ললিত-কোমল বেষ্টনী মাধুর্য থেকেও মধুরতর।'

আমি হেসে বলেছিলাম, সংশোধন করলে এর যে কিছুই থাকবে না, কারণ একালের ফর্ম নেই এর ছন্দে। আর ভাবটা রোমাণ্টিক। আমি হলে কবিতায় বনস্পতিকে তিরস্কার করতাম। বলতাম—

'তুমি ভণ্ড ; তোমার মনের মধ্যে কামনার কলরোল শুনতে পাচ্ছি, অথচ তুমি লোক দেখানো সাধনার ঠাট বজায় রাখতে আকাশে মাথা তুলছ।' তারপর লিখতাম, 'লতা তাকে জড়িয়ে ধরে পাকে পাকে বেঁধে সর্বাঙ্গে ফুল ফুটিয়ে বনস্পতির মাথার পাশে তার মাথা দোলাচ্ছে।'

ডলি হেসে বলেছিল, তারপর।

তারপর আর কি—'মাথাটা তার আচ্ছন্ন করে দিলে লতা।'

তারপর? বলব?

চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরও আছে বটে এ যুগের কবিতায়। 'লতার শীর্ষদেশ এ বনস্পতিকে ছেড়ে দিয়ে পাশের বনস্পতির শাখা আশ্রয় করলে।'

আনন্দ রায় হেসে বললে, ডলি তাই করেছে। আমারই এক ভক্তের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, আমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। সেও ভাল গান গাইত। আর ওই সমিতির খুব উৎসাহী সভ্য ছিল। সে একদিন তারই সঙ্গে চলে গেল বোম্বে। আর সেই রাত্রে বেবী দিদির জন্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে যে, সে আমাকে ভালবাসে। এবং আরও বললে ডলি তার জন্যেই, মানে বেবীর জন্যেই এ কাজ করেছে। অর্থাৎ আনন্দ রায়কে পাবার পথ বেবীর পক্ষে প্রশস্ত করে দেবার জন্যেই সে এমন করে চলে গেছে।

আনন্দ রায় তারপর বললে, আমি যদিও কিছুদিন থেকে ডলি বেবীর মতিগতি লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ডলির অন্তর্ধানে বেবীর আমার ওপর হ্যাংলামি দেখে ভড়কে গেলাম। একটা নীতিবোধ সজাগ ছিল। বেবীর ওই উক্তির পরই মাথা ঝিমঝিম করল। লাফিয়ে তাদের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসেই মাথা টলমল করতে লাগল। ভাবলাম জল খেলে কি শান্তি একটু পাব! কিন্তু তখনি জল কোথায়। রাস্তার কলে জল পাওয়া যেতে পারে।

হঠাৎ দেখলাম কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো মেয়ে। ওর কাছ থেকে কি জল পাব? এই মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম যখন ডলি বেবীদের বাড়িতে গান শেখাতে যেতাম।

হঠাৎ আমাকে দেখে, নির্বাক হয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে তাকিয়ে। সে দৃষ্টি কি বিচিত্র, সে আমি প্রকাশ করতে পারব না। মুগ্ধতা—কৃতার্থতা বিস্ময়—পবিত্রতা—সব মিশিয়ে সে অপরূপ প্রসন্ন এবং সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন গাঢ় নীল আকাশের মতো বিষণ্ন গভীর। কলুষ নিয়ে তার চোখে চোখ রাখা যায় না ; কৌতুকের ঝিলিক দিয়ে কটাক্ষের ইঙ্গিত করা যায় না। আর ওই দৃষ্টি

চোখে নিয়ে ওই কালো মেয়ে যেন ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতির্মণ্ডলের শান্ত অনুচ্ছ্বসিত অন্ধকার পটভূমি।

জল আমি চাইলাম, ও ওই দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; আমি আর কথা খুঁজে পেলাম না।

বোধ করি মিনিট খানেক পরে মেয়েটি বললে— আপনি জল খাবেন?

—হ্যাঁ। বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। কলেই খাব ভাবছিলাম। কিন্তু কল টিপে ধরে এক হাতে খাওয়া অসুবিধে।

—এমনিই বা খাবেন কি করে? গ্লাস নেই যে। আপনাকে হাতে ঢেলে জল দিতে পারি?

—কেন?

—না। আপনি কত বড় কবি! আমি যে জানি আপনাকে! আমাদের বাড়ি আসবেন?

—না, আজ আর কোথাও যাব না। তুমি আমার হাতে ঢেলে দাও।

—কেন? আসুন আমাদের বাড়ি! যাবেন না?

—না? আজ কোথাও যাব না।

মেয়েটি সন্তপর্ণে আমার হাতের আঁজলাতেই জল ঢেলে দিল। সুস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নাম কি বলো তো?

সে বললে—রেণু।

আমি বললাম—না। রেণু তোমার নাম নয়। তোমার নাম কৃষ্ণা। কালো দীঘির সঙ্গেই তোমার তুলনা। সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা রচনা করে ওকে শুনিয়ে দিলাম। এবং মত পরিবর্তন করে ফেললাম—চল তোমার বাড়িই যাব। তোমার খাতায় লিখে দিয়ে যাই।

ওদের বাড়ি গিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত দৈন্য চারিদিকে!

দারিদ্র্যের চেয়ে দৈন্যের পরিচয় বেশি। চারিদিকে ছড়ানো, এবং সেই দৈন্যের এত পাঁক বাড়িতে জমেছে যে, সে যেন একটা মজা দীঘি, পাঁকে ভরে উঠেছে। দুর্গন্ধ উঠছে। বিষবাষ্পের মতো শ্বাসরোধী। তবু আশ্চর্য কেমন করে কৃষ্ণার মতো একটি নীল পদ্ম সেখানে ফুটে উঠেছে।

'অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া!'

আনন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তারপর ভূপতির দিকে তাকিয়ে বললে, কৃষ্ণার মাকে হয়তো তুমি দেখে থাকবে। দারিদ্র্যের শোষণে মানুষ মরে যায়; ফুটপাথে দুর্ভিক্ষের সময়

লক্ষ মানুষ মরেছে। কিন্তু এমন সজীব প্রেত কেউ দেখেনি বলেই আমার বিশ্বাস। পেটের জ্বালায় কঙ্কালসার মানুষের দিকে তাকালে—আত্মগ্লানি জন্মায়, মনে মনে ধিক্কার জাগে যে, আমি পেট পুরে খাই। ইচ্ছে করে, সমস্ত দুনিয়া পুড়ে ছাই হয়ে যাক। কিন্তু কৃষ্ণার মাকে দেখলে মনে হতো ও মরে যাক মরে যাক। কেন জান? ওর দারিদ্র্যের জ্বালাটা ক্ষুধার জ্বালা নয়, লালসার জ্বালা। দৈন্য দারিদ্র্যটা তার আর্থিক তত নয়, যত মানসিক। অভাবটা যত কঠোর, স্বভাবের দৈন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। খাওয়ার অভাব তাদের খুব প্রকট নয়। খাওয়া জোটে। কৃষ্ণার বাবা অসুস্থ মানুষ, তবুও এই শরীরেই কিছু উপার্জন করেন। প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি করেন। দুটো দোকানে খাতা লেখেন। ইস্কুলের কাজের পর দুপুরে গিয়ে পোস্টাপিসে মনিঅর্ডার লেখেন; মোটমাট পঁচাত্তর থেকে একশো টাকা রোজগার করেন। কৃষ্ণার—মানে রেণুর বড় ভাই, সে মিশনারীদের কারখানায় কাজ শেখে—লেদের কাজ। সেও কিছু পায়, তবে তার কিছু সে দেয় না। তার নিজের খরচই নাকি তাতে চলে না। তার পোশাক আছে, বিড়ি দেশলাই আছে, সিনেমা দেখা আছে। আরও অনেক কিছু আছে। কৃষ্ণার পড়ার খরচ যোগান মিশনারী ইস্কুলের মেম সাহেব। মধ্যে মাঝে কাপড় জামা জীর্ণ দেখলে তাও কিনে দেন। বাড়ি ভাড়া লাগে না। নোনা-ধরা ছাদ-ফাটা বাড়িখানা ওদের নিজেদেরই পৈতৃক। এই পরিবেশের মধ্যে বাপ ভীরু সন্ত্রস্ত নিরীহ, বড় ছেলেটা উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল; কৃষ্ণা শান্ত-প্রসন্ন-পবিত্র; আর এরই মধ্যে ওর মা শীর্ণ দেহ, অজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত, রূঢ়ভাষিণী কিন্তু দৃষ্টিতে তার কি লালসা। খাদ্যে লালসা, পোশাকে লালসা, বিলাস সামগ্রীতে লালসা—সে লালসার আর অন্ত নাই। যে মুহূর্তে তোমার সঙ্গে পরিচয় হবে, তারপর মুহূর্তেই আরম্ভ করবেন—একদা তাঁর কত ধন সম্পদ ছিল। তাঁর বাপ কত ধনী ছিল। শ্বশুর ধনী ছিল। বলবেন—ভাল ছাড়া কখনও খাননি, কখনও পরেননি। আর আজ—! বিস্ফারিত চোখ থেকে জল পড়তে আরম্ভ হবে। চোখে পলক পড়বে না। সে চাউনি দেখে তোমার ভয় হবে। তারপরই তিনি বলবেন আমাকে কিছু দেবেন? সাহায্য করবেন?

কলকাতায় যেখানে বড় সমারোহের সামাজিক ক্রিয়া হোক—সেখানে তাকে দেখতে পাবে। ব্যাধিজীর্ণ কঙ্কালসার-দেহ একটি মেয়ে যথাসাধ্য প্রসাধন করে গুনে গুনে পা ফেলে দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে ওই পলকহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। তাঁর সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। বাধা দিতে পারে না। ভয় হয় সে দৃষ্টি দেখে, মনে হয় যেন মৃত মানুষের দৃষ্টি। বাড়ির ভিতরে গিয়ে ওই শুরু করেন—আমার বাবা ছিলেন মস্ত ধনী। আমার শ্বশুর ছিলেন—নামজাদা লোক। কত সুখ ছিল আমার—। ঝর ঝর করে কাঁদেন। কেউ যাচাই

করতে সাহস করে না। যা চায় দিয়ে বিদেয় করে। খাদ্য, সামগ্রী- কি বলছ ? সামগ্রী কি ? কাপড়, প্রসাধন দ্রব্য এই আর কি !

ওদের বাড়িতে একখানা ঘর এই সঞ্চয়ে ভরা। ভাঙা কাঠের আসবাবের থাকে থাকে খুপরিতে খুপরিতে ঠাসাই হয়ে জমিয়ে রেখেছে। দেওয়ালে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে রেখেছে। বিয়ে-বাড়ি থেকে পাওয়া নানা আকারের আয়না আমি গুনে দেখেছিলাম, আটাশখানা আয়না ঝুলছিল ; একটা কোণে ভাঙা আয়নার ফ্রেম দেখেছিলাম এক বোঝা। এরই মধ্যে অহরহ তিনি ঘুরতেন, এটা নাড়তেন, ওটা নাড়তেন, এখান থেকে ওখানে সরাতেন।

এরই মধ্যে ওই মেয়েটি যে কেমন করে এমন ধারা পেলে আমি বুঝতে পারি না। যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস যেন দুনিয়া জোড়া সুরার দোকানের মাঝখানে একটি মাত্র কাজল-কালো জলে-ভরা দীঘি।

সেই কারণেই লিখে দিয়েছিলাম—

'জীবন যবে প্রখর তাপে পরাণ কাঁদে মম
মরুর মতো জাগিল খর তৃষ্ণা।
বক্ষ-ভরা সুরার জ্বালা
দুনিয়া-জোড়া ও-পানশালা।
আঁচল-ভরা কাজল-কালো শীতল জল সম—
আসিলে তুমি নাম কি তব কৃষ্ণা ?'

দোহাই তোমার ভূপতি, তুমি ওই কুৎসিত ইঙ্গিত-ভরা হাসি হেসো না—দোহাই ! আমি আমার বিসর্জন-দেওয়া দেবত্বের শপথ করে বলতে পারি আমার মনে এতটুকু কলুষ ছিল না। এতটুকু না। এরপরেও যদি তুমি হাস তবে তোমার মুখের ওপর আমি কিল মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেব। তুমি জান আমি মিথ্যে বলি না। আমার চরিত্র, আমার স্খলন, আমার উত্তাপ আমি ঢেকে বেড়াই না। মদ খেয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলি না। আমাকে স্কাউন্ড্রেল বললে আমি রাগ করি না। কিন্তু আমাকে অবিশ্বাস করে ব্যঙ্গ করলে আমি তাকে ক্ষমা করি না। মিথ্যাবাদী অপবাদ আমি সইতে পারি না।

আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ?

ঘরে এসে ঢুকল কালো মেয়ে—কৃষ্ণা !

আনন্দ রায়ের উচ্চ অধীর কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়েছে ও ঘরে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে সে। সে তো জানে আনন্দ রায়ের প্রকৃতি।

আনন্দ রায়ের মধ্যে দুটি মানুষ আছে।

একজন ক্ষয় রোগীর মতো অহরহ জ্বর-জর্জর মানুষ। সে যখন কাঁদে তখন বুক ভাসিয়ে কাঁদে। যখন রেগে ওঠে তখন হয় সে মাথা কোটে, নয়

মানুষকে নির্মমভাবে আঘাত করে। হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। সেদিন বেবীকে মেরেছিল হাতের বাঁধানো বইখানা ছুঁড়ে। হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল কৃষ্ণা। এবং সে দুজনের মাঝখানে ছিল ব'লে বইখানার আঘাত এসে লেগেছিল তারই কপালে।

আর একজন আছে আনন্দ রায়ের মধ্যে। সে চকচকে পালিশ করা মানুষ। হাসি ছাড়া কথা বলে না, সে হাসি বাঁকা-হাসি। সে কথা ওজন-করা কথা, ঘাড় বেঁকিয়ে হেঁট হয়ে নমস্কার করে। চোখে কথায় কথায় ঝিলিক খেলে যায়।

অনুযোগ করলে বলে—ওটা আমার সাধনার সিদ্ধি, বুঝেছ না? আমার গুরু শিখিয়েছিলেন কথা বলবে always with some clever kicks, বুঝেছ?

এই মানুষকে ভয় করে কৃষ্ণা। মধ্যে মধ্যে এই চেহারা নিয়ে আনন্দ রায় দাঁড়ায় তার সম্মুখে, সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সৌভাগ্য, তার এই দৃষ্টির সম্মুখে এই পালিশ-করা কথা বলিয়ে, বাঁকা হাসি হাসিয়ে আনন্দ রায় কেমন হয়ে যায়, পাল্টে যায় তার ভঙ্গি।

ভূপতি—সিনারিও রাইটারও বেশ ভয় পেয়েছিল। আনন্দের এই চীৎকার তার ফোটো তোলার পোজের মতো কৃত্রিম নিরাসক্ত ভাবটি আকস্মিক অতি উত্তাপে ঘর্মাক্ত রঙের মতোই বিগলিত হয়ে কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ মুখের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল।

ভূপতি কৃষ্ণাকে দেখে সাহস পেয়ে বললে দেখুন না ব্যাপারখানা!

আনন্দ রায় কৃষ্ণাকে বললে—পকেটে দেড়শো টাকা আছে ওকে এনে দাও। আর পঞ্চাশটা তুমি দিয়ে দাও। টাকা নিয়ে ও চলে যাক। কাজ করব না।

কৃষ্ণা হেসে বললে—সে হবে। আপনি একটু উঠুন। ও-ঘরে খানিকটা ঘুরে আসুন। মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। বেবীদি আজ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। মাথা ঠাণ্ডা করে তাকে একটু সান্ত্বনা দিন গিয়ে। আর ভূপতি-বাবুর সঙ্গে কাজ তো আমার। আমার কাহিনী নিয়ে ছবি তুলবেন, কন্ট্রাক্ট আমার সঙ্গে একরকম। যান আপনি।

আনন্দ রায় নামকরণের কবিতায় অতিশয়োক্তি করেনি। ভূপতি মনে মনে সেটা স্বীকার করলে। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কথাগুলি বললে কৃষ্ণা, এতক্ষণের ক্ষোভ-উত্তপ্ত ঘরখানির উত্তাপ যেন জুড়িয়ে গেল। কালো মেয়েটির মুখের হাসিতে যেন বৈশাখের উত্তপ্ত দিনের শেষে সন্ধ্যায় ছায়ার শান্তি নেমে এল। আনন্দ রায় কিন্তু উঠল না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে

জানলার ভিতর দিয়ে বৈশাখী অপরাহ্নের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আকাশের চেহারা এখনও ঘষা কাচের মতো। নীল রঙ আকাশ থেকে যেন মুছে গিয়েছে।

কৃষ্ণা বললে, বলুন, কোনখান থেকে আমার জীবন আরম্ভ করবেন? ফ্রকপরা ছোট কালো মেয়ে একটি কৃশ্চান মিশনারিদের ইস্কুলে পড়ত, মেম সাহেব পড়াতেন, **Tell the man to come to me**—কানে শুনতাম, টেল দ্য ম্যান টু কাম টু মি। ভীরু শান্ত মেয়ে। বড় ভাইয়ের মার খেত, মায়ের বকুনি খেত। ছোট বোনদের কোলে করে নিয়ে বেড়াত—। সন্ধ্যের পর বাবা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ করা মহাভারত পড়তেন—তাই শুনত, কিছুটা বুঝত, কিছুটা বুঝত না। তবে ভাষার ধ্যানটা মৃদঙ্গধ্বনির মতোই বুকের মধ্যে একটা গুরু গুরু ধ্বনি তুলত।

ভূপতি বললে, না। এত বড় গল্পের জায়গাও নেই মাপা ফুটেজের মধ্যে, লোকেরও ধৈর্য নেই, তাছাড়া ছোট একটা মেয়ে খোঁজা নিয়েও হাঙ্গামায় পড়তে হবে। কেটেছেঁটে বলুন। আনন্দ অনেকটা বলেছে আমাকে। আপনার সঙ্গে তার আলাপ হওয়া পর্যন্ত। বৈশাখের দুপুরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে ও জল চেয়েছিল। আপনি ওকে আপনাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবসেবার মতোই সেবা করেছিলেন। বলেছে। সে যেন এক মজাপুকুর পাঁক আর পাঁকগোলা জলে ভর্তি,—বিষাক্ত গ্যাস ওঠে সেখান থেকে, তারই মধ্যে আপনি যেন ফুটে ছিলেন একটি নীলপদ্মের মতো। সেইখান থেকে বলুন।

কৃষ্ণা বললে কবির উপমায় ভুল থাকবার নয়। ভুল নেই তবে যা ভাল লেগেছে তাই হয়তো বাড়িয়ে বলেছেন। বাড়িটা আমাদের দীঘির মতোই ছিল বটে, বাতাসও বিষাক্ত হয়ে উঠত—তাও সত্যি। আমার মা।

—আপনার মাকে আমি বোধহয় দেখেছি কৃষ্ণা দেবী। আনন্দ যে বর্ণনা দিলে—তাতে তাঁকে আমি দেখেছি।

—দেখেছেন—কতটুকু দেখেছেন?

—আনন্দ বলেছে—

—উনিই বা কতটুকু দেখেছেন? ঘরের মধ্যে নতুন-পুরনো গোটা-ভাঙা সঞ্চয়ের স্তূপের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছেন? হয়তো বা থিয়েটারে স্টুডিয়োর অঞ্চলে ভিক্ষে করতে দেখেছেন। নেমন্তন্ন বাড়িতে লোলুপ প্রেতিনীর মতো নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঢুকতে দেখেছেন। সে তো খোলস। সে তো মাজা-ঘষা সাজানো মানুষ। তার মধ্যে বিনয়ের ভান আছে। দারিদ্র্যের দুঃখটাকেই বড় করে সাজানো আছে।

হাসলে কৃষ্ণা। ঘাড় নেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে—আনন্দবাবু বলেছেন ওই আবহাওয়ার

মধ্যে আমি কেমন করে এমন হলাম, তা বুঝতে পারেননি উনি। ভূপতিবাবু, ওই মায়ের অবস্থা দেখে আমি প্রাণপণে বাঁচতে চেয়েছি। আমার মায়ের কতটুকুই বা কে দেখেছে? নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতেন। বিনা নেমন্তন্নেই যান সে জানেন; কি পরিমাণে খান—তা দেখেছেন কিনা জানি না। রাক্ষসীর গ্রাসে খান। দুজন-তিনজনের খাদ্য খেয়ে ফেলে তারপর ছেলেদের নাম করে খাবার চেয়ে আনেন। সেখান থেকে বেরিয়ে—কোনদিন রাস্তায়, কোনদিন বাড়ি পর্যন্ত এসে বমি করে ফেলেন। গলায় আঙুল দেন। বলেন—জিভের স্বাদ তো নেওয়া হয়ে গেছে, এইবারে ওগুলো তুলে ফেললাম। তারপর পান দোক্তা খেয়ে হাসেন। ছেলেদের জন্য আনা খাবার-গুলি লুকিয়ে রেখে দেন। বাসী করে লুকিয়ে বসে খান। অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খাওয়ার সময় আমার মাকে যদি কেউ দেখতেন—তবে বুঝতে পারতেন কেন আমি ভয় পেয়েছিলাম! কেন আমি অন্যরকম হতে চেয়েছিলাম! বাড়ির অন্ধকার অন্ধকূপের মধ্যে পশ্চিমী সূর্যের এক টুকরো আলোর মতো ছিলেন আমার বাবা। শান্ত অসহায় মানুষ। ওই আলোর মধ্যে ছিল আমার আশ্রয়। বাবার কাছেই শিখেছিলাম, মানুষের খাওয়া—বাঁচবার জন্যে; খাওয়ার জন্যেই খাওয়া নয়; খাওয়ার জন্যেই মানুষ যেখানে পাগল হয় সেখানে ক্ষিদে বড় নয়, লোভ বড়। সেখানে বাঁচাটাই দাঁড়ায় খাওয়ার জন্যে। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতেন—মা রেণু, তুই যেন খাবার জন্যে বাঁচতে না চাস।

বাবা ছোটখাট পণ্ডিত ছিলেন, ইস্কুলে সামান্য শিক্ষকতা করতেন। পোস্টাপিসে মনিঅর্ডার ফর্ম লিখতেন। সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার ঘাটে বসে মহাভারত পাঠ করতেন। যারা শুনত তারা একটা-দুটো করে পয়সা দিত। যা পেতেন তাতে আমাদের চলে যেত। অনাহার ঘটত না। তবু মায়ের জন্যে সংসারটায় যেন অভাবের আর অন্ত ছিল না। জীবন হাঁপিয়ে উঠত।

বাবার কল্যাণেই আর একজন—ওই মিশনারী মেম সাহেবকে পেয়েছিলাম। মেম সাহেব বাবাকে ভালবাসতেন। তাঁর মেয়ে বলেই তিনি আমাকে প্রথমটায় নিয়েছিলেন, তারপর আমার পড়ায় অনুরাগ দেখে, তিনি আমার পড়বার খরচ দিতেন।

আনন্দবাবু যেদিন আমাদের বাড়ি গেলেন, সে সময়ে বাবা আমার ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা হয়ে এসেছেন—অথচ কেউ আমরা সে কথা বুঝিনি। তিনি বুঝতে দেননি। সেই সময় হঠাৎ তিনি একদিন হার্টফেল করে মারা গেলেন। ওই গঙ্গার ঘাটেই পাঠ শেষ করে উঠবার সময় বুকে ব্যথা ধরে ঢলে পড়ে গেলেন।

পনের দিন পরে।

আনন্দ রায় প্রথম দিনের পর আরও দিন পাঁচেক এসেছিলেন। বেবীকে

গান শিখিয়ে ফেরবার পথে আমাকে ডাকতেন। আমার আর আনন্দ-গৌরবের সীমা দিল না। এত সৌভাগ্য আমার! আনন্দ রায় কথা বলতেন—সে কথা বিচিত্র, কত বড় বড় আদর্শবাদের কথা, কত সুন্দর কথা, কত মিষ্টি মধুর হাসির কথা। আর আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। যখনই মুখ তুলেছি, চোখ চেয়েছি, ওঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিলেছে। আনন্দে লজ্জায় আমার সে এক অদ্ভুত মনের অবস্থা! অজানা ভয়ে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করত আবার বসন্তের বাতাসে কাঁচ পাতার মতো থরথর করে উল্লাসে নাচত।

একদিন বললাম—আপনি এমন করে আমার দিকে তাকান কেন? আমার লজ্জা করে।

আনন্দ রায় হেসে বললেন—ছেলেবেলায় কবিতা লিখেছিলাম একদিন কালোমেঘ দেখে। সে বৈশাখের কালবৈশাখীর মেঘ নয়। আষাঢ়ের বর্ষার মেঘ। দুপুরে হেঁটে আসছিলাম একখানা গ্রাম থেকে নিজের গ্রামে। গোটা আষাঢ় জল হয়নি। রোদে মাঠ শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে। বীজ ধানের চারাগুলির মাথা লালচে হয়ে উঠেছে। সেদিন রৌদ্রে নিজে ঝলসে গেছি। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম বিশ্রামের জন্যে। ঠিক তোমার সঙ্গে আলাপের দিন যেমন দাঁড়িয়েছিলাম তেমনি ভাবেই। হঠাৎ নজরে পড়ল আকাশের পশ্চিমদিকে মেঘ জমেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। সে যে কি ভাল লেগেছিল কি বলব। ক্রমে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আমার চোখের সামনে জমে নিকষ কালো রং ধরে উঠতে লাগল উপরের দিকে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইল। দূরান্তে দিগন্তে গুরু গুরু ধ্বনিতে মেঘ ডাকল। আকাশ ছেয়ে গেল, পৃথিবীর বুক জুড়ে ছায়া ঘনাল, আমার দেহ জুড়াল, চোখ জুড়াল; মেঘের রঙে চোখ জুড়াল, তার ছায়ায় বীজ ধানের ক্ষেতের বীজ চারাগুলির লালচে মাথাগুলি যেন রং ফিরে পাচ্ছে বলে মনে হলো, সে দেখেও চোখ জুড়াল। তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় শুরু করে ঝর ঝর ধারায় বর্ষণ নামল। তোমাকে বলব কি, কীট পতঙ্গ পশুপাখীর সে কি আনন্দ কোলাহল। মাটি ভিজে ভেসে ঢল নামল। আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, ভরে গেল। সেদিন আমি কবিতা বানিয়েছিলাম সেই গাছতলাতে বসেই।

'উঠেছে কালো মেঘে দেখে যা দেখে যা
সজল স্নেহছায়া মেখে যা মেখে যা
দহন জ্বালা যত কলুষ-গ্লানি শত
জড়াবে ফুরাবে রে পরশ মেখে যা।'

কৃষ্ণা তোমাকে দেখি আর সেই দিনের মেঘের কথা মনে পড়ে। সত্যি বলছি কলুষ-গ্লানি কিছুই নেই আমার এ দেখার মধ্যে। সূর্যের আলোর ধার-করা রঙে রঙীন বৃষ্টিহীন মেঘ দেখে দেখে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; তাই তোমাকে দেখি।

কথাটা বলতেই মনে পড়ে গিয়েছিল ডলিকে বেবীকে।

সেই কিশোর বয়সে এতে খুশি হয়েছিলাম বই-কি। চোখে জ্বালা ফুটে উঠেছিল, কালো মেঘে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। বলেছিলাম—ডলি বেবীকে দেখলে আমার শরীর জ্বালা করে। তেমনি ওদের কথা।

আনন্দ রায় বলেছিলেন—ওদের সঙ্গে জীবনের পালা আমি আজ সাঙ্গ করে দিলাম।

—সাঙ্গ করে দিলেন ?

—হ্যাঁ, জবাব দিলাম! আর গান শেখাতে পারব না।

—তবে আর আসবেন না ?

আনন্দ রায় আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আসব। মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেখবার জন্যে আসব। কি ? কালো মেঘে যে বর্ষণ শুরু হলো ?

আমার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। আনন্দ রায়ের সে চোখ এড়ায়নি। আমি লজ্জায় তাড়াতাড়ি চোখ মুছেছিলাম।

এর ঠিক আট দিন পর বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যুর অর্থ আমাদের অন্ধকূপের মতো অন্ধকার ঘরের শেষ আলোর ঝলকটুকু মুছে যাওয়া। নিরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু তাই নয়, সমস্ত সংসারটা ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াল।

শিউরে উঠল কৃষ্ণা। মুখ নামালে। তাতে যেন স্বস্তি পেলে না। দু-হাতে মুখ ঢাকলে।

ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

আনন্দ রায় নিস্পন্দের মতোই জানলার ভিতর দিয়ে আকাশের টুকরোর দিকে তাকিয়েছিল। ভূপতি স্তব্ধ হয়ে শুনছিল ; হাতের সিগারেটটা নীলাভ ধোঁয়ার একটি ঈষৎ কম্পিত শিখায় পুড়ে উড়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণা চুপ করলেও সিগারেট টানার মতো সচেতনায় সে সচেতন হতে পারলে না।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। পাশের বস্তির খোলার চালে কতকগুলো শালিক পাখী বিচিত্র কিচির-কিচির শব্দে বোধ করি কলহ কোলাহল শুরু করেছে ; বড় একটা শুকনো গাছের পত্রহীন শাখা-প্রশাখা আচ্ছন্ন করে বসেছে কাকের মেলা। সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার উপর এসে বসেছে একটা গৃধ্র।

রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা যাচ্ছে। ঘণ্টার আওয়াজ আসছে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে তারপর বললে—বাবার শ্রাদ্ধ হয়নি। মানে, শোকটা মানুষের জন্য হয়নি। হয়েছিল মাসিক উপার্জন বন্ধ হওয়ার দুর্ভাবনায়। বিষন্ন ভাবনা যা মানুষের দৃষ্টিকে চারিদিক থেকে অন্ধকারের মতো ঘিরে ফেলে, তাই তো সেদিন ঘিরে ফেলে-

ছিল আমাদের সংসারকে। বাবার শ্রাদ্ধ ক'রে তো তা থেকে মুক্তি পাবার নয়। তাই বাবার শ্রাদ্ধ গঙ্গার ঘাটে স্নান করে বালিতে নখ মেঝেই শেষ হয়েছিল। বড় ভাই শুধু মাথাটা কামিয়েছিল।

বাড়িতে এলাম।

বিকেলবেলা হঠাৎ শুনলাম—ফিসফাস্ কথা মায়ের ঘরে। কয়েকটা কথা কানে এল। আমার নাম শুনলাম। দাদা বলছে—রেণুটা যে বড় এক-বগ্‌গা। মিশনারি মেম সাহেবদের মতো সব তাতেই কপালে গায়ে ক্রুশ এঁকে আসেন। নইলে টাকা তো এখন হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। অ্যামেরিকান সৈন্যগুলো পকেটে নোটের ব্যাণ্ডিল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণা বললে, আমি চারদিকে অন্ধকার দেখলাম। মনে হলো, অন্ধকার শূন্য লোকের ভিতর দিয়ে আমি ডুবে যাচ্ছি, অতলে ডুবে যাচ্ছি,—বাতাস নেই। নিশ্বাস্ আটকে আসছে।—

সমস্ত পৃথিবী যে অন্ধকারে ডুবে গেল।

নিজের গর্ভধারিণী। নিজের সহোদর এমনিভাবে নিরন্ধ্র অন্ধকারভরা নরকের কদর্যতার মধ্যে ফেলে দেবার কল্পনা করতে পারে?

ক্ষুধার দায়ে। না ক্ষুধা নয়। ক্ষুধার জন্য যেটুকু প্রয়োজন হয় সেটুকু মানুষ দৈহিক পরিশ্রমে উপার্জন করতে পারে। হ্যাঁ পারে, আমি পেরেছি! আমি জানি, এই যে সমাজ একদিকে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, ভোগবিলাসের অজস্র সম্ভারে পরিপূর্ণ আর একদিকে অন্ধকূপের মতো খুপরি ঘর আলো নেই বাতাস নেই স্থান নেই এর মধ্যেও পারে। এ সমাজকে ঘৃণা করি! ভেসে যাক ধ্বসে যাক এই সমাজ—ওই কামনা আমি অহরহ করি। তবে ভগবানকে আমি গাল দিই নে, তাকে আমি অস্বীকারও করি না। তিনি তো আমাকে কারুর চেয়ে কিছু কম দেননি ভূপতিবাবু। আমার দেহে কোন খুঁত ছিল না। খেটে খাবার মতো খাদ্য যোগাড় করে নেবার মতো দেহের মূলধন—হাত-পা-চোখ-কান সব দিয়েছেন। এর অপব্যবহার আমি করতে চাইনি। মানুষ করেছে। রাগ করতে হলে মানুষের ওপরেই করতে হয়। ভগবানকে তার ভাগী করা কেন? সেদিন আমি ভগবানকে মনে মনে ডেকেছিলাম, অন্তরে অন্তরে যেন পেয়েও ছিলাম। তিনি আমাকে ভরসা দিয়ে যেন কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, ভয় কি রে মেয়ে, তোকে আমি মানুষ করে তৈরি করেছি, কম তো কিছু দিইনি। এই মূলধন নিয়ে এগিয়ে চল্, যারা তোর হাত ধরে টেনে অন্ধকার নরকে ফেলতে চাচ্ছে, ছাড়িয়ে নে তাদের থেকে তোর হাত।

আমার মা আর আমার ভাইয়ের হাত।

কৃষ্ণার চোখ ঝকঝক করে উঠল।

কৃষ্ণার ভাই তখন উপার্জনের বিচিত্র পথ আবিষ্কার করেছে। বাড়ির

কেউ জানত না, পাড়াতে কেউ জানত না ; ওরা একটা দল গড়ে তুলেছিল। গোপন পথে তাদের চলাফেরা, রাত্রিকালে তার কর্মকুশলতা, তাদের উল্লাসের সর্বাঙ্গে উঠত মদ্যগন্ধ।

উনিশশো তেতাল্লিশ সাল তখন।

ওদের পাড়ার আশেপাশে পুরনো কালের ধনীদের গড়া বাগানবাড়িগুলি পরিষ্কার করে, রাতারাতি পুকুর বুজিয়ে বাগান কেটে তৈরি হয়ে গেছে টালি-ছাওয়া দশ ইঞ্চি ইটের গাঁথান ব্যারাক—সারি সারি ব্যারাক। সেখানে এসে বাসা নিয়েছে সমুদ্রপারের সাদা-চামড়া মানুষ ; আহারে-ভোগে এক-একটি বলিষ্ঠকায় মানুষ ; তাদের মাথার ওপর বোমারু প্লেন। তাদের বুকের সামনে বেয়নেট—মেসিনগান। গতিতে সে একদিনে চলে যায় পাঁচশো মাইল দূরের ফ্রণ্টে, তারা ঘাস-ভরা মাটির উপর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বুকের ভিতর কামনার সমুদ্র টগবগ করে ফোটে। পেটে খেয়ে ওদের তৃপ্তি নেই, সকল তৃপ্তি যেন দেহভোগে। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দেয়—নিয়ে যাও ; নিয়ে যাও। শুধু যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ নারীদেহ ভোগ তাদের কামনা। গোটা কলকাতা ছেয়ে গেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে উন্মত্ত প্রবৃত্তির তাড়নায়।

কৃষ্ণার ভাই এবং পাড়ার কটি ছেলে ওদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল।

একটা সুবিধে ছিল ওদের। কৃশ্চান মিশনের কল্যাণে ইংরেজীতে কথা চালাতে পারত।

কলকাতার শহরতলীর নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীদের নিয়ে ওদের কারবার শুরু।

তারা রূপ দেখত না, চাইত দেহ। মৃত্যু সামনে রেখে জীবন-ভোরের দেহ ভোগের কামনাটা ওরা মিটিয়ে নিতে চায়।

অন্ধকার ব্ল্যাক আউটের রাত্রে ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে জিপগাড়ি এসে দাঁড়াত।

চাপা সিটি দিত।

গাছের তলায় অন্ধকার থেকে উত্তর দিত এরা।

এর পর এরা ডাকত—হে ম্যান !

উত্তর আসত, ইয়েস।

সঙ্গে সঙ্গে গাছের তলা থেকে বেরিয়ে আসত।

ভেরি নাইস টুডে—

আঃ ! রিয়ালি ?

তারপর চলত টাকা দেওয়া নেওয়ার পালা ! তারপর পুরনো বাজার থেকে কেনা ফ্রক-পরানো চুল ছাঁটা বা বেণী ঝোলানো মেয়ে সমর্পণের পালা।

সবটাই চলছিল গোপনে। ভয় ছিল পাড়ার লোকের। মিশনের সাহেব-

মেমের ভয়টা ছিল সব চেয়ে বেশি। কৃষ্ণার ভাইদের বাড়িতে বাবার ভয়ও ছিল। মাকেও ভয় করত। টাকার আস্বাদ পেলে মা বাঘিনী হয়ে উঠবে।

বাবার মৃত্যুর পর ভাই মাকে সেই কথা বলছিল।

ওদিকে তখন বিদেশি বলির পশুগুলির গলিতপত্রচর্বণে অরুচি এসেছে। তারা চাইছিল কিশলয়। সরস পত্রপল্লব।

কি দোষ? মৃত্যুমুখর পৃথিবীতে একটি উৎসব রাত্রি যাপন করে যাব, তাতে কি দোষ? দেহের উৎসবকে এমন কলঙ্ক কেন মনে কর? আমরা তো তোমাদের শত্রুসৈন্য নই। আমরা তো বন্ধু। শত্রু এসে যখন ধর্ষণ করে তখন সে পাপ। সে দুষ্ট ক্ষতের মতো জীবনে দাগ রেখে যায়। কিন্তু আমরা তো মিত্র। আমাদের আনন্দ দেওয়া তো তোমাদের কর্তব্য। বিচিত্র তোমাদের দেশ! কি দোষ এতে? না, এই সব পেশাদার দেহব্যবসায়িনী নিয়ে এস না, এদের নিয়ে রাত্রি যাপনের পর এতটুকু সুখস্মৃতি থাকে না। নিয়ে এস, শান্ত, সুস্থ স্নেহশীলা আনন্দময়ী মেয়ে, যারা রাত্রির মধ্যেই মনের উপর রেখে যাবে সোনার রেখার মতো উজ্জ্বল একটি দাগ। মনে হবে ঘরকে কাল রাত্রে সত্যিই ফিরে পেয়েছিলাম।

বলতে বলতে বোতল শেষ করে নতুন বোতল খুলে আরও মদ্যপান করে হিংস্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত, বলত, দেখিয়ে দাও বাড়ি। জোর করে নিয়ে আসব।

টাকা অনেক দেব। অনেক। বলো না, কত চাও। নাও নাও, নিয়ে যাও। টেক ইট, টেক ইট।

করকরে তাজা নোট বের করে ছড়িয়ে দিত।

কিন্তু চাই। ভদ্র ভাল মেয়ে। যারা ভালবাসতে জানে। ই আনদারস্ট্যাণ্ড?

—ইয়েস। উইল গেট। শ্যাল ট্রাই।

এবার বেল্ট থেকে রিভলবার বের করে শূন্যে ছুঁড়ে বলত, শ্যাল সুত ইউ লাইক দগস্—ইফ ইউ ফেল।

তারা দেখাত, ওই দেখ না, ওই যে কর্নেল, ও এদের কোথায় পায়।

সত্যি কর্নেল মেজর—এদের গাড়িতে দেখা যেত বিচিত্র-বেশিনী বাঙালী মেয়ে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দু-একজনকে ভ্রম হতো হয়তো বা ডলি, নয়তো বেবী!

উনিশশো তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সাল।

ভূপতি বললে, ব্যাখ্যার দরকার নেই। ওতেই মনে পড়েছে সব। পেটের জ্বালায় অভাবে ধর্মের নীতির মানুষের সব খোলস খসে পড়েছে।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

কৃষ্ণা বললে, পেটের জ্বালা ছিল, অভাব ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে সবচেয়ে

বেশি ছিল লোভ। জোর গলায় বলব লোভ! হ্যাঁ লোভ। বড় বড় গলা করে যে সব দেশের কথা বলে বড়াই করেন ভূপতিবাবু। তাদের দেশে যুদ্ধের সময় কি অত্যাচার কি নির্যাতন কি দুঃখ দুর্দশাটা গেছে বলুন তো! বনে জঙ্গলে ফিরেছে মানুষ। অনাহার সহ্য করেছে, বর্বরতা সহ্য করেছে। তবু কি তারা তার দোহাই দিয়ে এমনি হীনতাকে বাঁচবার উপায় বলে গ্রহণ করেছে? না বলেছে—কি করব?

লোভ, লোভ। ভূপতিবাবু লোভ। কাঙালীপনা।

অধিকাংশ জায়গায় উপার্জনের লোভ। পেটের ক্ষিদের চেয়ে চপ-কাটলেটের লোভ, ছেঁড়া কাপড়ের দুঃখের চেয়ে, কাপড় না থাকার লজ্জার চেয়ে—ভয়েল-সিল্ক-ভেলভেটের লোভ।

দুঃখী পরিবার যেখানে বেঁচেছে ওই ধর্মবোধ বা নীতিবোধ, যা বলেন ওই বোধে।

আমি যে জানি! আমি যে নিজেই ওই বোধেই বেঁচেছি। ওই তো আমার ভগবানের কথা! ওতেই আমি জোর পেয়েছি। ওই আমি লড়াই করেছি। জিতেছি।

সেদিন তাই মাকে বলেছিল—রেণুটা যে বড় এক-বগ্‌গা! মিশনারী মেমসাহেবদের মতো সব তাতেই কপালে বুকে ক্রুশ এঁকে যীশু স্মরণ করে। নইলে টাকা তো হাওয়ায় উড়ছে।

মা কি বললে শুনতে পেলাম না।

দাদা বললে, সন্ধ্যেবেলা যাবে, রাত্রি বারোটা হতে ফিরে আসবে একশো টাকার নোট নিয়ে, আবার যদি স্মার্ট হয়ে বেশ হেসে খুশে খুশি করতে পারে তো যা পকেটে থাকবে তাই দিয়ে দিবে। তুমি বল না ওকে—বেশ গড়ে-পিটে রাজী করে দাও, দেখ না কি হয়।

দাদা বেরিয়ে এল ঘরের ভিতর থেকে। আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে বললে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে? এমন করে? খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে উঠল—শুনেছিস নাকি?

কৃষ্ণা স্থির নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। বাক্‌শক্তি তার লোপ পেয়েছিল, সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর না পেয়ে উৎসাহিত হয়ে তার দাদা বলেছিল। একদিন চল না আমার সঙ্গে। দেখে আসবি কি কাণ্ড।

দাদার পিছনে ওদিকে তখন কৃষ্ণার মা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি তার চোখে, সেই ধীরে ধীরে পা ফেলা, মায়ের এই ভঙ্গিটাকে কৃষ্ণার চিরকালের ভয়। সে যেন মৃত্যুর মতো গতিভঙ্গি। তাকে নিবারণ করা যায় না। অসুস্থ পদক্ষেপ, তবু সে দুর্নিবার। দৃষ্টিতে পলক পড়ে না, চোখের তারা কথা কয় না, কিন্তু সঙ্কল্প তার স্পষ্ট।

একটা কাল নাগিনীর বিষ নিশ্বাসের আকর্ষণে আকৃষ্ট অসহায় বিহঙ্গ-শাবকের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল।

মা এসে তার হাতখানা চেপে ধরলে, সে হাতে যেন জ্বরজর্জর তার জ্বালা। হাত যেন পুড়ে যায়। কিন্তু তবু হাত ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না।

মা কথা কয় আস্তে আস্তে। সাপের গেলার মতো তার কথা বলবার ভঙ্গি। বাঁকানো দাঁতে গেঁথে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে যাবার পথ থাকে না। এ-ও যেন তেমনি, থেমে থেমে বলে যায়। মানুষ 'না' বলবার অবকাশ পায় না। আজ একেবারে চুপি চুপি বললে, তুই যাবি রেণু তোকে যেতে হবে? হ্যাঁ, তোকে যেতে হবে।

কথা বলতে পারেনি কৃষ্ণা। অস্থিরভাবে 'না'-এর ভঙ্গিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল!

মা তাকে টেনে বলেছিলেন—আয় স্নান কর, মাথার চুলে সাবান দে। চুলগুলো ফুলে উঠুক। মুখটাও খসখসে থাকবে।

হঠাৎ কৃষ্ণার কণ্ঠে স্বর ফুটেছিল, না।

—কৃষ্ণা! মা কথা বলে যাচ্ছিল চাপা গলায় ফিস-ফিস করে। ওতেই যেন তার কথার জোর বেড়েছিল। ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, কঠিন হয়ে উঠেছিল নাগপাশের মতো।

—না!

—আমরা খাব কি? মরে যাব?

—না।

—চুপ কর্, কথা শোন্, চেঁচাসনে।

এবার মায়ের চোখের তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

—তোকে যেতে হবে।

—না। না। না।

—তোকে খেতে দেবে কে। ছোট বোনগুলো খাবে কি?

—আমাদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো।

—তোকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলব আমি।

—তাই দাও।

—আয় ঘরে আয়।

—না।

হঠাৎ কৃষ্ণার দেহে এল একটা আকস্মিক চঞ্চলতা। মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা সাড়া। চোখ দুটো উঠল জ্বলে।—ছেড়ে দাও আমাকে। টেনে ছাড়িয়ে নিল তার হাত।

—চললাম আমি। থাকব না আমি তোমার বাড়িতে।

বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে। বেলা তখন দুপুর। মাথার উপরে

আষাঢ়ের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। পিচ গলতে শুরু করেছে, ওদের সেই ভাঙা বাগানের কলোনীতে কয়েকটা গাছে কাকেরা দুপুরে কলকল ডাক ডাকছে। রাস্তায় লোক নেই। গাড়ির সংখ্যা তখন কম ছিল। চটি পায়ে দিয়ে আসেনি তাড়াতাড়িতে। পায়ে চটচট করে পিচ লাগছে—যেন পুড়ে যাচ্ছে। তবু সে থামল না। চলেছে কোথায় তার ঠিকানা নেই। নিরুদ্দেশ? তাই—তাই।

বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্যে ভগবান আছেন সর্বত্র। কোথাও বসে আছেন দক্ষিণ মুখ তুলে প্রসন্ন হাস্যস্মিত মুখে। কোথাও আছেন ভ্রুকুটি-কুটিল বাম-মুখ তুলে।

আছেন তিনি।

হঠাৎ চমকে উঠল কৃষ্ণা।

পিছনে পায়ের শব্দ উঠছে, খট-খট—খট-খট। মুখ ফিরিয়ে দেখলে, আসছে ওর দাদা।

বললে, দাঁড়া।

—না।

—নইলে পুলিসে খবর দিতে হবে আমাকে। তুই রাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিস।

—আমি পুলিসকে বলে দেব সব।

—আমি বলব, তুই নিজেই এসব করিস, আমরা বারণ করেছি তাই পালাচ্ছিস—যাবার সময় অপবাদটা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছিস। ফিরে আয়।

সীতার বনবাস-দুঃখও সহ্য হয়েছিল। কিন্তু রাম জেনে-শুনে একবার অগ্নি পরীক্ষা নিয়ে আবার যখন অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় তিন লোকের দেবতা থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলের সামনে শপথ নিতে বলে মিথ্যা অপবাদকে আংশিকভাবে সমর্থন করেছিলেন, তখনই সীতার মনে মৃত্যু-ইচ্ছা জেগেছিল। তেতো হয়ে গিয়েছিল বিশ্ব-সংসার। তিনি মাটির বুকের মধ্যে প্রবেশ করে পরিত্রাণ নিয়েছিলেন।

নির্দোষকে যখন নিজের লোক, আপনজনে অবিশ্বাস করে, তখন মরতেই ইচ্ছে হয় ভূপতিবাবু।

কৃষ্ণা বললে, আমার কথাটা ভেবে দেখুন। অবিশ্বাস তো তুচ্ছ এর কাছে—অবিশ্বাসের মধ্যে ভুল আছে। ভ্রান্তি তো মানুষের হয়। আমার ক্ষেত্রে ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই—যে পাপপঙ্কে ডুবে যাবার ভয়ে আমি ছুটে পালাচ্ছিলাম অপবাদ সেই পাঁকের ছাপ আমার মায়ের পেটের ভাই এঁকে দিতে চাইলে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম মিনিট খানেকের জন্যে। তারপরই মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল দাদার টুঁটিটা নখে করে ছিঁড়ে দিই,

নয়তো তার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি, নিজের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে ফাটিয়ে ফেলি, পুকুর পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরি, ছুরি পেলে নিজের বুকে কি গলায় বসিয়ে দিই।

হঠাৎ একটা মোটরের হর্ন বেজে উঠল।

খেয়াল ছিল না, রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছিলাম। গ্রীষ্মের দুপুরে শহরতলীর জনহীন পথ, ওদিক থেকে আসছিল একখানা মোটর। খুব জোরেই আসছিল। আমাদের দেখেই হর্ন দিয়েছিল। মুহূর্তে আমার মাথায় নিষ্ঠুর উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমি আছাড় খেয়েই প্রায় পড়ে গেলাম রাস্তার উপরে। যাক, মোটরটা আমার উপর দিয়ে চলে যাক, শেষ হয়ে যাক আমার অদৃষ্টের আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। কিন্তু—

হেসে ঘাড় নেড়ে যেন বৈচিত্র্য উপভোগ করেই কৃষ্ণা বললে—অদৃষ্টকে হুকুম করে নিজের বশে আনা যায় না। যায় না।

মজা দেখুন না, একটা লম্বা ক্যাঁ—চ শব্দ করে মোটরটা আমার ইঞ্চি চারেক দূরে থেমে গেল।

আমার সময়ের হিসেবের ভুল বললে আপত্তি করব না। বলব ওইটেই অদৃষ্টের খেলা। গাড়িটা থেমে গেল আর গাড়ি থেকে নেমে এলেন গাড়ির আরোহী দুজন—একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার বুড়ো শিখ আর তার সঙ্গে কবি আনন্দ রায়।

বুড়ো শিখ ড্রাইভার রেগে ক্ষেপে উঠেছিল; আমার ইচ্ছে করে পড়ে যাওয়াটা দুপুরের রৌদ্রে তার সামনা-সামনি ঘটেছে। সে গাল দিচ্ছিল। আনন্দ রায় হেসে তাকে বললে—লেড়কী বচ গেয়ী সর্দারজী, আপভি বচ গেয়া, অব তো গালি ন দেনা চাহিয়ে। গুরুজীকে স্মরণ কর লিজিয়ে, ভগবানকে নাম লিজিয়ে। বস্। বিলকুল গোস্যা আনন্দ হো যায়ে গা।

—দেখা তো ফেশাদ। নিজু মরণে চাহতি—তো বহুত সা রাস্তা হ্যায় উস লিয়ে। মুঝে ফাসানে কা ক্যা জরুরত হ্যায়?

আমার ভাই তখন পালিয়েছে। আনন্দ রায়ের সামনে সে দাঁড়াবে কোন্ সাহসে?

আনন্দ রায় আমাকে ধরে তুললেন।

—এ কি ব্যাপার কৃষ্ণা?

আমি অবাক-বিস্ময়ে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেন জানেন? মনে হলো এই মুহূর্তটিকে যেন অদৃষ্টকে আমি দেখতে পেলাম।

ওদিকে বাইরে তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

বস্তির খাপরার চালগুলোর উপর অস্পষ্ট আলোর আভাস, রাত্রিকালে মহানগরীর আলোর আভাস আবছা বোঝা যাচ্ছে।

কোথাও যেন লাউডস্পীকারে গান হচ্ছে। সম্ভবত আশেপাশেই কোথাও সভাসমিতি হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শ্লোগানের আওয়াজ উঠছে।

ভূপতি বললে, এই পর্যন্ত আজ থাক্‌। আজ উঠব।

—বেশ।

কৃষ্ণাও একটু হাঁফ ছাড়ল।

এই নিজের কাহিনী বলার ব্যাপারটা তার কাছেও খুব প্রীতিপদ নয়। কিন্তু উপায় নেই; নিরুপায় হয়ে পড়েছে সে। আনন্দ রায় তাকে এই বিড়ম্বনায় ফেলেছে। সেই আনন্দ রায়—যে একদিন ট্যাক্সি ছাড়া চলত না। যার বেশভূষায় বিলাসের অন্ত ছিল না, সে আজ নিদারুণ অভাবের মধ্যে তার আশ্রয় এই বস্তির মধ্যে। এ্যাজবেস্টারের ছাউনি-ঘরে এসে বাস করছে। অর্থের জন্য সে এইটে করে ফেলেছে। কবি আনন্দ রায়, তার উদ্ধারকর্তা আনন্দ রায়কে সে অপ্রস্তুত বা বিব্রত করবে কি করে? তার কাছেই তো সে সেদিন জীবন-মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল।

কৃষ্ণা বললে, তা হলে আজ ছুটি নিলাম। আনন্দদা, আজ একবার দোকানে যেতে হবে আমাকে। নইলে দোকানী মরে গেছে ভেবে, ভেঙেচুরে সব নিয়ে নেবে লোকে। নয়তো বাড়িওয়ালার লোক এসে তালার উপর একটা তালা মেরে দিয়ে যাবে। তুমি বাড়িতে থাক, নইলে বউদি বেশি কান্নাকাটি করবে।

আনন্দ রায় উঠে এসে বসল এতক্ষণে। সে যেন তার উদাসীনতাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে। বললে, চল ভূপতি।

—সে কি? তোমাকে যে—

—থাকতে বললে কৃষ্ণা। বলুক, আমাকে বাইরে যেতেই হবে। আজ তুমি আমাকে যা দিয়ে বিচলিত করে তুলেছিলে। কবর ফাটিয়ে অতীত জীবনের স্মৃতি প্রেতাত্মার মতো আমাকে তাড়া দিচ্ছে, একা বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াল: এস, এস!

বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ভূপতি আসছে বা না-আসছে সে ভ্রুক্ষেপ সে করলে না। আজ তার কোন হোটেলে যেতেই হবে। আজ তাকে মদ খানিকটা খেতেই হবে। নিজেকে স্থির করতে পারছে না সে। টাকাও আজ আছে, দুশো টাকা তার কাছে রয়েছে।

—আনন্দ! দাঁড়াও। ভূপতি ডাকলে তাকে।

গলির মধ্যে দাঁড়ান তার পক্ষে অসম্ভব। বড় রাস্তার আলোকসমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে তবে সে স্বস্তি পাবে।

—তুমি আজ কেলেঙ্কারি করবে দেখছি।

—কেলেঙ্কারি? কাকে বল কেলেঙ্কারি?

—যাকে সবাই বলে কেলেঙ্কারি, তাকেই বলছি।

—সবাই বললেও তুমি বলছ কেন?

—আমি কি সবাইয়ের বাইরে?

—অবশ্যই। কারণ সবাইয়ের উক্তিটা যে মরাল ভ্যালুর ওপর প্রতিষ্ঠিত সে মরাল ভ্যালুকেই তো তোমরা মান না। ওদিকে তোমাদের তো চিরকালই—জয় জয়কার!

—তোমার আজ হলো কি? এত ক্ষেপে গেলে কেন?

—আমার জীবনের কাহিনী শুনেও সে প্রশ্ন করছ?

—ওটা তোমার—আমার বিচারের অভিনয় বলে মনে হলো।

—অভিনয়?

—তা ছাড়া কি। এতে তোমার ক্ষতি কি হয়েছে? এই বিশ্বাস করেই তুমি যশ পেয়েছ, খ্যাতি পেয়েছ, অর্থও যথেষ্ট পেয়েছিলে, সে তুমি দু-হাতে খরচ করে উড়িয়ে দিয়েছ—তার কি হবে? অর্থহীন মরাল ভ্যালু না মানলেই যদি সর্বনাশ হয় কারুর, তো সে দোষ ওই সত্যটার নয়, সে দোষ ওই লোকটার—যে লোকটা ওই মরাল ভ্যালুর শুকনো ডালের লাঠিটা ছাড়া দাঁড়াতেই পারে না।

অকস্মাৎ অট্টহাস্যে যেন ফেটে পড়ল আনন্দ রায়।

ভূপতি সে হাসিতে আহত হলো। বললে—ডোণ্ট, ডোণ্ট, প্লিজ ডোণ্ট লাফ লাইক দ্যাট?

আনন্দ রায় আরও হাসতে লাগল।

—আনন্দ! তার হাত চেপে ধরে ঝাঁকি দিলে ভূপতি।

আরও খানিকটা হেসে আনন্দ বললে, আমি পাল্টা ঝাঁকি দিলে তোর হাতখানার কাঁধের খিল খুলে পিচবোর্ডের বাঁদরের হাতের মতো খসে আসবে ভূপতি!

—কিন্তু তুমি হাসছ কেন এমন করে?

—বেনারসের সেই পবিত্রবাবুর মানিব্যাগ বিভ্রাটের কথা মনে পড়ছে ভূপতি।

—আনন্দ!

—সেই যে তুমি আমি প্রতুল, পবিত্রবাবু বাজারে গেলাম; পবিত্রবাবুর জমিদারি থেকে মোটা টাকা এসেছে। সেই বাজার করে ফেরার পথে পবিত্র-বাবুর কি একটা কেনার কথা মনে পড়ল। তুমি প্রতুল তাঁকে কষ্ট না দিয়ে বাজারে গেলে। পবিত্রবাবু ব্যাগটাই হাতে দিলেন তোমার।

—আনন্দ! ওই সব ড্রোনসদের টাকা নেওয়া কোন দোষ হয় না; হ্যাঁ,

নিয়েছিলাম, আমি এক শো টাকার একখানা নোট নিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল—আমার হলে আমি কোন রকমে ফেরত দেব।

নিয়েছিলে বেশ করেছিলে, তোমার ফেরত দেবার মতো টাকাও হয়েছিল, তাও দাওনি। কিন্তু ক-দিন পর প্রতুলের ভয়ে তুমি পবিত্রবাবুর পায়ে ধরে কেঁদেছিলে কেন বলো তো? সে দিন কিন্তু তোমার নরালিটির ধ্বজার ধ্বজ-দণ্ডটা ধরেও তোমার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না।

—ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

একখানা ট্যাক্সিকে চলে যেতে দেখে ভূপতি হাত বাড়িয়ে ডাকলে।

হাতখানা টেনে নামিয়ে দিয়ে আনন্দ বললে, অনাবশ্যক কয়েকটা টাকা কেন নষ্ট করবি ভূপতি? থাক, আজই তুই আমার দুশো টাকার থেকে কুড়ি টাকা ধার বলে নিয়েছিস। জানি ওটা আর আমাকে ফেরৎ দিবি নে তুই। কিন্তু সে আর খরচ করবি কেন?

কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়িয়েছে।

আনন্দ ভূপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি করলি বল তো? নে, ওঠ, বলে সেই খুললে গাড়ির দরজা। দুজনেই উঠে বসল।

—চল ধর্মতলা।

ভূপতি বললে, কোথায় যাবে?

—ব্রিস্টল। ওইটেই তো এখন প্রিয়স্থান ছবির রাজ্যের।

ব্রিস্টলের একটু আগে গাড়িটা থামল। ব্রিস্টলের সামনে বাস দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথে একটা ভিড়, জনকয়েক কনস্টেবল, অফিসার ভিড় সরাচ্ছে।

আনন্দবাবু। আনন্দের হাত চেপে ধরলে একজন অফিসার।

বারওয়ালা হোটেলের সিঁড়িতে পুলিশ অফিসার হাত চেপে ধরলে যারা বিচলিত হয় আনন্দ রায় তাদের দলের নয়। তাছাড়া এটা নতুন আমল। বিদেশি শাসনের কালে ইংরেজের আমলে হলেও বা কথা ছিল। সে কালে পুলিশের মন এবং মেজাজ ছিল আলাদা। দেশের গুণীদের ভালবাসত না তা নয়, তবে সে ভালবাসার সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার খাদ ছিল। দস্তুর-মতো খাদ। পিঠ চাপড়াতেন। বাহবা দিতেন কাউকে কাউকে, ওরে বাপরে—বলে খাতির করতেন। কিন্তু একটু বাগে পেলেই ভুরু কুঁচকে বলতেন—এ কি মশায়? এ সব কি কাণ্ড? চোখের দুটো কোণই লালচে হয়ে উঠত। এ আমলে সে হবার জো নেই। গুণীজনের অসম্মান সে যে ভাবেই হোক-পাঁচ আইনের ক্ষেত্র থেকে চারশো আশি ভারতীয় দণ্ডবিধি বিস্তৃতের ক্ষেত্র পর্যন্ত যেখানেই হোক—হলে আর রক্ষা থাকবে না। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের পৃষ্ঠায় পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হবে। এত দূরে যেতেও হয় না, আনন্দ রায় তা যাবেও না। সে এইখানেই চিৎকার করে উঠবে। আপনি আমায় অপমান করছেন?

আমার অপরাধ থাকলে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন—তাও আমার যোগ্য সম্মান রেখে করতে হবে। অপরাধ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি অপরাধী নই।

তারপরই একটি কথায় বিস্ফোরণ হয়ে যাবে। বলবে, জানেন, আমি কবি আনন্দ রায় ?

বাস ! সমস্ত জনতা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। ঠোঁঠের বাঁ কোণ দিয়ে ওই কায়দায় বলতে হলে বলতে হবে, ক্রুদ্ধ জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়বে।

আনন্দ অফিসারটির মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে চ্যালেঞ্জের সুরেই বললে, ইয়েস।

অফিসারটি হাত ছেড়ে নমস্কার করে বললে আমাকে চিনতে পারলেন না ?

তারপরই বললে, হরি হরি হরি। মাথার টুপিটা যে একদম ভোল পাল্টে দিয়েছে।

টুপিটা খুলে সে বললে, এইবার চিনুন তো।

—তুমি, প্রতুল ! কিন্তু মাথার চুল কি হল তোমার ? আরে, এ যে গ্রীষ্ম-কালের মেদিনীপুরের মাঠ হয়ে গেছে হে।

কেশ-বিরল মাথায় হাত বুলিয়ে প্রতুল বললে, সাজান বাগান শুকিয়ে গেলও বলতে পারেন।

এখানে নয়, ভিতরে এস।

কোথায় ?

সাজান বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে, আর রানী মৃদিনীর গলির মোড়ে এসে ফিরে যাবে ? এস সরাবের দোকানের মধ্যে এস। তুমি যখন শেষ পর্যন্ত পুলিশ হয়েছ তখন না খাবার তো হেতু দেখতে পাচ্ছি নে।

হেসে প্রতুল বললে, কলেক্টার হলেও টিকিট কলেক্টার আনন্দবাবু। ম্যাজিস্ট্রেট হলেও অনারারী। পুলিশের পোশাক দেখছেন কিন্তু স্পেশাল কনস্টেবল। সুতরাং এতদূরে যেতে পারব না।

—বেশ তো সফ্‌ট ড্রিঙ্ক তো আছে। এস এস, সেই কাশীর বি-বি—ভূপতিভূষণ হে, সেও আছে। সেই যে, কণ্টিনেণ্টাল লিটারেচারের ঘুণ। অনুবাদ করত। আর সেই পবিত্রবাবুর নোটকেস নিয়ে—

—খুব মনে আছে। সে আবার জুটেছে আপনার সঙ্গে ?

—না প্রতুল। আমিই এখন উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে জুটেছি। সে এখন আমার খোদ অন্নদাতা না হলেও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অন্নদাতা। মস্ত লোক সে এখন।

—বলেন কি ?

—এস। দেখবে এস। এক্ষণি তোমার নাম করছিলাম। সে অবশ্য খুশি হবে না তোমাকে দেখে। হয়তো চটবে আমার উপর। হয়তো—তা

হোক ওকে একটু সঙ্কুচিত দেখলে আনন্দ রায় আনন্দ পাবে। আমার ভিতরে কি জানি কেন, হিংসাবৃত্তিটা প্রখর হয়ে উঠেছে আজ।

সিঁড়ির উপরে পা বাড়িয়ে সে আবার ঘুরে তাকাল প্রতুলের দিকে। বললে, এখনও তুমি সন্ধ্যে আহ্নিক কর? মাথার চুলের যা অবস্থা তাতে টিকি আছে-কি-নেই সে তো বোঝা যায় না।

হেসে প্রতুল বললে, করি।

—মুগুর ভাঁজো?

—তাও ভাঁজি।

—দুষ্ট লোক ঠ্যাঙাও।

—সেই জন্যেই তো স্পেশাল কনস্টেবল হয়েছি। নইলে আমার যা অবস্থা যা চাকরি করি, তাতে এ পোশাক করানোই মস্ত অপব্যয়িতা। কিন্তু এ পোষাচ্ছে না। ছেড়ে দেব।

—কেন?

—মানে আমার মতো অবস্থার লোক যে খুব কম। সবাই কোন-কোন-দিকে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এঁদের সঙ্গে একদলে মার্চ করা কি আমার সাজে? দাঁড়ান আমাদের লীডারকে বলে আসি।

ভূপতি কঠিন হয়ে উঠল।

প্রতুল গোড়াতেই বলে বসল, ওরে **Father**! ভূপতি? তুমি সত্যিই সেই ভূপতি? সত্যিই সেই ভূপতি মাটির রাজা?

—তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তিতে বোধ করি হানিকর কিছু হতে শুরু করেছে। প্লাস পাওয়ার হবে, কাছের মানুষকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে তোমার।

—নাঃ, আর কষ্ট নেই। যেটুকু সন্দেহ ছিল বাক্য শুনে ঘুচে গেছে। ঐক্য খুঁজে পেয়েছি।

—যাক। দ্বিতীয় ভাগে তোমার দখল হয়েছে দেখছি। কিন্তু আমাকে চিনতে তোমার সন্দেহের কারণটা কি শুনি?

—তোমার গালের লালচে আভা। তুমি সেই শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ সংক্রান্ত পুরুষ ভূপতি, তোমার গালে—।

মাঝখানেই বাধা দিয়ে ভূপতি বলে উঠল, ওটা গ্লাসের পানীয়ের প্রতিচ্ছটা।

—এবং তোমার দামী পোশাক। সুটটার তো দাম কম হবে না।

—চোরাবাজারে কেনা নয়, দস্তুরমতো মাপ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস দোকানে তৈরি করানো।

—সেই তো।

পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেনটা বের করে একপ্রান্ত আঙুলে ধরে সেটাকে

নাচিয়ে বললে, দেখছ। এখন আর স্টীল হ্যাণ্ডেল কলমে লিখিনে।

হেসে উঠল প্রতুল। বললে, ভূপতি তুমি বিশ্বাস কর। আমাদের ব্যাচে মিস্টার চাউড্রি আছেন, তার আটটা সুপার ফার্স্ট ক্লাস কলম আছে। সবগুলো লাইফটাইম। কিন্তু তা দিয়ে ভদ্রলোকের কোন আয় নেই।

—তুমি কি আমাকে অপমান করতে এসেছ? নিজে থেকে, না—আনন্দ তোমাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে?

—না। অপমান তোমাকে করতে আমি আসিনি।

—কিন্তু বরাবর তুমি তাই করেছ এবং আজও সেই সুর ফুটিয়েছ।

—না-না-না। ওটা তোমার ভুল ধারণা। তুমি বরাবরই এই ধারণা মিথ্যে পোষণ করে এসেছ। তোমার সঙ্গে মতভেদ হলে প্রতিবাদ করেছি, সে তোমায় অপমান করা নয়। আমার নিজের মুখে বলা উচিত নয়, কিন্তু তুমি কথা তুললে বলে বলতে বাধ্য হচ্ছি—

—সে আমিই বলছি প্রতুল—আমি অস্বীকার করি না—কাশীতে তুমি আমায় অনেক সাহায্য করেছ। এমন কি মাসখানেক তোমার বাড়িতে আমাকে রেখেওছিলে।

—না-না। সে কিছু না।

আসলে তাই বটে। তুমি আমাকে তখন শ্রদ্ধা করতে। তোমার থেকে ইণ্টেলেকচুয়ালি আমি অনেক সুপিরিয়র ছিলাম। বলতে গেলে—হিরো। তাই ওয়ারশিপ সেটা। যাস্ট লাইক দিস ফেমাস পোয়েট অব আওয়ারস—ও আমাকে গালাগাল দিয়ে পুজোই করে।

টেবিলের উপর ডান হাতে মদের গেলাসটি ধরে আনন্দ রায় বসেছিল। ওদের কথা শুনছিল। নিজের নাম শুনে চকিত হয়ে উঠল সে। ভূপতির দিকে চেয়ে বললে, খুব বেঁচে গেলি ভূপতি। নেশাটা এখনও জমেনি। জমে থাকলে নেশার আবেগে তোকে হয়তো কিছু পুজো দিয়েই বসতাম। অন্তত একটা থাপ্পড়। ঠাস করে ওই বাঁ গালে। বলেই সে গেলাসটা মুখের কাছে তুললে, চুমুক দিলে। এবং এক সঙ্গে দুতিন ঢোক খেয়ে নিলে।

তারপর আবার বললে কথাটা বাকী রাখলি কেন? বলে শেষ করলি না কেন?

ভূপতি ভ্রূকুঁচকে তার দিকে তাকাল।

আনন্দ বললে, সেই কথাটা, ফেমাস পোয়েটস আর কিং অব দি ফুলস্। কারণ পিউপল আর ফুলস্।

ভূপতি উঠে পড়ল, বললে, চললাম। তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস।

আনন্দ বললে—যা। সত্যিই আজ আমার মেজাজ তোর ওপর চটে আছে। চলে যা। দাম আমি দেব।

ভূপতি বেরিয়ে গেল।

আনন্দ প্রতুলের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখলে ভূপতিকে!

—দেখলাম। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—ও কি সত্যিই আজ খুব বড় লেখক হয়েছে।

—এক দিক দিয়ে।

—বাংলা দেশের লোক ওর লেখা বোঝে? ওর কথা তাদের ভাল লাগে? আমি তো ওর কোন বই পড়িনি।

—না। ওই বই লেখে না। ও ছবির সিনিরিও লেখে। চিত্রনাট্য। ওই যে চিত্রনাট্যকার ভরত মজুমদার দেখ, ওই হল ভূপতির ছদ্মনাম। ভরত মানে পৌরাণিক নাট্যের ঋষি ভরত।

—ছবি আমি দেখি না আনন্দবাবু।

—ছবি তোল না? সে বাতিক ছেড়েছ? ফোটোগ্রাফী?

—না। সেটা আছে।

—আমার সেই কাশীতে যে ছবি তুলেছিলে তার কপি তোমার কাছে আছে? সেটা বড় ভাল হয়েছিল।

—আছে আমার ঘরে টাঙানো আছে।

—বয়! মদের গেলাস শেষ করে আবার ডাকলে আনন্দ রায়।

—নেশা ধরল না ভাই।

—এমনি কি রোজ খান?

—খেতে চাই। টাকাপয়সা থাকলে খাইও। কিন্তু নিত্য খাবার মতো টাকাপয়সা নেই আমার এখন।

—খাবেন না। ছেড়ে দিন।

—পাগল।

—কেন? একবার তো ছেড়েছিলেন। এমন তো কঠিন নয়, সে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

হ্যাঁ, তোমরা আমায় একবার ছাড়িয়ে ছিলে। বাস, বাস, বাস করো।

বয় মদের গ্লাসে সোডা ঢালছিল। আনন্দ রায় তাকে বারণ করলে। গ্লাসটা তুলে নিয়ে বলল—হ্যাঁ সে সময় আমি কিছুদিন আনন্দ পেয়েছিলাম। কাশীর দিন কটা সত্যিই বড় আনন্দে কেটেছিল। ওই ভূপতির অস্তিত্ব সত্ত্বেও আনন্দ ছিল। পবিত্রবাবু ছিলেন। ভারী ভাল লোক। গান-বাজনা-সাহিত্যচর্চা সে স্বপ্নের মতো মনে হয়।

প্রতুল তার আইসক্রীমের গ্লাসটি শেষ করে বললে—দেখুন। সত্যি সত্যিই আপনাকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। বহু লোকেই করে। আপনাকে এ রকম দেখলে দুঃখ পাই আমরা। আর খাবেন না, উঠুন। চলুন, আপনার

বাসায় পেঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাব।

—উঁহু। তুমি যাও।

আপনার ঠিকানা বলুন তা হলে। মাকে নিয়ে আমি যাব। মা আজও আপনার নাম করেন।

—না। ঘাড় নাড়লে আনন্দ রায়।

প্রতুল স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমনভাবে প্রত্যাখ্যান সে প্রত্যাশা করেনি। আনন্দ রায়ের মতো মানুষ এমনভাবে সোজাসুজি মুখের উপর বলতে পারে। —'না'?

—আমি এখন বস্তিতে থাকি প্রতুল। তাছাড়া—। একটু থেমে থেমে আবার বললে,—সে সব অনেক কথা। আমি এখন—। সে যাক। সে অনেক কথা।

এরপর আর কোন কথা খুঁজে পেল না প্রতুল। কবি আনন্দ রায় বস্তিতে থাকেন? হায় রে বাংলা দেশ! সমস্ত অন্তরটা যেন পাক খেয়ে উঠল। হঠাৎ সেই কথাই সে বললে। বললে, হায় রে দেশ!

ওর মুখের দিকে চেয়ে আনন্দ হাসলে, বললে, না।

—কি বলছেন আপনি? আপনি বস্তিতে থাকেন? আর দেশের দৃষ্টি নেই?

—বস্তিতে থাকি। আবার হোটেলে মদ্যপান করি। ট্যাক্সি চড়ি। ওসব হিসেবে জটিল। বরং যা বলেছিলে তাই বলো। বলো—হায় হতভাগ্য আনন্দ রায়। আমি সত্যিই হতভাগ্য। ও কথা থাক। ওতে আমার মন অস্বস্তিতে ভরে যাবে। এখন শোন, তোমার ঠিকানাটা বরং আমাকে দিয়ে দাও। আমি যাব তোমাদের বাড়ি। তোমার মাকে প্রণাম করে আসব।

—আপনি যাবেন?

—যাব না? কাশীতে তোমরা যে যত্নে আমাকে রেখেছিলে আমার পরিচয় সূত্রে ওই পাষণ্ড ভূপতিকে এক মাসের উপর ঠাঁই দিয়েছিলে, সে আমি ভুলিনি, প্রতুল। তোমার মাকে আমি মায়ের মতোই ভক্তি করেছিলাম। আজও করি। অসীমা সেই বারো বছরের অসমসাহসিনী মহিষমর্দিনীটি কেমন আছে? কত বড় হয়েছে? বিয়ে দিয়েছ?

—না। হাসলে প্রতুল। অসীমা এখন বি. এ. পড়ছে। যাবেন, দেখতে পাবেন।

—যাব তোমার ঠিকানা দাও। পকেটে কাগজ কলম থাকলে লিখে দাও। লেখক আনন্দের ওসব থাকে না।

প্রতুল পকেট থেকে বের করলে কয়েকখানা কাগজ।

কাগজ নয়, সবগুলিই ফোটোগ্রাফের দোকানের প্রিণ্ট নেগেটিভ রাখার খাম। তারই মধ্যে একটা খালি করে সে লিখতে লাগল।

আনন্দ রায় টেনে নিলে বড় খামটা। এনলার্জ করা ফোটোর খাম। টেনে বের করলে ছবি ?

সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল, তার চঞ্চলতার হাতের ধাক্কায় মদের গ্লাসটা উল্টে ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল মেঝেতে।

এ কি ? এ যে কৃষ্ণার ছবি ?

এ ছবি ? কার ছবি ? কোথায় পেলে তুমি ?

জিজ্ঞাসা করলে আনন্দ রায়। তার রক্তাভ চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। মদের গেলাসটা পড়ে ভেঙে গেছে সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।— কিন্তু বিস্ফারিত একাগ্র দৃষ্টিতে সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কৃষ্ণা ? না। এ হাসি তো কৃষ্ণার মুখে সে কখনও দেখেনি। কিন্তু এ তো সেই।

এ কি ক্যামেরার প্রতারণা ?

—প্রতুল।

প্রতুল বিস্মিত হয়েই বললে, এঁকে আপনি চেনেন ? দেখেছেন ? বাঙালীর মেয়ে দোকান খুলে জীবিকা উপার্জন করে ?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি একে কি করে জানলে ?

—ঠিক জানা যাকে বলে তা জানি না। অনেকদিন আগে সেনসাসের সময় কাজ করতে গিয়ে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম। মেয়েটি তখন আর এক রকম। মৃত্যুপথযাত্রিণী বললেও হয়। থাকত সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু আর হ্যারিসন রোড জংসনের খানিকটা দক্ষিণে পশ্চিমমুখো গলিপথের মোড়ে একটা ভাঙা পুরনো বাড়িতে। বারান্দাঘেরা একটা ছোট খুপরীতে থাকত। আমাকে তখন বলেছিল। আমি হয়তো দু-তিন মাসের মধ্যেই মরে যাব। আমাকে গুনে কি করবেন ? কাল যখন বাদ কাটতে হবে তখন আজকে যোগ করে লাভ কি ? অবিশ্বাস করিনি অবস্থা দেখে। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—লিখুন অজ্ঞাত। অজ্ঞাত পিতৃপরিচয় মেয়ের তো সংসারে অভাব নেই। ওর পাশের ঘরে থাকত এক পঞ্জাবী বুড়ী। সে আমাকে বলেছিল—বাবুজী, মেয়েটার নসীব খারাপ। নসীব ওকে শুধু মরণের দিকেই ঠেলে নিয়ে আসেনি। দুনিয়ার কত নোংরামির বোঝা যে ওর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। এই পরিচয়। তারপর ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম। সে দিন ছুটির দিনে ফোটো তুলতে বেরিয়েছিলাম দুপুরবেলা। হঠাৎ একটা ট্রাম-স্টপের ধারে ছোট একটি দোকানে বসে আছে। একখানা বই পড়ছে। কি পড়ছিল কে জানে ! হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল মুখে যেন ফুল ফুটে উঠল। আমি থাকতে পারলাম না। ফোটো তুলে নিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে ! এমনি একটি কালো অতি সাধারণ মেয়ের মধ্যে এমন অপরূপত্ব আবিষ্কার করে বড় খুশি হয়েছি আমি। তাকে

ছবিখানি দেবার জন্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু দোকান দেখলাম বন্ধ। সেই পঞ্জাবী বুড়ীর কাছে গিয়েছিলাম, শুনলাম। সে নাকি তার মহব্বতির লোকের দেখা পেয়েছে। তারই সঙ্গে চলে গিয়েছে। ছবিখানা আর তাকে দেওয়া হল না।

—আমি দেব। আমি কৃষ্ণাকে দেব।

—আপনি দেবেন?

—হ্যাঁ, কৃষ্ণা আমার কাছেই আছে। পঞ্জাবী বুড়ী তার যে মহব্বতির লোকের কথা বলেছে, সে আমি।

—আপনি?

—হ্যাঁ। আমি।

একটু হাসলে প্রতুল। তারপর বললে ভাল, ছবিখানা তাঁকে দেবেন। আমি চললাম।

আনন্দ রায়ের সঙ্গে প্রতুলের পরিচয় হয়েছিল বেনারসে। মোটামুটি সব পরিচয়ই সে জানে। বাহিরের ভিতরের সবই সে দেখেছে। প্রতুল ষণ্ডামার্কা ব্যক্তি। বেনারসে গঙ্গার ধারে ঘাটে আনন্দের গান শুনে খুশি হয়ে আলাপ করেছিল। আনন্দ তখন ওই বেবীদের দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ঠিক কৃষ্ণার সঙ্গে ওই রাস্তায় দেখা হওয়ার পরই।

কৃষ্ণাকে রাস্তায় সেদিন মোটরের সামনে থেকে তুলে, ওর মুখে সব কথা শুনে অকস্মাৎ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

আনন্দ রায়ের যাবার কথা বেবীদেরই বাড়ি। কিন্তু দিন কয়েক আগে বেবীর বে-সরম অবস্থা দেখে আনন্দ রায় বিভ্রান্ত হয়েছিল। কৃষ্ণার কাছে রাস্তায় যেদিন জল চেয়েছিল। তৃষ্ণার্ত অবস্থাতেই বেবীদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল যে দিন, সে দিনের পর আর সে বেবীদের বাড়ি যায়নি। ঠিক করেছিল যাবে না। বেবীর কান্নাকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। আর বেবীর তর্ক? তার একটু একটু কথা? সে শুনে তার হাসি পায়। ওরা বলে খুব জোরের সঙ্গে, কিন্তু সেজোরটা গলারও নয়, শব্দ-যোজনারও নয়, যুক্তিরও নয়—জোরটা চোঙা লাগিয়ে কথা বলার, কতকগুলো বিচিত্র শব্দ ব্যবহারের এবং মেয়েলী ন্যাকামিপনার। ন্যাকামিপনার সঙ্গে খানিকটা হিস্টিরিয়া রোগের খিঁচুনি বা ঝাঁকানি মেশানো থাকে। বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বার দুই জুতোর গোড়ালি ঠোকে, তারপর আবার বসে পড়ে। কপালে হাত বুলিয়ে বলে উঃ! অথবা সামনে যাই থাক্ টেবিলেই হোক আর চেয়ারেই হোক—তার উপর মাথাটা রেখে খানিকক্ষণ যেন অভিভূত হয়ে থাকে। তারপর আবার সটান উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে স্যাম্পু-করা খাটো চুলের গোছ বা বিনুনি দুলিয়ে দিয়ে বলে—ঘৃণার্হ!

তারপর গট গট করে বেরিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, বলে চললাম।

সঙ্গে দলবল থাকলে বলে—চল্ চল্। বাজে! বাজে।

বেবীর সঙ্গে সেদিন এমনি তর্ক করে অত্যন্ত তিক্ত মন এবং সত্য সত্য জলের পিপাসা নিয়েই ওদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। ভেবেছিল, আর যাবে না কোন দিন। দিন কয়েক যায়নি। কিন্তু একদিন একটা সভায় বেবীকে একজন অভিনেতার পাশে বেশ একটু নিবিড় হয়ে বসে থাকতে দেখে এবং সভার পর তারই বাহুলগ্ন হয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মনে আবার আগুন ধরে গিয়েছিল। সে দিন সভার পর হোটেলে গিয়ে মদ্যপান করেছিল। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। সারাটা রাত প্রায় নিদ্রাহীন হয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, সেই রাত্রেই ছুটে যাবার। এক একবার ইচ্ছা হয়েছিল, ওই অভিনেতা ছোকরার সামনে গিয়ে তার ঘাড় ধরে মাটিতে মুখটা রগড়ে দেবার। ওই অভিনেতাকে সে জানে। অভিনেতা অর্থে শখের দলে অভিনয় করে বেড়ায়। পোজ করে আগামী যুগের গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী। অথচ আসল মূল্য কাণাকড়ি! চিৎকার ক'রে উঠেছিল সে মধ্যে মধ্যে।

—না, না, না।

অর্থাৎ এ হতে পারে না, ঘরে একা, তাই রক্ষা পেয়েছিল। কেউ থাকলে সেদিন আনন্দ রায়কে পাগল ভাবত। এই ভাবে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত জেগে থেকে, তিনটের পর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল বেলায়। উঠে যত শীঘ্র সম্ভব চা খেয়ে স্নান সেরে সাজপোশাক করে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, মন প্রায় স্থির করে ফেলেছিল। বেবীর সঙ্গে তার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসবে, এটা কি? এ বেবী কি খেলায় নেমেছে?

ডলির ওই কৃশ্চান ছেলেটির চেয়ে অনেক গুণে ভয়ঙ্কর এই অভিনেতাটি। একেবারে নাস্তিক, কোন নীতিধর্ম মানে না। সে সইতে পারবে তো বেবী?

পথে কৃষ্ণা পড়ল ট্যাক্সির সামনে ঝাঁপিয়ে। সে শুনলে সব। ভাবনায়-চিন্তায়-সংকল্পে সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। বেবী আর কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা মোটরের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরবার জন্যে। এ মন তো বিচিত্র মন! এ মন তো তার অজানা নয়, অচেনা নয়—একে সে জানে, একে সে চেনে। একদিন তারও এই মনই ছিল। সে মন মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। তার মনের মধ্যে ছিল তার নিজের রচনা-করা যে দেবতা তাকে সে বেবীর মতোই এক আধুনিকার শিক্ষায় মাটির পুতুলের মতো ভেঙেচুরে ফেলে দিয়েছিল গালিফ স্ট্রীটের খালে। সেই সঙ্গে সে মন পড়েছিল মাটির তলায় চাপা। সমাধিস্থ করেছিল তাকে। কৃষ্ণার সেদিনের সেই মৃত্যুবরণের ব্যগ্রতা দেখে বুকের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভিতরটা ফেটে গিয়ে সেই সমাধিস্থ মন আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল মাথা তুলে। জটাজাল তার মাথায়। গলায় তার হাড়ের মালা, হাতে তার ত্রিশূল ডম্বরু। সমুদ্র মন্থন

করে বিষ উঠলে সে বিষ খেতে সে পশ্চাৎপদ হয় না। সে মনের যেন এই রূপ! হ্যাঁ, এই তার রূপ।

কৃষ্ণাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে তার মাকে এবং ভাইকে বলে এসেছিল সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি। আমাকে তোমরা জান। কৃষ্ণাকে যন্ত্রণা দিলে, পীড়ন করলে আমি ক্ষমা করব না।

কৃষ্ণার ভাইয়ের হাতখানা আপনার মুঠোর মধ্যে পুরে কঠিন চাপে পীড়িত করে বলেছিল—হাতখানা তোমার দুমড়ে ভেঙে দেব। সাবধান তুমি।

পঞ্চাশটা টাকাও দিয়ে এসেছিল।

—এই এখন দিয়ে গেলাম। আমি কৃষ্ণার পড়ার একটা ব্যবস্থা করছি। তোমার একটা চাকরি। তাও করে দেব। কিন্তু সাবধান!

বেরিয়ে আসবার পথে বেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেবী দাঁড়িয়েছিল। ওদের সেই বারান্দায়, সে তাকে ডেকেও ছিল—আনন্দদা।

—ব্যস্ত। খুব ব্যস্ত। বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে এসে ট্যাক্সিখানায় চড়ে বসেছিল। সত্যিই ব্যস্ত ছিল সে। মনে তখন তার গান এসেছে গাথা গান।

তার বিখ্যাত গাথা গান।'

'ত্রিপুর—শিখরে, কে জাগে? কে?'

'ত্রিপুর—শিখরে—কে জাগে? কে?' গাথা-গান আনন্দ রায়ের বিখ্যাত রচনা—যত প্রশংসা তার তত নিন্দা। বেবী বলেছিল—আনন্দ রায় আত্মহত্যা করেছে। এ তার প্রেতের রচনা?

গাথা গানটির কাহিনী আনন্দ রায় বাল্যকালে শুনেছিল। মনের মধ্যে ছিল, কোনদিন ভুলতে পারেনি। ত্রিপুর নামে এক রাজ্য। সে রাজ্যের কুলদেবতা ত্রিপুরেশ্বর রুদ্রদেব। ত্রিপুর রাজ্যের উত্তরে আকাশস্পর্শী পাহাড়ের চূড়োয় তাঁর বেদী। মন্দির নেই। মুক্ত আকাশের নিচে লিঙ্গ-মূর্তিতে রুদ্রদেবতা বিরাজ করেন। যিনি সাধক তিনি দেখতে পান দেবতা ত্রিশূল এবং ডম্বরু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ত্রিপুরকে রক্ষা করেন সকল বিপর্যয় থেকে।

আসে প্রলয়ঙ্কর ঝড়, রুদ্র তাকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে ত্রিপুরকে রক্ষা করেন। আসে সৃষ্টি-ভাসানো বর্ষণ, রুদ্র তাকে তাঁর জটাজালে বহন করেন। ভূমিতে জাগে কম্পন তিনি নখাগ্র দিয়ে টিপে ধ'রে ত্রিপুরকে রাখেন স্থির। আসে বৈদেশিক অভিযান। আসে অসুর, আসে রাক্ষস। আসে দৈত্য, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রের ডম্বরু বাজতে থাকে। শূল উদ্যত করেন, তা থেকে বিচ্ছুরিত হয় তেজ, ললাটের অগ্নি ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠে, ত্রিপুরের মানুষ জেগে ওঠে। মহাবলে বলীয়ান হয়—মরণভয় হয় তুচ্ছ—তারা ওই ডম্বরুর তালে তালে এগিয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে অসুর-রাক্ষসের-দৈত্যকে পরাভূত করে ফিরে আসে।

দেবতাকে স্তব করে।

'ত্রিপুরপুর শিখরপর কে জাগে। কে?
শঙ্কাহরণ চরণে শরণ জীবন মাগে রে!'

দেবতার কণ্ঠ শোনা যায়, 'মা ভৈ, নাহি ভয়!'

ত্রিপুরবাসী সমবেতকণ্ঠে জয় ঘোষণা করে—জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়!

প্রলয়-দেবতা অভয় বিরাজে অরুণ রাগে রে!

ত্রিপুরবাসী পুজো নিয়ে যায়। পুষ্পে মাল্যে, চন্দনে ধূপে, গঙ্গোদকে বিল্বপত্রে নিবেদন করে।—

'নমো হে নম, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর!
চরণ দিয়ে পরশ কর,
ডমরুপাণি ত্রিশূল ধর,
কলুষ হর, নয়নকোণ বহ্নি রাগে রে!'

দেবতা প্রসন্ন হাসি হাসেন।

অকস্মাৎ আসে ত্রিপুরে স্বর্ণতৃষ্ণা।

দেশান্তর থেকে ফিরে আসে এক ত্রিপুরবাসী। সে পাথর থেকে সোনা বের করার রহস্য জেনে আসে। আরও জেনে আসে বহু বস্তুতত্ত্ব। ত্রিপুর-বাসী সে বিভূতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ত্রিপুররাজ্যে কর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল; আরম্ভ হল খনন কার্য। কৃষিক্ষেত্র, পুষ্পোদ্যান সূর্যালোক ছেড়ে তারা প্রবেশ করল সুড়ঙ্গে খনিতে। সেই সুড়ঙ্গ প্রসারিত হল রুদ্রদেবতার পাদপীঠের তলদেশ পর্যন্ত। সেইখানেই পেলে তারা প্রচুর স্বর্ণ প্রস্তর। ধ্বনি উঠল, ফেল, ফেল, খুঁড়ে ফেল, উবড়ে ফেল। অকস্মাৎ হল মহাশব্দ। সুড়ঙ্গ ধসে দেবতার পাদপীঠ গেল নেমে। দেবতা হলেন অদৃশ্য। যাবার সময় বলে গেলেন। যেদিন কোন শুদ্ধাত্মা এই গহ্বরে নেমে আমাকে

'নম হে নম, গ্রহণ কর—
চরণ দিয়ে পরশ কর
ডমরুপাণি ত্রিশূল ধর।'

—এই মন্ত্রে আমার পুজো করবে, সেদিন এই অন্ধকার গহ্বর ভেদ করে ত্রিশূল এবং ডমরু নিয়ে আবার আমি আবির্ভূত হব।

আমি জানি, আমার অন্তর্ধানের পর ত্রিপুরের আকাশ হবে উল্কাবর্ষী। ত্রিপুরের ভূমিতল তাতে দগ্ধ হবে। বিক্ষুব্ধ হবে।

ত্রিপুরের আকাশে যে মেঘ উঠবে, সে মেঘ জল বহন করবে না। বন্ধ্যা মেঘ আনবে ঝড়। উত্তাপের ঝড়।

ত্রিপুরের ভূমি বন্ধ্যা হবে। অস্বাচ্ছ্যে কঠিন কর্কশ হয়ে উঠবে মৃত্তিকা।

আকাশ ধূসর হয়ে থাকবে। নীলিমা লাবণ্য শুকিয়ে যাবে।

মানুষ শুধু গোগ্রাসে গ্রাস গিলেই পরিতৃপ্ত হবে। নদীর জল সুরার

মাদকতায় আচ্ছন্ন হবে।

ব্যভিচারের উল্লাসের তীক্ষ্ণ মুখরতায় বায়ুস্তর হিমকণাবাহী শীত বায়ুর মতো বিদ্ধ করবে সকল পবিত্রতাকে। ভোগ ব্যঙ্গ করবে সংযমকে বিলাস পদাঘাত করবে পবিত্রতাকে। পাণ্ডিত্য হবে শুষ্ক। সে অসতী বলবে জগন্মাতাকে। অসতের অত্যাচারে সতী মহিমাকে ধর্ষিতা কল্পনা করে সে পাণ্ডিত্য অনুভব করবে আত্মপ্রসাদ। বারাণসীকে শৌণ্ডিকালয়ে পরিণত করবার কল্পনায় তারা অনুভব করবে হর্ষ। সে চিৎকার করে বলবে, আমি সব জেনেছি ; কিছুই আমার অজানা নাই। শুধু মৃত্যুকে করবে ভয়। এই অবস্থায় আমাকে যদি কোন মানুষের মনে পড়ে, যদি আমাকে ওই মন্ত্রে পুজো করে এই গহ্বরের মধ্যে তবে আমি আবার আবির্ভূত হব। আমার আবির্ভাবে ত্রিপুর হবে সেই কল্যাণময় ত্রিপুর। আকাশ হবে নির্মল প্রসন্ন নীল। মেঘ হবে জল ভারনমিত। ত্রিপুর হবে স্বাস্থ্যমতী। নদী হবে নির্মল বারি-বাহিনী। বায়ু হবে বসন্ত বায়ুর মতো মধুর, সে বহন করে আনবে বেণুবন থেকে বংশীধ্বনি।

তাই হলো। পরিশেষে অহরহ কাঁপতে লাগল ত্রিপুরের মাটি। তারপর ফাটলো। ত্রিপুরের মাটির নিচে স্বর্ণ-সন্ধানে খোঁড়া চলেছে যে গহ্বর সুড়ঙ্গ, সে সুড়ঙ্গে জমল উত্তপ্ত বাষ্প। সেই উত্তপ্ত বাষ্প ফাটিয়ে দিলে ত্রিপুরের উপরের মাটি। হাজার ফাটল দেখা দিল। সে ফাটলে ফাটলে বাষ্প উঠতে লাগল নীলাভ অগ্নিশিখার মতো।

সেই আলোতেও, সেই উত্তাপেও মানুষের জ্ঞান ফিরল না। চলতে লাগল নৃত্যোৎসব। আসবপান। হঠাৎ গায়ক স্তব্ধ হয়ে গেল।

কোথা থেকে আসে কান্নার ধ্বনি? কে কাঁদে? মহোল্লাসে ভরা ত্রিপুরে কে কাঁদে? নৃত্যপরা বিলাসিনীরা মাদকতামত্ত হাস্যধ্বনিতে ভরে দিলে ত্রিপুর।

বললে—কোথায়?

তবুও শুনতে পাচ্ছে গায়ক—সেই কান্না।

দৃঢ়-পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। বিলাসিনীরা দিলে টিটকারী। স্বপ্ন-বিলাসী বলে ব্যঙ্গ করলে, ভীরু বলে কটুকাটব্য করলে।

গায়ক শুনলে না। এগিয়ে গিয়ে দেখলে—ত্রিপুরের ওই পাহাড়ের সানুদেশে একটি শ্যামাঙ্গী তন্বী—শুচিশুভ্র তার বেশবাস, স্নানসিক্ত কেশপাশ, হাতে তার গিরিমল্লিকার পুষ্পাঞ্জলি। শুভ্র তার দুটি চোখ—প্রসন্ন বিনম্র তার দৃষ্টি। নতজানু হয়ে সে অঞ্জলি তুলে ধরে কাঁদছে।

'—জীবন মম অন্ত কর কান্ত হে।
দহন হতে মুক্ত কর শান্ত হে॥
তমসা মম ঘুচায়ে দেহ দীপ্তি হে।

মৃত্যু মাঝে অমৃতে দেহ তৃপ্ত হে !
সহিতে নারি দহিতে নারি কান্ত হে !'

অভিভূত হয়ে গেল গায়ক। জেগে উঠল পূর্বস্মৃতি। প্রসন্ন শান্ত অভয় জীবনের স্মৃতি দূরাগত সঙ্গীতের রেশের মতো জেগে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে ?

শ্যামলী কেশবতী মেয়ে তার আয়ত শুভ্র চোখ দুটি তুলে বললে—আমি সাধনা। এই ত্রিপুরে সাধনা আমি। দেবতার বিরহে ত্রিপুরের উত্তপ্ত ভূমি বায়ুতে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। তাই দেবতার কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করছি। কিন্তু দেবতা চলে গিয়েছেন—কে আমাকে মৃত্যু দেবে ? তুমি পার ?

গায়কের চোখ দিয়ে জল গড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলে ত্রিপুরের উত্তাপ। দেখতে পেলে, সহস্র ফাটলে চৌচির তার বুক। দেখতে পেলে, যাকে এতদিন ভেবেছিল জ্যোতি সে জ্যোতি নয়, বিষবাষ্পাগ্নি। লেলিহান তার শিখা দেখে শিউরে উঠল। বুঝতে পারলে গোটা ত্রিপুর পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

সে যাক। তাও সহ্য হবে। কিন্তু এই সাধনা, এই শ্যামলী মেয়েটি এর জীবনান্ত হবে এই কল্পনাই হল তার পক্ষে অসহ্য।

সে বললে, তুমি কেঁদো না। আমি ফিরিয়ে আনব দেবতাকে। দেবতা ফিরলেই ত্রিপুর শান্ত হবে, স্নিগ্ধ হবে।

—হায় গায়ক। দেবতা চলে গেলে তাঁকে ফেরানো সহজ নয়। জানো, কি করলে তিনি ফিরবেন ?

—জানি। যেতে হবে ওই ফাটলে-দীর্ণ পাহাড়ের শিখরের গহ্বরের মুখে। যেখানে আগ্নেয়গিরির মুখের আগুনের মতো লেলিহান শিখা জ্বলছে, সেখানে গিয়ে সেই পুরানো মন্ত্রে তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। আমি তাই যাব।

—না—না। ওখানে গেলে শিউরে উঠল শ্যামলী মেয়ে।

—ওখানে গেলে ফিরব না হয়তো জানি। তা হোক, আমি না ফিরি দেবতা ফিরবেন। ত্রিপুর বাঁচবে। তুমি ফিরে পাবে তোমার কান্তকে-শান্তকে-পুণ্যকে-পূর্ণকে।

গায়ক চলল, পাহাড়ের শিখর-দেশের পানে। গাইতে লাগল সেই গান।

এই হ'ল সেই গাথাগানের বিষয়বস্তু।

ত্রিপুর আনন্দ রায়ের নিজের জীবন। সেদিন সে তার বিসর্জন দেওয়া দেবতাকে ফিরে পাবার কল্পনা করেই এ গাথা-গান রচনা করেছিল। সাধনা-রূপিণী শ্যামলী মেয়েকে সে পেয়েছিল। কালো মেয়ে কৃষ্ণার জীবন থেকে।

গাথা-গানটি কলকাতায় বেশ জমেছিল, নাম হয়েছিল। যুদ্ধের আমলে কলকাতায় অভিনয় গান জলসার আসর বসত প্রায় নিত্য! দর্শকের অভাব হয়নি কোনদিন। জনকয়েক গায়ক-গায়িকা নিয়ে 'ত্রিপুর পুর শিখর পরে কে জাগে কে ?'—অভিনয় করেছিল আনন্দ রায়। দর্শক ভেঙে পড়েছিল। সেই দলের মধ্যেই এসে জুটেছিল ভূপতি। ভূপতি তখন দুঃস্থ। যুদ্ধের বাজারেও ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াত। আনন্দ ওকে দয়া করে নিয়েছিল।

দিন সাতেক টাকা পেয়েছিল অনেক। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ছ-সাত হাজার টাকা। সেই টাকার অর্ধেক নিয়ে আনন্দ রায় গিয়েছিল কৃষ্ণার বাড়িতে। কিন্তু কৃষ্ণাদের বাড়ি তখন খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই সেখানে! ভাঙা দরজাটায় তালা ঝুলছে।

বেবী দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। বক্রহাসি হাসছিল। তাকে ডেকে বলেছিল —সাধনা খুঁজতে এসেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ। কৃষ্ণার খোঁজেই এসেছিলাম।

—ওদের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, দেনা ছিল কিনা।

—ওরা কোথায় গেছে জান ?

—বিলাসিনীরা সাধনার খোঁজ রাখে না।

—তা জানি। জিজ্ঞাসা করাটা ভুল হয়েছিল আমার।

—ভুল আপনার অনেক।

—তাও সত্য ? অনেক।

—সুতরাং আর-একটা ভুলে আপত্তি করবেন না। চা খেয়ে যান।

—নাঃ।

—সরবত। কিংবা ঠাণ্ডা জল।

—না। তাও দরকার নেই।

—একটু গল্প করে যান।

—সময় নেই।

—ওদের খোঁজে ঘুরবেন ?

—ঘুরব।

—সুখী হবেন না।

—না হই আপশোষ করব না।

—দাঁড়ান। দাঁড়ান।

হনহন করে অগ্রসর হতে চেয়েছিল আনন্দ রায়। বেবী দোতলার বারান্দা থেকে ছুটে নেমে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বেশ উষ্মাভরেই মাথা ঝাঁকি দিকে বব-করা চুল দুলিয়ে বলেছিল—আপনি ভেবেছেন কি ?

—আমি তো জানি না কি ভেবেছি আমি। বল তো শুনি।

—এ সব কি করেছেন ? কি লিখছেন ? ট্র্যাস যত সব।
—কি ? ত্রিপুরপুরে কে জাগে ?
—হ্যাঁ।
—ও তুমি বুঝবে না। তোমার জন্যে ও নয়।
—আপনাকে আমরা ধ্বংস করে দেব।
—বল কি ? এইবার অট্টহাস্য করে উঠেছিল আনন্দ রায়।
—আমরাই আপনাকে গড়েছি। আমরাই আপনাকে জলে ভাসিয়ে দেব।
—সেটা হিন্দুমেতো হবে না ?
—আজ ঠাট্টা মনে হবে, কিন্তু পরে বুঝবেন।
—ততদিন তুমি প্রতীক্ষা করে থাক। আমি চলি। আমার অনেক কাজ।
চলে এসেছিল আনন্দ রায়।

পথে একজনের কাছে সংবাদ পেয়েছিল, কৃষ্ণার মা নাকি কাশী গিয়েছেন। কাশী! তাই যাবে আনন্দ রায়। আনন্দ রওনা হয়েছিল কাশী। ভূপতি সঙ্গ নিয়েছিল। আপত্তি করেনি আনন্দ রায়। চলুক, তাই চলুক। নিতান্ত অভাগী ছেলে। বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, ওকে বাঁচানো দরকার।

এসে উঠেছিল ধর্মশালায়।

গঙ্গার ঘাটে এসে বসত কৃষ্ণাদের খোঁজে। রাত্রে গান গাইত বসে!

একদিন প্রতুল এসে প্রশ্ন করলে—আপনি কি আনন্দ রায় ?

আনন্দ রায় গঙ্গার ঘাটে বসে গান করত, তাতে একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। নিজের গাইবার শক্তি তো তার অজানা নয়, ঘাটে গাইতে বসলে লোক জমবেই, সন্ধ্যার দিকে কাশীতে ঘাটের মজলিস ভারত-বিখ্যাত কথাটা ছড়িয়ে যাবেই। নামও সে গোপন করতে চায়নি, নামটা জানাতেই সে ব্যগ্র ছিল। কাশীময় দেওয়ালে বিজ্ঞাপন সেঁটে দিলে যে কাজ হবে তার বহুগুণ বেশি কাজ হবে এতে। কৃষ্ণা যদি তার মায়ের সঙ্গে এসে থাকে এখানে। তবে এ কথা তার কানে সহজেই উঠতে পারবে এবং আনন্দ রায় কাশী এসেছে জানলেই কৃষ্ণা বুঝতে পারবে, সে তার সন্ধানে এসেছে।

মন্দিরের দিকেও যেত। কিন্তু সে দেবদর্শন করতে। মন্দিরে ওদের দেখার প্রত্যাশা তার ছিল না। কৃষ্ণার মা কাশী এসে থাকলে তীর্থ করার উদ্দেশে কখনই আসেনি। কাশী চিরকালের দুঃখী ও পতিতের আশ্রয়স্থল। দুঃখীরা ভিক্ষে করে সমৃদ্ধ হয় না। কিন্তু ছত্রগুলির কল্যাণে খেতে পায়, পতিতেরা কিন্তু সমৃদ্ধ হয়। তারা পাতিত্বকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পাতিত্ব নিয়ে ব্যবসা করতে বসলে কিছুদিনের জন্য অন্তত জয়জয়কার। কৃষ্ণার মা কৃষ্ণাকে নিয়ে কাশী এসে থাকলে অবশ্যই সেই লোভে এসেছে তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাই ঘাটে যখন প্রতুল তাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি কবি আনন্দ রায় ?

আনন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখে নিয়ে বললে—হ্যাঁ।

কে বললে, কেমন করে চিনলেন—এসব প্রশ্ন করলে না। কারণ নিজের খ্যাতি সম্পর্কে সে সচেতন। গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাটালগে তার ছবি আছে, বেতার-জগতে তার ছবি বেরিয়েছে। দু-চারখানা কাগজেও বেরিয়েছে, যদিও কোনটাই তার সঠিক চেহারা নয়, কোনটা বেশি ঘষামাজা ঝকঝকে কোনটা তার সত্যকারের চেহারা থেকে অনেক খারাপ—তবুও দু-একখানায় সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তাকে চিনলে সে কোন প্রশ্ন করবে কেন ?

—এখানে কবে এসেছেন আপনি ? কোথায় উঠেছেন ?

—এসেছি তিনদিন। আছি ধর্মশালায়।

—ধর্মশালায় ? সে কি ?

—আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? চমৎকার জায়গা ধর্মশালা। আর এখানকার ধর্মশালা খুব পরিষ্কার।

—কাশীতে এত বড় বাঙালীর সমাজ আর কবি আনন্দ রায় এসে ধর্মশালায় থাকবেন। সে যে বাঙালী সমাজের দুর্নাম।

ক্ষেপেছেন আপনি। হোটেলে অনেক খরচ।

—হোটেলে কেন থাকবেন ? আমাদের অতিথি হয়ে আমাদের বাড়িতে থাকবেন।

—বাড়িতে ? ওরে বাবারে ! সে আমার পোষাবে না।

—কোন অসুবিধে হবে না আপনার।

—আপনাদের হবে।

—আমাদের কি বলছেন আপনি ?

—দেখুন মশায়। আগে আপনার নামটি বলুন। আমি বিখ্যাত ব্যক্তি নাম বলতে হয় না। কিন্তু আপনি তো তা নন।

আশেপাশে গানের শ্রোতা আগে থেকেই জমেছিল; এখন আবার শ্রোতারা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো এই কথাবার্তা শুনছিল। তাদের মধ্যে থেকেই একজন—সে আবার প্রতুলের চ্যালা—বলে উঠল, উনি আপনার মতো বঙ্গ-বিখ্যাত বা ভারত-বিখ্যাত না হলেও কাশী-বিখ্যাত বটে। প্রতুলদাকে কাশীতে না-চেনে এমন লোক নেই। বাঙালী মেয়েরা বলে—বাবা বিশ্বনাথের ভৈরব। প্রতুল-বাবা থাকতে আমাদের অপমান কেউ করতে পারবে না। বাঙালী প্রৌঢ়েরা বলে, বঙ্গবীর। তরুণদের সে-কি হিন্দুস্থানী কি বাঙালী—এক দলের কাছে উনি হলেন ক্যাগ্‌ট C. A. G. T. মানে কমাণ্ডার, এণ্টিগুণ্ডা ট্রুপারস অন্য দলের কাছে G. D গ্রেটডেঞ্জার। আমাদের সুরেশদা, আপনি নিশ্চয় 'উত্তরা' সম্পাদককে চেনেন, সুরেশদা বলেন—পোটাটো প্রতুল। মানে আলু, শাকে-মাছে-ঝোলে-ঝালে সবেই আছে। মারপিট, সভাসমিতি,

বাঁশী বাজানো, সাহিত্য, ফোটোগ্রাফি, ছবি—কিসে না আছে ও।

প্রতুল হেসে বললে, হ্যাঁ, ওসব দুর্নাম আছে। কিন্তু ও যতখানি বলছে ততখানি নয়। এখন আপনি উঠুন।

—নিশ্চয়। আপনাকেই আমার প্রয়োজন। আপনাকেই যেন খুঁজছিলাম।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। একটি বাঙালী পরিবার এখানে এসেছেন। ঠিকানা জানি না, তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে।

—হবে। এখন চলুন, আগে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসি ধর্মশালা থেকে।

আনন্দ বললে, দেখুন—। পরমুহূর্তেই বললে, আচ্ছা আগে ধর্মশালাতে চলুন, সেইখানেই বলব। ভূপতি, ভূপতি।

ভূপতি পাশেই বসেছিল, ভিড়ের মধ্যে লোকেরা এগিয়ে এসে তাকে হটিয়ে দিয়েছিল। সে অবশ্যই মনে মনে খুশি হচ্ছিল না। কারণ সংসারে অপাত্রে স্বর্ণদানও সহ্য করা যায়, লক্ষপতিকে বা পেশাদার ভিক্ষুককে স্বর্ণদান করা উচিত নয়—তবুও তা সহ্য হয়; কিন্তু অপাত্রে শ্রদ্ধাদান, এ তার অসহ্য। কিন্তু করবে কি? এদেশের ধারাই এই। গায়ে ছাই মাখলেই এদেশে প্রণাম পাওয়া যায়। ননসেন্সের দল দক্ষিণেশ্বরের বটগাছতলাটাকে বলে—পরম তীর্থ। গাছটায় বসে থাকে কাক আর পতঙ্গ। সাপও আছে। কিন্তু ইণ্টেলেকচুয়াল জায়াণ্ট যারা তারা এদের কাছে পেলে অবজ্ঞা।

ভূপতির মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয় একখানা রূপক নাটক লেখে। সভাপর্বের প্রায়শ্চিত্ত দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে গিয়ে পারেনি। কৃষ্ণ নাকি বস্ত্র জুগিয়ে দিয়েছিলেন। রাবিশ। নাটকটা হবে তারই জবাব। নাটকটাতে পুনর্জন্মে রাজপথে চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছে, ব্যাস কৃষ্ণমহিমা প্রচার করতে মিথ্যে কথা লিখেছিল। জিজ্ঞাসা কর বিজ্ঞানকে, সে দেবে এর উত্তর। শেষ দৃশ্যে রাখবে একটি বিচার সভা। সে বিচারালয়ে বিচারক নেই। দর্শকেরাই তার বিচারক। ব্যাসকে দাঁড় করাবে কাঠগড়ায় আসামীর স্থানে। অভিযোগকারিণী হবে দ্রৌপদী। সাক্ষী হবে বিজ্ঞান। তীক্ষ্ণ ধারাল জেরায় ব্যাসকে জর্জরিত করে তুলবে। সব শেষে বলবে, ডাক, তোমার কৃষ্ণকে ডাক। সে তোমার হয়ে সাক্ষী দিক। তোমার ভাগবতে তুমি লিখেছ, প্রহলাদ তার বিজ্ঞানবাদী পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলেছিল, কৃষ্ণ সর্বত্র আছেন। হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, আছে সে এই স্ফটিকস্তম্ভে? প্রহলাদ বলেছিল, হ্যাঁ। হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙে ফেলেছিল, তার মধ্যে থেকে নাকি নরসিংহ মূর্তি বের হয়েছিল। আমরা জানি সেও মিথ্যা কথা। তবু তোমাকে প্রশ্ন করছি, বল তুমি—কোথায় আছে তোমার কৃষ্ণ? এই শূন্যে, এই দেওয়ালে এই মেঝেতে কোথায়? কোথায়? বিজ্ঞান হাতুড়ি দিয়ে

আঘাত করে ফিরবে। তারপর বলবে, এগুলোকে ভেঙে ফেলে খরচ বাড়াবে —সর্বোপরি স্ফটিকস্তম্ভ চাপা পড়ে হিরণ্যকশিপুর মতো মরতে আমরা রাজী নই, কিন্তু এক্সরে করে দেখছি—দেখাও কোথায় সে ?

ব্যাস ভেঙে পড়বে। স্বীকার করবে মিথ্যে, মিথ্যে রচনা করবে সে। কৃষ্ণ মিথ্যে, তার মহিমা মিথ্যে, স্বীকার করছি আমি, স্বীকার করছি।

ওই আনন্দকে তার ব্যাসের ভূমিকা দেবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু কি করবে? তার সময় আজও আসেনি। আজও তাকে আনন্দের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করতে হয়, আনুগত্যও দেখাতে হয়।

সামনে আসতেই আনন্দ ভূপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল প্রতুলের— তার আগে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার। সাহিত্যের আসরে যখন ঘনিষ্ঠ যাওয়া-আসা, সুরেশবাবুর সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা আছে, তখন ভূপতি সেনের নাম অপরিচিত নয় আপনার কাছে।

—অনুবাদ করেন যিনি ?

—হ্যাঁ। ইউরোপের সাহিত্যের একবারে ঘুণ।

—নমস্কার।

ভূপতি ও নমস্কার করলে, বললে, নমস্কার। আপনি লেখেন না ?

না। ও আমার আসে না। কিন্তু একটা কথা বলব আপনাকে। মনে কিছু করবেন না তো ?

বলুন না মনে করলেই বা কি আসে যায় ?

—তা যায়। বলছিলাম আপনি বেছে বেছে ইউরোপের জঘন্য গল্পগুলো অনুবাদ করেন কেন বলুন তো ? ওগুলো মশায় আমাদের ভাল লাগে না।

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে ভূপতি বলেছিল, আপনার ভাল লাগা-না-লাগাটা তো মাপকাঠি নয়।

—আমার কাছে তো বটে। আমিও যে একজন পাঠক।

—আপনার হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন সে আমার ভাগ্য বলতে হবে।

—আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু ওই সব আপনি সত্য বলে স্বীকার করেন ?

—করি বই-কি। আনন্দ রায় আমাকে বলে ডেঞ্জারাস লোক।

—আমি মশাই সোজা লোক, আমি ডেঞ্জারাস বলি নে ? বলি পাষণ্ড।

কথাটা আর অগ্রসর হয়নি। ধর্মশালায় এসে আবার কথা শুরু হল। আনন্দ বললে, প্রতুলবাবু আমরা এইখানেই বেশ থাকব।

—উহুঁ, সে হয় না।

—শুনুন, আপনাদের অসুবিধে হবে। কারণ একটা কথা ভূপতিকে,

এক্ষুনি বললেন না, পাষণ্ড।

—আমি তার জন্যে মার্জনা চাচ্ছি।

—না প্রতুলবাবু মার্জনা আপনি চাইবেন না। কারণ কথাটা ঠিক বলেছেন আপনি। শুধু ভূপতি নয়, আমি আনন্দ রায়—আমিও তাই। পাষণ্ড। আমার জীবন ছন্নছাড়া জীবন, কিছু না-মানার ঝোঁকে আজ এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে শিউরে উঠছি নিজে। ভূপতি হয়তো এগুতে পারে এর পরেও। আমি পারব না। চেষ্টা করেছি পিছিয়ে যাবার। আমি মদ্যাসক্ত, আমি উচ্ছৃংখল। আমি—

চোখ দুটো তার ঝকঝক করে উঠল। বললে, আমাদের নিয়ে যাবেন না।

—থাক্ তা হলে। আমার মা, আমার বোনেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া। আমিও গোঁড়া, আমি মদ্যপকে, মিথ্যাবাদীকে, উচ্ছৃংখলকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। কিন্তু আপনি আনন্দবাবু সব দোষ সত্ত্বেও কবি আনন্দ রায়, দুঃখ পেলাম ঘৃণা করতে পারলাম না, এইটে বিশ্বাস করবেন আপনি।

—কিন্তু আমার সম্পর্কে তো কিছু বললেন না? হাসতে লাগল ভূপতি।

—আপনি অতি ঘৃণ্য জীব।

প্রতুল চলে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু পরের দিনই এসেছিল পবিত্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। ধনী জমিদার এবং সঙ্গীত ও সাহিত্যে রসিক পবিত্রবাবু। তেমনি মধুর চরিত্রের মানুষ। আনন্দ রায়ের নাম শুনে সাগ্রহে আলাপ করতে এসেছিলেন। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন নিজের বাসায়। খাওয়ার এবং গান বাজনার। আনন্দ রায়ের সম্মানের জন্যই জলসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আসর জমতে দেরি হয়নি। আনন্দ রায়ের সঙ্গে পবিত্রবাবুর যোগাযোগ দুর্লভ যোগাযোগ। পবিত্রবাবু যেমন সাহিত্য-রসিক তেমনি সঙ্গীত-রসজ্ঞ, নিজেই তিনি পাকা বাজিয়ে। তিনিও নিজে মদ্যপান করে থাকেন, অবশ্যই ঘরে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেই করেন, পুরনো কালের ধনী জমিদার—বাড়ির ধারাটা বজায় রেখেছেন আজও।

আনন্দ রায়ের সংবাদ পেয়ে যতখানি উৎসাহ স্বাভাবিক, তার থেকে অনেক বেশি উৎসাহ তিনি অনুভব করেছিলেন প্রতুলের মুখে আনন্দ রায়ের খোলা চরিত্রের কথা শুনে এবং আনন্দ রায় মদ খায় শুনে। তিনি প্রতুলকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালায় এসে হাস্যরসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। ওইটি ছিল পবিত্রবাবুর আর এক বিশেষত্ব। প্রতুল তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছিল—পবিত্রবাবু শুধু সাহিত্যরসিক নন, গল্পলেখক গুপ্ত-সাহিত্যিক।

হাত জোড় করে সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রবাবু বলেছিলেন—দোহাই আনন্দবাবু, গুপ্ত কথা-টথা আমি লিখি না। প্রতুলের কথা বিশ্বাস করবেন না।

হেসে ফেলেছিল সবাই। প্রতুল অপ্রস্তুত হয়েছিল, বলেছিল—না, না তা বলিনি আমি বলছি, লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে থাকেন।

—তাই না-কি ? তা হলে আসরে প্রথম হোক আপনার গল্প পড়া।

খুব গম্ভীরভাবে পবিত্রবাবু বলেছিলেন—প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে গবেষণাতে কি আসর জমবে ? ভাল লাগবে ?

—প্রত্নতত্ত্ব নাকি ?

—প্রত্নতত্ত্ব নয় তবে প্রাচীন সাহিত্য বটে। অশ্বত্থামার দুগ্ধপান—! বাধা দিয়ে প্রতুল বললে—সে কি পবিত্রদা, আমি যে পড়েছি। 'বাড়িওলা' 'বেত ও বিদ্যে' বেড়ে গল্পগুলি। 'অশ্বত্থামার দুগ্ধপান' সম্বন্ধে রিসার্চ তো পড়িনি।

—ভায়া, তুমি খানিকটা তড়বড়ে। কথাটা শেষ করতেই দাও। 'অশ্বত্থামার দুগ্ধপান' নাম নয়। কোন গল্পের আমার লেখার সমালোচনা বা স্বরূপ যা বল। গরীব বামুনের ছেলে অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে নেচেছিল—দুধ খেলাম বলে। তাই আর কি ! সে গল্প সাহিত্য নয়, প্রতুলরূপী অশ্বত্থামার পিটুলি-গোলা জল। তবে হ্যাঁ গবেষণার বস্তু বটে। ভাষা কি মশাই 'কদলীবন দলনের নিমিত্ত মদমত্ত মাতঙ্গকে আর বারংবার অঙ্কুশাঘাতে জাগরিত' করতে হবে না গোছের ব্যাপার। সে আপনার ভূপতিবাবুর টেবিলে রঙীন বোতল ধূমায়মান সিগারেট, সুসজ্জিত ওয়েটার, অর্ধনগ্ন নারীর চটুল প্রলাপ—ইতস্তত হাসির আচমকা দমক। পাক দিয়ে প্যাঁচালো সিল্কের রঙীন শাড়িতে আধুনিকার স্ট্রিমলাইন তনু নয়।

ভূপতি চটেছিল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি, একটু হেসে রাগটা ঢেকে রেখেছিল। এবং পকেট থেকে একখানা ডাঁট-ভাঙা ছুরি-চিরুনি বের করে মাথার রুখু ঝাঁকড়া চুলগুলো অকারণে আঁচড়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। পবিত্রবাবু হেসে বলেছিলেন, চিরুনিখানি কিন্তু আপনার কেশ কলাপের উপযুক্ত নয় ভূপতিবাবু। ও যা—পাকা ফসলের মতো মড়মড়ে হয়ে উঠেছে তাতে নিড়েন চাই, চিরুনির সঙ্গে মিল রেখে নিড়ুনি বলতে পারেন।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল আনন্দ রায়, বেড়ে বলেছেন। কিন্তু পাকা ফসলে নিড়েন কেন, কাস্তে বলুন।

—সেটা কাটতে হলে, কাঁচির বদলে কাস্তে। উনি আঁচড়াচ্ছেন তো, তাই নিড়েন বা নিড়ুনি।

—ঠিক। ঠিক। তা চিরুনি শব্দটা কি হলো ?

—ওটা। নিজেই হেসে ফেললেন পবিত্রবাবু। বললেন, ওটা আমাদের দেশের গ্রাম্য রসিকতা। গোটা এবং ভাল হলেই চিরুনি, আর ভাঙা কি ছোট কি খারাপ হলেই কিরুনি। আয়নার বেলাতেও তাই। আয়না আর নয়না। আয়না চিরুনি, আর নয়না কিরুনি।

শুধু এই নয়, রাত্রে মজলিসের শেষের দিকে প্রতুল ধরেছিল—পবিত্রদা কটাহ নৃত্যটা একটু দেখাতে হবে।

মজলিসের শেষের দিক, তখন পবিত্রবাবু ডন-বৈঠক দেওয়া পালোয়ানের মতো তাজা এবং প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন, ভূপতি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়েছে, মুখখানা হাঁ হয়ে দাঁত বেরিয়েছে, চোখ দুটো বুজে বুজে আসছে, আনন্দ রায় হারমোনিয়ম ধরে বসে আছে স্থির হয়ে, সে কিন্তু মদ খায়নি। প্রতুল ওপথেই হাঁটেনি, তবে ফাইফরমাশ যোগাতে তার আপত্তি নেই, অন্তত পবিত্রদার বাড়িতে নেই।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, কটাহ নৃত্য? সেটা আবার কেমন পবিত্রবাবু?

—দেখবেন? উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন পবিত্রবাবু। বললেন, অর্থাৎ নৃত্যছন্দে কড়াই মাজা। কড়াইটার ভিতরের দিক মাজছে ধরুন, সেটাকে পুকুরের ঘাটে নরম মাটিতে প্রায় প্রোথিত করা হয়েছে, তার ভিতরে শালপাতা ছাই রেখে এক পায়ে চেপে ধরেছে, অন্য পাখানি মাটিতে, হাত দুখানি কোমরে বুঝেছেন, নির্জন ঘাট, তারপর ঘনঘন ডাইনে ঘুরে বাঁয়ে ফিরে, ডাইনে ঘুরে, তেরে-কেটে তাক, তেরে-কেটে-তাক, শাশুড়ী ননদ, যাক মরে যাক। ঘুরে ফিরে এক পা ঘুরিয়ে দেহ বেঁকিয়ে নেচে বসে পড়লেন পবিত্রবাবু।

ভূপতি টলতে টলতে উঠে এসে পবিত্রবাবুর, পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলেছিল ক্ষমা Sir, ক্ষমা।

—ওরে father! চুমা খেতে চাইবে না-তো শেষে!

—চাইব! কিন্তু সে চরণে। আপনি মহাপুরুষ, আমি চিনতে পারিনি —এ গ্রেট ম্যান। ভূপতির সে আবেগ আর থামে না।

—ক্ষমা করুন।

—করলাম।

—And—

—And?

—বর দিতে হবে।

—বর?

—হ্যাঁ স্যার, আর একটা বর পেগ। খেয়ে আপনার চরণতলে পড়ে আমি মরে যাই। Let me die—Let me—

পবিত্রবাবু বলেছিলেন না, ওতে আমার নিষেধ আছে, পিতৃ-পিতামহের নিষেধ। সে নিষেধ আমি মানি। First glass for thirst, second for medicine, third for pleasure—and no more. কারণ Fourth for madness, wine made him mad. সেও ওই fourth glass-এর চারে, লক্ষ্মী ছাড়ে। আমি নিজে কখনও খাই না, কাউকে খাওয়াই না, যেখানে খাওয়া হয়, চার গ্লাস চলা শুরু হতেই উঠে আমি চলে আসি। এই কারণেই প্রতুল আমার এ-দোষ সহ্য করে এবং আমার মজলিসে আসে, এমন কি লোককে ঢেলেও দেয়।

—আপনি একটা ছোটলোক।

ভূপতি রুখে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করেছিল। একটা—একটা বুর্জোয়া—

—ভূপতি! ধমক দিয়েছিল আনন্দ।

প্রতুলও উঠে দাঁড়িয়েছিল, আস্তিন গুটিয়ে। তাকে ধরেছিলেন পবিত্রবাবু।

—প্রতুল।

ভূপতি কিন্তু ভয় পায়নি। সে বলেই চলেছিল—Yes—that's a fact. He himself has exposed his real self. বুর্জোয়া একটা বুর্জোয়া। আমাকে হুইস্কী দিয়ে ও ব্রাণ্ডী খেয়েছে। ওই গ্লাসটা নিয়েছিলাম একবার তো সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিলে। বললে আপনি ওইটেতে খাচ্ছেন, ওইটে আপনার। And--and গড়গড়ার নলের মুখে একটা মুখী পরিয়ে তামাক খায় because অন্য লোককে ওই নলে তামাক খেতে দিতে হয়। আমাদের দিতে হয়েছে। Hundred times আমি বলব ও বুর্জোয়া। Like this আনন্দ রায়, third class poet, sentimental fool an emotional re-actionary, re-actionary, an ass—বলে সে টলতে টলতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আনন্দ রায় হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছিল পবিত্রবাবুর কাছে—অপরাধ আমার পবিত্রবাবু।

—না। ও কথা বললে অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমি লজ্জা পাব। প্রতুল, ভাই যাও তুমি কবির সঙ্গে যাও। উনি একলা পাগলা সামলাতে বেগ পাবেন। শীগগির যাও নইলে ও এখন আস্তাবল-পালানো ঘোড়া—কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর আছাড় খাবে এবং কখন খাবে তার ঠিক নেই। রাস্তাটা পাথরের।

প্রতুল মনে মনে চটেছিল। এ রকম ধরনের ব্যবহার বরদাস্ত করা তার পক্ষে অসহ্য। বাল্যকাল থেকে কাশীর জল-হাওয়া এবং ডাল-রুটিতে গড়া সমর্থ দেহখানিকে ডন-বৈঠক-মুগুরভেঁজে সমর্থতর করে তুলেছে। কোন অসংযম বা অনাচার নিজেও করে না বা অন্যকে করতে দেখলে সহ্য করে না। রীতিমতো Agt অর্থাৎ আণ্টি-গুণ্ডা-ট্রুপসের স্বয়ং-নিয়োজিত কমাণ্ডার সে। কার উপাধি C A G T। নিজেই নিয়েছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল কষে দুখানি চপেটাঘাত করে ভূপতির গণ্ডদেশে। শীর্ণ মুখখানিকে ফুলিয়ে একটু পুরুষ্ট করে দেয়। অথবা কাটির মতো গলাটা ধরে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে মাথার স্নায়ু-শিরা-ঘিলুটুকুকে খানিকটা নাড়া দিয়ে নেশাটা ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু আনন্দ রায়ের খাতিরে এবং পবিত্রদার সম্মান রাখতে কিছু না বলেই রাস্তায় এসে ভূপতিকে পাকড়াও করে বললে—দাঁড়ান।

ভূপতি টলমান পায়েই ঘুরে বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, why?

—পড়ে গিয়ে নাক মুখ ভাঙবেন।

—বাঠ্, বাঠ্ (অর্থাৎ **But**) **my nose is my own nose and my face is my own face.**

—সুতরাং পড়ে গিয়ে ভাঙবার একতিয়ার আছে আপনার।

—ইয়েস, আই এম নট আউট অব মাই বাউণ্ডস।

এর মধ্যেই পবিত্রবাবুর চাকর একখানা টাঙা ডেকে এনেছিল, প্রতুল ভূপতিকে চ্যাংদোলা করে তুলে গাড়িতে চাপিয়ে আনন্দকে বলেছিল—উঠুন স্যার। দেরি করবেন না। হতচ্ছাড়া বমি করবে শেষ পর্যন্ত।

পরের দিন কিন্তু ভূপতি নিজেই এসে পবিত্রবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আনন্দকে না বলেই। পবিত্রবাবুকে কিছু বলতে হয়নি। ভূপতি কিছু বলবার আগে তিনি বলেছিলেন, কোন রকম সঙ্কুচিত হবেন না ভূপতি-বাবু, আমি কিছু মনে করিনি, বসুন চা খান। শরীর কেমন?

—বড্ড খারাপ। নম্রভাবেই বলেছিল ভূপতি।

—তা হলে সরবত খান। স্নান করেছেন? আপনার রুখু চুলে তো বুঝবার উপায় নেই।

—না।

—তা হলে স্নান করুন। কিছু খান।

সারাটা দিনই ভূপতি পবিত্রবাবুর বাড়িতে ছিল। স্নান-আহার-বিশ্রাম সবই সেখানে সমাপন করেছিল। সন্ধ্যায় বলেছিল পবিত্রবাবু, আমাকে যদি দিন কয়েকের জন্যে এখানে আশ্রয় দেন। আমি আপনার কাছে চিরদিনের জন্য গ্রেটফুল থাকব। আনন্দ রায়ের অবজ্ঞা অবহেলা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা থার্ডক্লাস তাই বা কেন একটা ফোর্থ ক্লাস ফিফথ ক্লাস লেখক। আপনারা জানেন না, ওর লেখাগুলি সমস্ত আমার সংশোধন করে দেওয়া। হ্যাঁ ও অবশ্য গাইতে পারে, গলা আছে। তাও বিলিতি গানের সুরের সন্ধান আমিই ওকে দিয়ে থাকি। তাল মালের ব্যাপারে না হোক তার ভাবব্যঞ্জনা আমি ওকে বুঝিয়ে দিই। তবে ও ধরতে পারে। অথচ আপনি জানেন না, আমাকে কি অবহেলা ও করে থাকে। আমি চলে যাব কলকাতা। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে একখানা বই দিয়ে এসেছি পাবলিশারের হাতে। তার খবর আর টাকা পাঠাতে লিখব আজ। এলেই আমি চলে যাব। **And I tell you Sir**—বই বের হবে আর পরের দিন সকালেই দেখবেন ভূপতির জন্যে ফার্স্টর‍্যাঙ্কে চেয়ার পাতা হয়েছে। অবশ্য আপনার আমি কিছু কাজ করে দিতে চাই। এমনি আমি থাকব না। **I offer my best service to you Sir**—আপনার লেখাগুলি একেবারে মডার্ন করে দেব।

পবিত্রবাবু কি বলবেন ভেবে পাননি। এ সব মানুষকে তিনি চেনেন।

এদের নিয়ে কারবার করতে তাঁর ভয় আছে। তবুও তাঁর মনে মনে লোভ একটা জেগেছিল ওই লেখাগুলোকে মডার্ন করে নেবার লোভ। কবিযশ প্রার্থনা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই আছে কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ হয়নি। চেষ্টা করেও লেখার স্টাইল তিনি মডার্ন করে তুলতে পারেননি। ভয় এবং লোভের মধ্যেই তিনি দুলছিলেন। ঠিক এই স্তব্ধ অবসরেই ঘরে এসে ঢুকেছিল আনন্দ এবং প্রতুল।

পবিত্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করেছিলেন, কিন্তু ভূপতি নড়েনি। গোল্ডফ্লেকের ধোঁয়ায় রিং ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠেছিল—তোমাকে মুক্তি দিলাম আনন্দ। পবিত্রবাবু আমাকে চাকরি দিয়েছেন। ওঁর গল্পের বইয়ের কপি তৈরি করে প্রেসে দিয়ে ছেপে বের করবার যা কিছু কাজ আমাকে করতে হবে। Sir, আপনি আনন্দকে বলুন, আপনার একবার বলা বোধ করি উচিত। কারণ আনন্দ ভাবতে পারে আপনি ওকে কিছু না বলে আমাকে ভাঙিয়ে নিলেন।

পবিত্রবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বলতে কিছু পারেননি। এমনি একটা দুর্বলতা তাঁর ছিল। এটা তাঁর জন্মগত। তবুও তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন সেটা আনন্দ লক্ষ্য করেছিল। তাই তাঁকে সে কথা মুখ ফুটে বলতে জোর যোগাবার জন্যই আনন্দ বলেছিল, তাই না-কি পবিত্রবাবু ? এমন মতি আপনার হল কেন ?

—পবিত্রবাবু is a great man। বুঝলে আনন্দ ! Realy great. পবিত্রবাবু ওতেই ঘায়েল হয়ে পড়েছিলেন।

প্রতুল গজ গজ করেছিল—গোপনে পবিত্রবাবুকে ডেকে বলেও ছিল—একি করছেন পবিত্রদা ? ওকে রেখে আপনি কি করবেন ?

পবিত্রবাবুর নেশা ধরেছে তখন। তিনি হেসে বলেছিলেন—দেখিই না কয়েকদিন।

প্রতুল ফেরবার পথে আনন্দকে বলেছিল, কবি, আর তো ভূপতির বাধা রইল না। আপনি আমার বাড়িতে আসুন।

হেসে আনন্দ বলেছিল—বাধা তো ভূপতির দোহাই দিয়ে আমি পাড়িনি।

—কিন্তু কাল তো আপনি মদ ছুঁলেন না পবিত্রদার ওখানে।

—তা ছুঁইনি। না-ছোঁয়ার অভ্যাস করতেই এখানে আমি এসেছি প্রতুলবাবু কিন্তু তা পারব কিনা বুঝতে পারছি না। আমার কথা আপনাকে শোনাব। একদিন একটা নিরালা আসর করুন। আগে আমার নতুন গানের পালাটা শোনাব আপনাকে। 'ত্রিপুরপুরে কে জাগে—।'

গঙ্গার বুকে নৌকার উপর একলাই সমস্ত পালাটা গেয়ে শুনিয়ে ছিল আনন্দ। তারপর কৃষ্ণার কথা বলেছিল। বলেছিল—তাকেই খুঁজতে আমি

এসেছি প্রতুলবাবু। ওই মেয়েটিই আমার পালায় ওই শুচিস্মিতা মেয়েটি। ওর অন্তরের আকুলতাই আমাকে মনের জোর দিয়েছে। আমি আবার ফিরে পেতে চাচ্ছি পুরানো দিনের আমাকে। কিন্তু তাকে না-পেলে সে সাধনা আমার পূর্ণ হবে না। আমি জোর পাব না।

এরপর প্রতুল আর মানা মানেনি জোর করেই সামান্য জিনিসপত্র তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। বলেছিল—কাশীতে থাকলে আমি খুঁজে বের করবই। সেই জন্যেই আপনার আমার একসঙ্গে এক জায়গায় থাকা প্রয়োজন।

প্রতুলের সংসারে তিনটি প্রাণী। মা বোন আর নিজে। বোনটি তখন নিতান্তই বালিকা। বছর দশ-এগার বয়স। পড়াশুনো করে, দাদার তত্ত্বাবধানে স্কিপিং করে, একসারসাইজ করে, ছোরা খেলা শেখে, লাঠি খেলা ভালই শিখেছে। বেণী দুলিয়ে গানও করে—মায়ের কাজে সাহায্যও করে। বাঁটনা বাটে ইঁদারা থেকে জল তোলে। কাজও হয় ব্যায়ামও হয়। অসীমা তার নাম।

বড় আনন্দে বড় পবিত্রতার মধ্যে কেটেছিল সেই সময়টা। প্রতুলের মাকে সে বলত মা-জননী। মা-জননী বটেন তিনি। এমন শুদ্ধচারিণী স্নেহশীলা তেজস্বিনী মা তার চোখে পড়েনি। নিজে সে বাল্যকালেই মাকে হারিয়েছিল। মাসি তাকে মানুষ করেছিল—কিন্তু সে মাসি প্রথম ভাগের বেণীর মাসি। কতদিন যে মাসি তাকে বাবুদের বাগান থেকে কাঁঠালের ইঁচড় কাঁচ আম কামরাঙা চুরি করিয়েছে—তার হিসেব নেই। তার উপর লোকে নিন্দা করত তার মাসির এবং বাপের। লজ্জা পেত সে। ক্রুদ্ধ হতো মনে মনে। কৃষ্ণার মাকেও সে দেখেছে। বেবী ডলির মাকেও দেখেছে। আরও অনেকের মাকেই তো সে দেখেছে। জেলা কংগ্রেসের সভাপতির স্ত্রী তার বন্ধুর মা—তিনি অবশ্য এদের থেকে পৃথক ছিলেন। ধৈর্যশীলা কর্তব্য পরায়ণা ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল বড় রূঢ়। পরকে আপন বলে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। হয়তো স্বামী জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে নিজের গৃহ-দ্বারকে করতে চাইতেন অহরহ অবারিত তাই তিনি প্রতিবাদে এমন হয়েছিলেন। কিন্তু যা হয়েছিলেন তাই সত্য, যা হতে পারতেন তা নিয়ে কোন তুলনা চলে না।

আনন্দের সকল কথাই তিনি নিঃশব্দে বসে শুনেছিলেন। প্রথম প্রতুলই বলেছিল তাঁকে। সবটা বলেনি—কিছুটা বলেছিল কিছুটা গোপন করেছিল। তারপর পরিচয় নিবিড় হতে তিনিই একদিন আনন্দকে বলেছিলেন—বাবা তুমি সন্তানের মতো কেন ; সন্তানই। তবু তুমি বড় হয়েছ। তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করে। একদিন তোমার গল্প শুনব। প্রতুল আমাকে বলেছে কিন্তু মনে হল খাপছাড়া। তোমার কাছে শুনব একদিন।

অকপটেই সব বলেছিল আনন্দ। আনন্দ ওইটি বাঁচিয়ে রেখেছিল। তখন পর্যন্ত। সত্য বলার সাহস এবং শপথ।

মা তার গল্প শুনে বলেছিলেন বাবা নতুন কালের তত্ত্ব আমি জানি না। তার দাম হয় তো অনেক। তাতে হয় তো অনেক পায় মানুষ। অনেক পাচ্ছে। ওই তো বাবা সমুদ্র হয়েছে গোষ্পদ, দূর হয়েছে নিকট, অন্ধকারে মুহূর্তে জ্বলেছে ইলেক্‌ট্রিক আলো, আরও কত কত সে-সব তোমরা জান, তোমরা বোঝ। আমি তা জানি না। তা বলে বাবা পুরনো কালের তত্ত্বকে যে মিথ্যে বলে—তাকে আমি বলি সে আমারই মতো অজ্ঞ কি আমার চেয়েও অজ্ঞ। আমার মনের আনন্দ যদি তারা বুঝতে পারতো, আমার মনের ঐশ্বর্যের দাম যদি তারা কষতে পারতো, তবে বুঝতে এর দাম। বাবা এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে আমার সে ঐশ্বর্য এমন আর যে, আর আমার কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি চাই না কিছু, আমি সবই পেয়েছি। তাহলে বাবা পুরনো কালের তত্ত্বের মানেই বল আর দামই বল অস্বীকার করি কি করে। সেই তত্ত্ব ছুঁয়েছিলে ধরেছিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। ভুল করেছ, আশীর্বাদ করছি তাকে ফিরে পাও। যে দেবতাকে পুতুল বলে জলে ভাসিয়েছ তিনি আবার ফিরে আসুন সত্যিকারের জ্যোতির্ময় হয়ে। বেশি দিনের কথা নয় বাবা এই পাঁচ বছর আগের প্রতুল আর অসীমা এদের মধ্যে আমার দুটি সন্তান ছিল—তারা দশ দিনের আড়াআড়ি প্লেগে মারা গেল। প্রতুলের বাপ তখন বেঁচেছিলেন। তাঁর ছিল অগাধ পড়াশুনা। বিজ্ঞানের পণ্ডিত তিনি ধাক্কায় পাগল হয়ে গেলেন। মদ ধরলেন। অতুল নীলিমা হারিয়ে গেল এই বলে ছেলে মানুষের মতো কাঁদতেন। আমাকে বলতেন পাষাণী। কারণ আমি কাঁদিনি। আমি বুঝেছিলাম যিনি দিয়েছেন, তিনি নিয়েছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই হেসে উঠতেন, বলতেন, মূর্খ তুমি, মূর্খ। অন্ধ বিশ্বাস তোমার। ওসব মিথ্যে। সব মিথ্যে। ভগবান-পরলোক-ধর্ম—সব মিথ্যে। যদি তুমি জানতে বুঝতে—আঃ! বলে বুক চাপড়াতেন। বাবা সত্যিই আমি ওদিক দিয়ে মূর্খ। জানি না কিছুই। আমি বলতামও তাঁকে। তাই সত্যি বলে মানলাম। কিন্তু একটা সত্যি তো জানি, যেটা তোমার কাছেও মিথ্যে নয়। জন্ম হলেই মৃত্যু আছে! সেটা তো ধ্রুব। তাই জেনে এমন করে কাঁদে কেন? এ তো জন্তুর ধর্ম। মানুষের তো নয়। গরুর বাছুর মরে। গরু দিন কয়েক চিৎকার করে। তারপর খায়-দায় ভুলে যায়। মানুষ তা তো ভোলে না। তুমি জ্ঞানী মানুষ, এত জ্ঞান সংগ্রহ করেছ তবু তাদের প্রাণের মধ্যে পাচ্ছ না কেন, আমি তো পেয়েছি। বাবা, আমার কথা মিথ্যে হয়নি। প্রতুলের বাবা বছর খানেকের মধ্যেই শোক ভুললেন, কিন্তু মদ ভুলতে পারলেন না। তিনি মারা গেলেন ওতেই। আমি বাবা কিন্তু অতুল নীলিমাকে আজও ভুলিনি। তারা আমার মনের মধ্যেই আছে। এর যে দাম নেই বলে, সে মিথ্যে বলে। আমার পুরনো তত্ত্বের এই গুণটুকু আছে বাবা, এ এই মন দেয়। যে মনের কাছে কিছু হারায় না।

পুত্রশোকের মতো দুঃখেও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় না। মানুষকে হিংসে করে না। কঠিন অভাবকে সহ্য করে কিন্তু কোন পাপ সে করে না।

স্তব্ধ হয়ে বসে তাঁর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনেছিল আনন্দ। কয়েক বৎসরের বুদ্ধিবাদের সাধনায় অনেক পড়াশুনা সে করেছে। প্রতুলের মায়ের কথাগুলি তর্ক করে খণ্ডখণ্ড করে দেওয়া যায়, তার উপযুক্ত বাণগুলি স্মৃতির তূণীরের মধ্য থেকে মন্ত্র-সচেতন অস্ত্রের মতো উঁকি মেরে ঝিলিক হেনে তাকে আহ্বান ও করছিল। কিন্তু প্রতুলের মায়ের কথাগুলি তো অস্ত্র নয়, ওগুলি যেন ওষধি। সেগুলি তার অন্তরে কোন নূতন ক্ষতের সৃষ্টি করছিল না। পুরনো ক্ষতগুলির জ্বালায় একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সান্ত্বনার স্পর্শ সে অনুভব করছিল। এ যেন সূর্যের আলোর মতো দেহপ্রাণ জুড়িয়ে দেয়। আর তার সঞ্চয়ে যা আছে তা যেন আণবিক বোমার শক্তি। তাকে ছাড়লে এখনি হয়তো এমন প্রখরতম আলোকের সৃষ্টি করা যায়, যাতে দিনের আলো ঢাকা পড়ে। এমন উত্তাপ ছড়ায় যে দেহ প্রাণ নিঃশেষে মিশে যায় তার রেণু মাত্র অবশেষ থাকে না। একটা বিপর্যয় ঘটানো যায়। তবুও বিপর্যয়টা অস্তেই প্রসন্ন সূর্য-কিরণের তলায় দাঁড়িয়ে এই সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আণবিক শক্তি সত্য হলে বহু বহুদূরে সূর্যের অবস্থিতি। তার উত্তাপের পরিমাণ, পৃথিবীতে তার প্রতিফলন, তার ফল এ সবের মধ্যে একটা মহা-মহাসত্য রয়েছে। প্রতুলের মা সেটি অনুভব করেছেন—আভাসে বুঝেছেন। তাই তাঁর সূর্যকে প্রণামের মধ্যে প্রণাম নিবেদন রয়েছে সূর্যের চেয়েও বৃহৎ সত্যের কাছে। আণবিক বোমাকে যেমন প্রণাম করা যায় না, কেউ করেও না, তেমনি তাঁর সূর্য প্রণামকে ব্যঙ্গ করা যায় না, অবজ্ঞাও করা যায় না।

প্রতুলের মা আবার বললেন, তোমাকে হয়তো বোঝাতে পারছি নে বাবা। তুমি কথা সাজিয়ে কাব্য করে নিজের মনের ভাবকে দৈব-বাণীর মহিমা দিতে পার, তা তো আমার নেই। ঠিক প্রকাশ করতে পারি নে।

আনন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, না না, আমি বুঝেছি। এতটুকু অস্পষ্ট নেই আমার কাছে। সত্য অনেক আছে ছোটখাটো, বড়, কিন্তু তা ছাড়িয়েও আছে মহাসত্য, মানুষের দেহখানা চিরে চিরে একটি একটি করে পৃথক করা দেহ যন্ত্র দেহকোষ ছোট বড় সত্য ওকে দেখা যায়, নাড়া যায়, দেখানো যায়, কিন্তু ওর পিছনে প্রাণ হল মহাসত্য, তাকে দেখাও যায় না, দেখানোও যায় না ; নাড়া-ছোঁয়াও যায় না। তা বলে তাকে মিথ্যে বলে কে?

এই বাবা এই। কেমন বললে কথাটি। আশীর্বাদ করি বাবা নিজেকে ফিরে পাও। সেই মেয়েটিকে ফিরে পাও।

কিন্তু ফিরে পাওয়া গেল না। কৃষ্ণার খোঁজ মিলল না। এবং এরই মধ্যে হঠাৎ আনন্দ পড়ল অসুখে, জটিল একজ্বরী-জ্বর—ডাক্তার সন্দেহ করলেন টাইফয়েড! আনন্দ বললে, আমি হাসপাতালে যেতে চাই প্রতুল।

প্রতুলের সঙ্গে তখন গাঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রতুল বললে, বলেন কি? আমি আনন্দদা, রোগী খুঁজে বেড়াই সেবা করবার জন্যে! ওটা আমার একটা ভয়ানক সুখের কাজ খুশির কাজ। যা বলেন। তাই হাতে পেয়ে ছেড়ে দোব আমি। সেই নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধে আছে।

'মূর্খ তুমি মাটি কাটি লভি কোহিনুর,
সে রত্ন ফেলিয়া হায়,
কেবা ঘরে ফিরে যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর।'

আমি আনন্দদা যে মিরজাফরের মতো মূর্খ নই।

প্রতুলের মা এসে বলেছিলেন, তা হয় না, বাবা আনন্দ।

আনন্দ আর প্রতিবাদ করেনি। পাশ ফিরে শুয়েছিল। দিন সাতেক পর হঠাৎ ভূপতি পবিত্রবাবুর বাড়ি থেকে এসে হাজির হল প্রতুলের বাড়ি। আনন্দর অসুখ, তাই সে পবিত্রবাবুর কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। প্রতুল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হঠাৎ দশদিন পর আজ এলে প্রথম দেখতে এবং একেবারে বাক্স পেঁটরা নিয়ে। ব্যাপারটা কি বল তো ভূপতিবাবু?

কাজে জবাব দিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আনন্দকে ফেলে যাই কি করে এই অবস্থায়? এখানেই থাকব ক-দিন?

ওদিকে হোটেলটা তখন নৈশ প্রমোদাভিলাষীর ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে। টেবিলগুলো ভরে উঠেছে। অধিকাংশ টেবিলেই বাড়তি চেয়ার পড়েছে। ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান হয়েছে, সাদা চামড়ার সংখ্যা কম, নগণ্য। কিন্তু চেয়ার খালি পড়ে নেই। ধুতি-পাঞ্জাবি, ফুলপ্যান্ট-বুশসার্ট, ধুতি-চায়না-কোট, পাগড়ী দেশিটুপি, খালি মাথাতে ভর্তি। আর সঙ্গে চুনোগলির ফিরিঙ্গী মেয়েদের ভিড়। ওরাই এসেছে প্রমোদ বিহারে। তবে এ বিহারে ওদের পার্শ হাল্কা হবে না ভারি হবে?

আনন্দ রায় প্রতুলের তোলা কৃষ্ণার ছবিখানা হাতে করে কাশীর কথা স্মরণ করল আগাগোড়া। প্রতুল একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সে অবশ্য জীবনে সুনাম-দুর্নামকে গ্রাহ্য করে না, কে কি বলবে ভাবে না, নিজের ধর্মকে দণ্ডের মতো শক্ত মুঠোয় ধরে যত দুর্গম যত সঙ্কীর্ণ যত ক্লেদকীর্ণ পথ হোক, প্রয়োজন হলে সেই পথ ধরেই চলে। তবুও এই পরিবেশে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। আনন্দ রায়কে মত্ত অবস্থায় সে কখনও দেখেনি। কাশীতে থাকতে আনন্দকে সে মদ্যপান করতে দেখেনি। টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার মাস-খানেক পর হঠাৎ একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে বেবীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। বেবীর বাবা তখন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। বেবীর মা আসলে ছিলেন গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে। স্বামীও ছিলেন গৃহস্থ ঘরের ছেলে, তবে

ভালভাবে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করে সাব-ডেপুটি হয়েছিলেন, সে আমলের সভ্য ইংরেজী-নবীশ অফিসার। স্বামীর সঙ্গে তাল রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করেও বেবীর মা উল-বোনা, চায়ের টেবিলে বসা, টেবিলে খাওয়া, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার বেশি আর এগুতে পারেননি। ফলে স্বামীর মৃত্যুর পর অকস্মাৎ দ্বিগুণিত আকর্ষণ অনুভব করলেন বিশ্বনাথের এবং কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গা সলিলের। মেয়েকে নিয়ে তাই তখন কাশী চলে এসেছেন। বেবীও আপত্তি করেনি। কলকাতা তাঁর পক্ষেও তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কারণ ওদিকে যুদ্ধে তখন হঠাৎ ভাঁটা পড়েছে। জাপান এটম বোমায় ঘা খেয়েছে। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাহিনী ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বীরত্ব গৌরবের গাথা বাঙালীর বুকে বীণার নূতন রাগিণীতে সুর বেঁধেছে। বুকে বুকে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। সেই আগুনের আঁচ লেগেছে তাদের সকলের গায়ে, যারা জনযুদ্ধের ধুয়া তুলে নেচে গেয়ে বক্তৃতা করে দেশকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল, দেশের লোকের চোখের কোণে আগুনের শিখার আভাস দেখে ভীত হয়েছে তারা। ট্রামে-বাসে পথে-ঘাটে লোকে টিটকারি দিতে শুরু করেছে। জনযুদ্ধের দলের সঙ্গে সত্যকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও ওদের নাচ গানের দলের সঙ্গে বেবীর মাখামাখি কম ছিল না। এবং পঞ্জাবী মেয়েদের মতো দীর্ঘাকৃতি ববছাঁটা চুল, রাঙানো নখ, রাঙানো ঠোঁট, বেবী প্রায় কলিকাতা শহরে টিকি-ফোঁটা পৈতে-ধারী বামুনের মতোই মার্কমারা ছিল। শিল্পী, সাহিত্যিক, সম্পাদক, মন্ত্রী, আই, সি, এস, অফিসার, পুলিশ অফিসার, প্রফেসারদের মাথার মাথার লোক থেকে ছাত্র নেতারা পর্যন্ত অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ ছিল। এ ছাড়া চিনত ওকে আরও বহুজনে। কাজেই বেবী একটু বেশি অসুবিধেতে পড়েছিল। পথে-ঘাটে প্রায়ই লোকে বলতে শুরু করেছিল। ওই—ওই যাচ্ছে রে।

—কে?

—সেই রে সেই! সেই যে!

ক্রমে 'সেই-যে' কথাটার পরে আরও কথা জুটল, ছোট ছেলের কথা ফোটার মতো। বাইরে বের হওয়া দায় হয়ে উঠল। অথচ বাবার মৃত্যুর পর তার না বের হয়েও উপায় ছিল না। একটা লাইফ ইনসিওর ছিল, সেটার টাকা বের করা, বাবার দেনা ছিল, তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ অনেক এবং সে কাজ করতে একা বেবী ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাজেই পথে-ঘাটে ঘন করে বিছিয়ে দেওয়া কাঁটা একলা দলে চলে পাখানা ক্ষতবিক্ষতই হয়ে উঠেছিল।

এ ছাড়াও আনন্দ রায় যে কাশীতে আছে এ কথা সে জানত। কারণ সেই তো তাকে বলেছিল যে, রেণুর মা ছেলেমেয়ে নিয়ে কাশী চলে গেছে। কথাটা ঠিক নয়। তবে বেবী জেনেশুনে আনন্দকে মিথ্যে বলেনি, রেণুর মা

নিজেই ওই কথা রটিয়ে উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ দিকে যাদবপুর ঢাকুরিয়া অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। সুতরাং বেবীর মা কাশী আসবার প্রস্তাব করবামাত্রই বেবী রাজী হয়ে গিয়েছিল। এবং আনন্দ রায়কে খুঁজে বের করতে তার তিন দিনের বেশি দেরী হয়নি। কাশী থেকে যে কখানা বাংলা কাগজ বের হয় সেগুলোর ঠিকানা সে আগে থেকেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল। সেখানে গিয়ে খোঁজ করতেই তারা বলে দিয়েছিল—বিকেলবেলা গঙ্গার ধারে দশাশ্বমেধ বা মনিকর্ণিকা ঘাটের কোথাও না কোথাও পাবেন। এবং সবিস্ময়ে বেবীর দিকে তাকিয়ে তাকে তারা দেখেছিল। এক জায়গায় প্রশ্ন করেছিল—কিছু মনে করবেন না; আপনি কি দিল্লীর মেয়ে নন? মনে হচ্ছে যেন দিল্লীতে আপনাকে দেখেছি।

একটু হেসে তা হবে বলেই মোটা সাদা-লাল ফ্রেমের ডার্কগ্রীন গগল্‌স্‌টা চোখে চড়িয়ে, নিজের চারিদিকের রহস্যটাকে গাঢ়তর করে তুলে চলে এসেছিল। এবং ঠিক তারপর দিনই দশাশ্বমেধ ঘাটে আনন্দ রায়কে ধরে ফেলেছিল।

আনন্দ প্রতুল এবং ভূপতি তিনজনে বসেছিল। প্রতীক্ষা করছিল, পবিত্রবাবু আসবেন। হঠাৎ রাস্তার উপর থেকে 'আনন্দবাবু' বলে মিহিগলার সুরেলা-ডাকে হেলিয়ে ডেকে প্রায় ছুটেই এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। এবং 'কি, চিনতে পারছেন না?' বলে ব্যাঙের চোখের মতো গগলসটা খুলে ফেলেছিল।

—বেবী।

—হ্যাঁ। তবু ভাল যে চিনতে পেরেছেন!

—তুমি এখানে?

গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে, প্রবহমান স্রোত ও পারাপারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিল, বাবা মারা গেছেন, মা এখানে এসেছেন, আমিও এসেছি।

ঠোঁট দুটি তার ঈষৎ কম্পনে কম্পিত হয়ে উঠেছিল।

—তোমার বাবা মারা গেছেন।

মুখ ফিরিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থেকেই সে বার দুয়েক ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

আনন্দ বুঝতে পারেনি, এর পর কি বলবে। করুণা তার খানিকটা হয়েছিল। বেবীর বাবার ভুল-ভ্রান্তি-দোষ যতই থাক, তবু মানুষটির গুণ ছিল। তাঁর বাইরেটা যতই ফ্যাশনসর্বস্ব হোক, যত ফাঁকিই থাক তার বোলচাল আর বিলিতি কোটেশন কণ্টকিত বিজ্ঞতায়, যতই চাকুরে হিসেবে অহংসর্বস্ব হোক না কেন, লোকটি ছিলেন সরল উদার। ভীরু অথচ আত্মম্ভরী মানুষেরা ভদ্র হলে যা হয় তাই। চাকরি জীবনে নখ-দাঁত-থাকতে কার কি অনিষ্ট করে গেছেন সে কথা আনন্দ জানে না। কিন্তু পেন্সন নিয়ে নখদন্তহীন

হয়ে কেবল মাত্র দন্তহীন মুখে দেশ ও জাতির প্রতি অবজ্ঞার হাসি হেসেছেন ও নখরহীন হাতে শ্রোতার পিঠ চুলকে দিয়ে তাকে দলে টানতে চেষ্টা করেছেন এইমাত্র।

-- চলি ! মা দাঁড়িয়ে আছেন। নমস্কার।

বেবী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

—দাঁড়াও। মা কোথায় ?

—ওই যে।

আনন্দ উঠে বেবীকে অনুসরণ করে বেবীর মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনি। বেবীর মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মতো কিছু তার ছিল না। অল্প পুঁজির মানুষটির মধ্যে কাঁটার ধার কোথাও ছিল না। সাজেপোশাকে উল বোনায়, নমস্কারের ভঙ্গিতে যেটুকু বৈচিত্র্য ছিল, তা তাঁকে বেমানান ছিল না। তাঁর সবটুকুকেই অনায়াসে আত্মসম্ভ্রম বলে নেওয়া যেতে পারত, আত্মম্ভরিতা সত্যসত্যই ছিল না। যে দোষ মানুষের নেই, সে দোষ তাঁকে কেউ দেয় না, নেহাত দলাদলি না হলে দেয় না। আনন্দও তাঁকে দিতে পারে না। তাই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অকৃত্রিম দুঃখেই তার চোখে জল এল। বেবীর মা সত্যই বিধবা সেজেছেন, সাদা থান কাপড়, শুধু হাত, আঁট-সাঁট টেনে চুল বাঁধা, বেবীর মা বিষণ্ণ-বেদনাক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, ভাল আছ বাবা ?

এটুকুও আনন্দকে অভিভূত করলে।

এর আগে পর্যন্ত আনন্দ রায় বেবীর বাবা মা দুজনের কাছেই ছিল—আনন্দবাবু এবং আপনি। শেষের দিকে মধ্যে মধ্যে বেবীর বাবা তাকে তুমি বলতে চেশ্টা করতেন, মধ্যে মধ্যে বলতেন—বুঝলে আনন্দবাবু।

আনন্দ প্রশ্রয় দিত না এ রকম কথার প্রতিবাদ করত সুকৌশলে, নিরুত্তর। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

বেবীর বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, I mean to say—বুঝলেন—কথাটা হচ্ছে –

আনন্দ হেসে টেবিলের উপর থেকে সিগারেট কেস টেনে নিয়ে সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলত, আপনার সঙ্গে আমি একমত। ইউ আর রাইট।

বলেই দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরাত।

বেবীর মাকে—মিসেস মজুমদার বলেই ডাকত। এবং নমস্কারই করত। নমস্কার মিসেস মজুমদার ! আজ বেবীর মাকে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সন্তান সম্বোধনে স্বীকার করে নিলে। মুখে কোন কথা বলতে পারলে না। যা বলবার বললে তার চোখের জল।

বেবীর মা বললেন—আমার অদৃষ্ট—তোমরা কেঁদে কি করবে বল !

চোখ মুছে আনন্দ প্রশ্ন করলে—কি হয়েছিল ?

—কি আর হবে? আজকাল যা আকছার হচ্ছে। হার্টফেল। ব্লাড-প্রেসার আর হার্টফেল এই তো এখনকার রোগ। ডলি চলে গেল, সেই ধাক্কায়ই আর-কি! ওতেই ভেঙে পড়েছিলেন।

তারপর খানিকটা সময় সবাই স্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেবীর মা বললেন, ইদানিং প্রায়ই তোমার নাম করতেন। বেবীকে জিজ্ঞাসা করতেন তোমার খবর—কি হল? হঠাৎ আনন্দবাবু এমন করে নিরুদ্দেশ হল কেন? কি হল তোদের মধ্যে? আমাকেও জিজ্ঞাসা করতেন। তা আমিই বা কি জানি, কি বলব? বলতেন—জানি, ডলিকে আনন্দও ভালবাসত। বোধ হয় সেই জন্যে। কিন্তু—

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন বেবীর মা।

আনন্দ এবার বললে নাঃ। তা নয়। নিজেই আমি শান্তির জন্যে চলে এসেছিলাম কলকাতা থেকে।

বেবী এতক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল সেই এক ভঙ্গিতে, গঙ্গার দিকে মুখ করে ওপারের দিকে তাকিয়ে। এবার সে হঠাৎ মাথার খাটো চুলগুলিতে ঝাঁকি লাগিয়ে দুলিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, উনি সেই রেণুর খোঁজে কলকাতা থেকে কাশী চলে এসেছেন মা, রেণু, সেই যে—

কথা অসমাপ্ত রেখেই বেবী অকস্মাৎ চলতে শুরু করে দিলে।

বিব্রত হলেন বেবীর মা। জোরে ডাকতেও পারেন না। নিজে জোরে হেঁটে মেয়ের পিছন ধরে হাঁটতেও পারেন না। শুধু ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কি করি দেখ তো আমি?

—আমি যাই বেবীকে ধরছি। আপনি আস্তে আস্তে আসুন।

দীর্ঘ পায়ে দ্রুত হেঁটে আনন্দ রায় এসে বেবীকে ধরলে। দাঁড়াও ছেলে-মানুষী করো না।

—না।

—না, নয়। দাঁড়াও। তার হাতখানা চেপে ধরলে সে। বললে রাস্তার মধ্যে কেলেঙ্কারি করো না। লোক জমে যাবে।

বেবীর মা ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছে গেলেন। বললেন, আমাদের তুমি পৌঁছে দাও বাবা। একখানা টাঙা ডাকো বরং। ছি, বেবী চোখের জল মোছ। আর বাড়াসনে কেলেঙ্কারি।

টাঙা ডেকেই ওদের সঙ্গে নিয়ে বাসা পর্যন্ত গেল আনন্দ।

চমৎকার ছিমছাম ছোট একটি বাসা। বেবীদের ওই গুণ ওই সৌন্দর্য-বোধটুকু আছে, যাতে স্বল্প আয়োজনের মধ্যেও একটি রঙীন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

মুগ্ধ হয়েই দেখেছিল আনন্দ।

হঠাৎ শব্দ শুনে দেখলে, বেবী দরজা বন্ধ করে পিট দিয়ে আগলে তার দিকে

তাকিয়ে আছে। চোখে তার সে কি দৃষ্টি।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বেবী তার অভ্যাস মতো বব-করা চুলগুলিতে ঝাঁকি দিয়ে দুলিয়ে স্ফুরিতাধরা হয়ে তীক্ষ্মকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, কেন আপনি আমার জীবনটা এমনভাবে নষ্ট করে দিলেন ?

তোমার জীবন আমি নষ্ট করে দিয়েছি ?—প্রশ্ন করেছিল আনন্দ।

—দেননি ? খেলা করেছেন আমাকে নিয়ে।

ঘাড় নেড়ে আনন্দ বলেছিল, না। অস্বীকার করছি আমি। খেলা আমাকে নিয়ে তোমরাই করেছ।

—আপনি সে খেলায় যোগ দিতে ছুটে এলেন কেন ?

—হ্যাঁ। সে অপরাধ আমাকে স্বীকার করতে হবে।

—তবে ? আজ পিছিয়ে গেলে চলবে কেন ?

—পিছিয়ে গেলে চলবে না, এমন কোন খেলা আমি খেলিনি তোমার সঙ্গে।

—খেলেছেন।

—না। দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়েছিল আনন্দ।

—হ্যাঁ। আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

—পারি। আনন্দও ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

—কি দোষ আমার ? কিসে আমি সেই কালো অশিক্ষিত মেয়েটার চেয়ে ছোট ? কিসে আমি আপনার অনুপযুক্ত ?

—তোমার দোষ না-গুণ আমি জানি না বেবী, তোমার সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে এইটুকু আমি বুঝেছি যে, তোমাকে নিয়ে খেলাই করা যায়, ঘর বাঁধা যায় না, বাঁধতে গেলে সে ঘর খেলাঘর হয়ে উঠবে। ছাড়, এখন দরজা ছাড়। আমাকে যেতে দাও। ঘরে আর খেলাঘরে অনেক তফাত।

—আপনি আসলে অশিক্ষিত মূর্খ, তাই শিক্ষিতা মেয়েদের এমন কথা বললেন। শিক্ষিতা মেয়েদের আপনি ভয় করেন।

এবার হেসে আনন্দ বললে, শিক্ষিতা মানে তুমি বলছ লেখাপড়া-জানা, পাশ-করা। না, তাঁদের আমি ভয়ও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। বাংলা দেশে একালে পাশ-করা মেয়েদের অভাব নেই। তাঁদের যাঁরা পাশ করেও ভুলে যাননি তাঁরা এই দেশের মেয়ে, যাঁরা তাঁদের দলছাড়া দেশের আর সকলকেই অবজ্ঞা করেন না ;—বেবী, এক কথায় যাঁরা তোমার মতো মেকী ফিরিঙ্গী নন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। আজকের এই দুর্দশার দিনে, যখন বাংলা দেশের পাশ-করা মেয়েদের সহজ সাদা পোশাকে অপিসে, ইস্কুলে চাকরি করতে যেতে দেখি, তখন আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। তোমরা তো তারা নয়। তোমরা আলাদা। তোমরা তাদের অবজ্ঞা কর। ঘৃণা কর। তুমি নিজের বুকে হাত দিয়েই বল না, তুমি তাদের থেকে পৃথক কি-না ? আয়নাতে নিজের চেহারা তো দেখ। বাইরের চেহারার পার্থক্যটা ভাব না ! আরও একটা কথা,

ভেবে বল না, ঘর যদি বাঁধ আমার সঙ্গে তবে কোন্ মতে বাঁধবে? তিন আইনের মতে না, এদের মতে? বল না, কোন্‌টা তোমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স?

বাইরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন বেবীর মা।

বেবী দরজা খুলে দিল। মা ঘরে ঢুকে বললেন, ঝগড়া করছিস বুঝি? তোর স্বভাবের পরিবর্তন আর হবে না বেবী। ছি!

মায়ের হাতে জলখাবারের রেকাবি এবং চায়ের কাপ। আনন্দের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, খাও বাবা।

বেবী কথার উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল ঘর থেকে।

বেবীর মা বললে, খাবার জল নিয়ে আয়।

আনন্দ বললে, কিছুদিন আগে আমার টাইফয়েড হয়েছিল। আমি এ সব খাব না। চায়ের কাপটা সে তুলে নিলে।

তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে বেবীর মা বললেন, তাই তোমাকে এত দুর্বল দেখাচ্ছে। না, তা হলে তোমার ও-সব খেয়ে কাজ নেই।

আনন্দ চায়ের কাপটা তুলে নিলে।

বেবীর মা বললেন, চা-টাও তা হলে রাখ বাবা। আমি বরং দু-টুকরো ফল আর এক কাপ দুধ এনে দি।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি চা-টাই খাব। এ সময়ে খাওয়া অভ্যেস নেই, দুধ ফল কিছুই ভাল লাগবে না।

চায়ের কাপে সে চুমুক দিলে। বেবীর মা নীরব হয়ে বসে রইলেন, যেন কথা খুঁজছেন তিনি।

বেবীর মায়ের অবস্থা দেখে দুঃখ হয় আনন্দর। সাদা-মাটা সহজ মানুষ। সধবা অবস্থায় স্বামী-গৌরবে যেটুকু বা অহঙ্কার ছিল, চালচলনে তাঁর হাতের উলের বুনুনির মতো যেটুকু ফাঁসের জটিলতা ছিল, সে সবই আজ চলে গেছে, ঝরে গেছে, খুলে গেছে। আজ তিনি তাঁর শুভ্র বৈধব্যবেশের মতোই অন্তরে অন্তরেও শুভ্র।

কথা আনন্দই আরম্ভ করলে। বললে, কাশীতেই কি স্থায়ীভাবে থাকবেন স্থির করেছেন?

—স্থির? অবস্থা যে পদ্মপত্রের জলের মতো বাবা। কি করে বলব?

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। এর মধ্যে হেঁয়ালির মতো অনেক কথা আড়াল করা রয়েছে। আনন্দ চুপ করে রইল। বেবীর মা-ই কথাটার জের টেনে বললেন, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। পেনসনের আয় তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়েছে। কাশীতে আমার কাল কাটাতে কোন প্রতিবন্ধক নেই। কিন্তু বেবী? ওর জন্যেই সংসারটা হয়ে উঠেছে পদ্মপাতা। আমি হয়েছি জল।

—বেবী তো কোন আপিসে-টাপিসে চাকরি নিলে পারে।

—চাকরি? হাসলেন বেবীর মা। কম মাইনের চাকরি ও করবে না।

কখনও বলে সিনেমাতে নামবে, কখনও বলে, এ দেশ থেকে চলে যাবে। কখনও কিছু আবার। দুদিন পরে বলে আর কিছু।

আনন্দ বললে আপনি ওকে বোঝান।

হঠাৎ বেবীর মা বলে বসলেন, তুমি ওকে বিয়ে করতে পার না আনন্দ? ওর অস্থির মতির আসল কারণ তাই। ও তোমার জন্যেই এমন ধারা অধীর হয়ে উঠেছে। কোন কিছুতেই ওর মন লাগছে না। তুমি কি আমাকে এ দায় থেকে, এ ভাবনা থেকে উদ্ধার করতে পার না বাবা?

আনন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারল না। না, কথাটা মুখে যেন আটকে গেল। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

উত্তরের প্রতীক্ষা করে বেবীর মা আবার প্রশ্ন করলেন, আনন্দ!

—আজ্ঞে?

—আমাদের ধারণা ছিল, তুমি ডলি বেবীকে ভালবাসতে। ডলিকেই হয়তো বেশি ভালবাসতে। কিন্তু সে তো

চুপ করলেন বেবীর মা। বেবীর বাপ হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচতেন। কিন্তু ডলির আঘাতটাই তাঁকে ভেঙে দিয়ে গেল। মৃত্যুর মাস খানেক আগে যেদিন খবর পেলেন ডলির বিরুদ্ধে ওর স্বামী ডাইভোর্স কেস করেছে, ডলি তাকে ছেড়েও চলে গেছে—সেই দিনই বললেন, আমি আজ মৃত্যু কামনা করছি। স্বীকার করছি, এ দোষ আমার—আমার—আমার। আমিই তো ওদের এমন করে গড়ে তুলেছি। উৎসাহ দিয়েছি। এতদিন যা মানিনি তাকেই ডাকছি ভগবান, তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দাও। বেবীকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আবার চুপ করলেন তিনি। চুপ করতে বাধ্য হলেন। অবরুদ্ধ আবেগ। বুকের ভিতরে অবরোধ ভেঙে ফেলেছিল। চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। নীরব হয়ে তিনি বসে রইলেন, কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। নিজেকে সম্বরণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তিনি।

আনন্দ অস্বস্তি বোধ করছিল। বেদনা সে অনুভব করছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছিল যে, জলমগ্ন মানুষের মতো বেবীর মা তার নাগাল পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে জলের নিচে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন। তাঁকে জলের তলা থেকে টানছে, তাঁর মেয়ে বেবী। এই অবসর পেয়ে আনন্দ বললে, কি করবেন? যা ঘটে গেছে বা যে ঘটনার উপর হাত নেই, তাঁকে সহ্য করতে হবে। না করে উপায় কি? আপনি আমাকে যা বললেন, সে আমি ভেবে দেখি। ভেবে উত্তর দেব।

—না, আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি চলে যান। বেবী ঘরে ঢুকল এবার।

—বেবী! ছি!

—না-না-না! যান আপনি।

আনন্দ উঠল না। সে ধীরকণ্ঠে বললে, চিৎকার না-করে তুমি আমার কথাগুলো শোন। তোমার মা রয়েছেন এখানে, যে কথাটা চলছে, সে নিয়ে বেশি উত্তেজনা প্রকাশ করাটা তোমার পক্ষে অশোভন। অন্তত এ দেশের পক্ষে অশোভন। শুধু আমিই ভেবে দেখব না। তোমাকে ভেবে দেখতে বলব।

—ওর ভেবে দেখার কিছু নেই আনন্দ। বেবীর মা হাসলেন, বিষণ্ন করুণ সে হাসি।

আনন্দও হেসে কথাগুলিকে যথাসাধ্য মনোরম এবং মধুর করে তুলে বললে আছে মা। মা বলেই কথা বলছি আপনাকে। ভেবে দেখুন ডলি যখন চলে গিয়েছিল আপনাদের ছেড়ে তখন কত গভীর আকর্ষণ এবং উন্মাদনা সে অনুভব করেছিল। সে ভেবে দেখবার তার ছিল, কিন্তু সে তা ভাবেনি। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশাও তাদের ছিল সুতরাং পরে যেটা ঘটেছে, সেটা ঠিক জীবনের বাইরের অভ্যাসের অমিলের ঝগড়া থেকে ঠিক নয়। মনের রংটা ছিল না পাকা। দশ দিন বা দশ মাসেই সে রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। বেবীরও সেই কথাটা ভেবে দেখা উচিত। আমি ঘর বাঁধিনি, বাঁধলে খেলাঘর বাঁধব না। আমার সে মন আর নেই। কিছু না মেনে উল্লাসে আর কোলাহলের মধ্যে জীবনকে রঙীন সাবানের ফেনার মতো আমি উড়িয়ে দিতে চাই নে। আপনি তো বেবীদের আদর্শ নেত্রীস্থানীয়া সুমিত্রাকে জানেন, সেই আমাকে জানিয়েছিল এই খেলায়। ভুলিয়েছিল আমার জীবন-দেবতাকে। তাঁকে খুঁজে পেতেই আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি। বেবীদের থেকে দূরে সরে গেছি। ও-খেলা আমার নয়। আমি ও খেলা খেললে, বেবীরা তা সহ্য করতে পারবে না। আমাকেও শেষে হয়তো আত্মহত্যা করতে নয়তো উন্মাদ হতে হবে। জলের উপরে উপকূলের ধারে আমার শৌখিন স্নান নয়। আমি জলের তলে গভীরে ডুব দেব। রত্নাকরের প্রবাল পুরী পাই ভাল, নয় তো সেইখানেই হবে সমাধি, বেবীকে সেই কথাটা ভেবে দেখতে বলছি।

এতগুলি কথার মধ্যে বেবী বা বেবীর মা একটি কথা বলতে পারেননি। স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। আনন্দের গম্ভীর মৃদুস্বর প্রাণের আবেগ এবং দৃঢ়তায় একটা বিচিত্র ব্যঞ্জনা পেয়েছিল। ধ্বনির চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিল যেন তার মধ্যে। বুকের ভিতরটা কাঁপে তার স্পর্শে। শুধু তাই নয় ঘরের কোণে ছিল বেবীর সেতার। মনে হচ্ছিল তারগুলিতেও যে এ স্বরের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে। আনন্দ কথাগুলি বলে স্তব্ধ হয়ে ঘরের খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। নিচের দিকটা পর্দায় ঢাকা। উপরের অর্ধেকটা খোলা, সেই অনাবৃত বাতায়ন-পথে নীল আকাশের দিকে সে চেয়ে রইল। এ কথাগুলি বলে যেন মানুষের দিকে, মাটির দিকে। মেঝের দিকে তাকানো যায় না। আপনা থেকে চোখ উপরের দিকে আকাশের গায়ে নিবদ্ধ হতে চায়।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আনন্দ শুনতে পেলে দীর্ঘ নিশ্বাসের

শব্দ। তারপরই তাকে চমকে উঠতে হলো ভেঙে-পড়া কান্নার উচ্ছ্বাসে। উচ্ছ্বসিত শ্বাস-প্রশ্বাসের তরঙ্গায়িত শব্দ যেন একটা আকস্মিক বন্যার মতো স্তব্ধ ঘরখানাকে প্লাবিত করে দিলে। চোখ ফিরিয়ে দেখলে, বেবী দুহাতে মুখ ঢেকে সত্য সত্যই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। সে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়েছে। বেবীর মাও চমকে উঠে মেয়ের কাছে এসে বললেন, বেবী, বেবী ওঠ, ওঘরে চল। ছি-ছি। আনন্দ অপ্রতিভ হল। কথাগুলি বলা তার উচিত হয়নি। বিশেষ করে ডলির কথা তুলে সে এদের মর্যাদায় আঘাত দিয়েছে। অন্যায় সে করেছে। এত কথা না বলে তার সরে যাওয়াই উচিত ছিল। সে এবার উঠে দাঁড়াল। বললে, কেঁদো না বেবী। সুস্থ মনে ভেবে দেখ তুমি। আমি কাল আসব।

মুখে হাত ঢেকেই প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বেবী কান্নার মধ্যেই বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, না।

—আমি কাল আসব।

—না। দাঁড়ান আপনি।

বেবীর মা এবার উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

বেবীর সব বাধাবন্ধ ঘুচে গেল। সে হু হু করে আবার কেঁদে উঠল।

—বেবী।

হঠাৎ বেবী একটা কাগজ-চাপা নিয়ে নিজের কপালে আঘাত করলে। সঙ্গে সঙ্গে কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। সে বললে, আমি ডলি নই। আমার মনের রক্ত চিরকাল এমনি গাঢ় লাল থাকবে।

এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না আনন্দ। সে বেবীর হাত ধরে সস্নেহে আকর্ষণ করে বললে, বেবী, বেবী এ কি করলে তুমি?

—ঠিক করেছি।

—ওঠ।

—না।

—ওঠ বেবী, ওঠ। আমি স্বীকার করেছি অন্যায় আমার। হ্যাঁ, অপরাধ আমার। তোমার ভালবাসায় সন্দেহ করে অন্যায় করেছি। ওঠ।

বেবী উঠে তার বুকের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি মরে যাব, আমি পাগল হয়ে যাব।

বিয়ের সব ঠিক। কথাটা অবশ্য আনন্দ, প্রতুল এবং পবিত্রবাবু ছাড়া কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। হঠাৎ ভূপতি বিচিত্র কাণ্ড করে বসল।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে তাঁর মনিব্যাগ হাতে নিয়ে দোকানে জিনিস কিনে মনিব্যাগ পকেটে ফিরিয়ে দিলে, পবিত্রবাবু পকেটে রাখলেন ব্যাগ। বাড়ি গিয়ে দেখলেন একশো টাকার একখানা নোট নেই।

আনন্দ, প্রতুল, ভূপতি—তিনজনেই ছিল দলটায়। পবিত্রবাবুর পায়ে তখন

ব্যথা। টাঙার উপর চেপে মনে পড়ল এক বোতল হুইস্কি কিনতে হবে। দিনের বেলা সকলের সমক্ষে ওই দোকানে ঢুকতে পবিত্রবাবুর দ্বিধাও ছিল। তিনি বললেন টাঙাওয়ালাকে।

প্রতুল বললে, দিন আমাকে দিন।

মদের বোতল হাতে করে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটতেও প্রতুলের সঙ্কোচ ছিল না। সে খায় না, তাই যথেষ্ট ছিল তার কাছে। পবিত্রবাবু নোট-কেশটাই বাড়িয়ে দিলেন। ভূপতি হাতে করে সেটাকে নিয়ে প্রতুলের সঙ্গ ধরলে। আনন্দও নামলে টাঙা থেকে। বললে, আমি এক টিন সিগারেট নিয়ে আসি।

এরপর বাড়ি ফিরে পবিত্রবাবু দেখলেন, নোটকেশে একশো টাকার একখানা নোট নেই। কিন্তু রাত্রি তখন অনেকটা। পরদিন সকালবেলা তিনি প্রতুলের বাড়ি এলেন। সঙ্কোচভরেই বললেন কথাটা—ভাই প্রতুল, মনে আছে কাল নোটকেশে কখানা, একশো টাকার নোট ছিল। হিসেবে একটু গোলমাল হচ্ছে।

প্রতুল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, কেন বলুন তো! টাকা তো ভূপতি বের করে দিয়েছে। নোটকেশ তো তার হাতে ছিল।

—মানে, থাকবার কথা চারখানা। পরশু পাঁচশো টাকার ইনসিওরেন্স এসেছে। কাল একশো টাকার একখানা নোট ভাঙালাম। খুচরোটা হিসেবে ঠিক রয়েছে। কিন্তু—

একখানা একশো টাকার নোট কম হচ্ছে?

—তাই মনে হচ্ছে। মনে করতে পারছি না—কিসে কি করলাম।

—এ কাজ ভূপতির পবিত্রদা। ওই শুয়োর নিয়েছে। হুঁ। কাল রাত্রে সেই জন্যে বাড়ি এসে আনন্দবাবুর সঙ্গে অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে রাগ করে বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে, মানে চলে গেছে?

—হ্যাঁ, জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। বলসে চললাম আমি। জিনিসপত্র মানে সুটকেশ।

—আনন্দবাবু?

—আনন্দদা রাত্রে ঘুমোননি। তিনি ভোরে স্টেশনে গেলেন। বললেন, টাকাকড়ি আছে বলে তো মনে হয় না। দেখি যদি স্টেশনে থাকে। অন্তত ভাড়াটা দিয়ে আসি।

আনন্দ ফিরে এল। তার সঙ্গে একজন বিদেশি। ইংরেজ একজন। যুদ্ধের কাজ থেকে ছুটি পেয়েছে; দেশে ফেরবার আগে ভারতবর্ষ দেখে বেড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন। পাটনা হয়ে যাচ্ছিল দিল্লী, স্টেশনে আনন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আনন্দর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। লোকটি যুদ্ধে এসেও তার সংস্কৃতি-পিপাসা ভুলতে পারেনি। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের

বাড়িতে ছবি দেখতে আসতো। সেখানে আলাপ হয়েছিল বিখ্যাত প্রগতিবাদী অধ্যাপক সৌরীন চ্যাটার্জি'র সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসা করতো। তিনিই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আনন্দ রায়ের। আনন্দ রায়ের গান তার ভাল লেগেছিল। তাকেও ভাল লেগেছিল আনন্দ রায়ের।

টমাস কুপার তাকে বলেছিল, দেখ রায়, এদেশে এসে যা দেখব আশা করেছিলাম, তা দেখতে পাইনি।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, কি আশা করেছিলে? রাস্তায় ঘাটে বাঘ সাপ, গাছতলায় ইয়োগী, বাজারে-হাটে রোপট্রিক?

—না, না, না। তুমি অবিচার করছ আমার উপর। আমার বড় আক্ষেপ গ্রেট টেগোর নেই। গান্ধীকে এখনও দেখিনি। কিন্তু প্রফেসর চ্যাটার্জি থেকে আরম্ভ করে যত লোকের সঙ্গে আলাপ হল, দেখলাম তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের কিছু নেই। এমন কি গন্ধও নেই। তারা আমাদের অনুকরণ করে। অনুকরণ, অবশ্য খুব ক্লেভার। কিন্তু তবু অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্য সঙ্গীতে যতটুকু আমার গ্রহণ করবার ক্ষমতা তা নিয়ে দেখলাম, সবই তাই। ভাল লাগল টেগোরের গানের সুর—অদ্ভুত! যেন ডিভিনিটির সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে দেয়, একটা মিস্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে। আর ভাল লাগল ওই শিল্পী রায়কে। যামিনী রায়কে। সে ভারতবর্ষকে জানে। আমাকে একটা ভাঁড় দেখিয়ে বললে, সাহেব, এরই মধ্যে আছে আমার ভারতবর্ষ। একটা কাচের পেয়ালা দেখিয়ে বললে, তোমরা সেপাই দিয়ে ইণ্ডিয়া জয় করনি, এই পেয়ালা দিয়েই আমাদের জাত মেরেছ। তোমরা গেলেই কি আমাদের স্বাধীনতা আসবে? তা আসবে না। ওই ভাঁড়ে আবার যেদিন চা, পেয়ালার চায়ের চেয়েও তৃপ্তি করে খেতে পারব, সেই দিন তা ফিরবে। ওই ভাঁড়ের মধ্যেই আমার সোনার ভারতবর্ষের রূপ। আর কিছু মনে করো না। তোমার মধ্যে তার আভাস আছে, গন্ধ আছে, তোমার গানের মধ্যে সেটা পান, কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়।

কথাগুলি ভাল লেগেছিল আনন্দর।

সৌরীন চ্যাটার্জিকে আনন্দর ভাল লাগত না। সে টমাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তবে তুমি ওদের সঙ্গে এত ঘোর কেন?

—তার কারণ ওরা আমাদের পছন্দ করে। তাছাড়া নিজেদের আডমায়ারারকে কার না ভাল লাগে বল? ওরাই আমাদের রায়ের মতো লোকের সন্ধান দেয়। রায়কে আমরা শ্রদ্ধা করি বলেই ওরা অত শ্রদ্ধা করে, সে তুমি জান।

এই টমাস কুপার।

এবার টমাস কুপার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভারতবর্ষের শিল্পশ্রীর এক অভিনব রূপ দেখে এসেছে। আর একজন খাঁটি ভারতের শিল্পীকে দেখে এসেছে।

আচার্য নন্দলাল বসুকে। আর একজনকে দেখে এসেছে—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে। বাংলার ভারতবর্ষের সাধনার এক অতিবিচিত্র সন্ধান তিনি দিয়েছেন। টমাস কুপার বুঝতে পারেনি স্পষ্ট, কিন্তু যেন একটা ছোঁয়া পেয়েছে।

আনন্দ তাকে বলেছে, তা হলে এই কাশীতে নামো। ভারতবর্ষকে পাবে। কুৎসিত পরিচয় চাও তাও পাবে, আর সুন্দরতম পরিচয় চাও তাও পাবে।

টমাস আনন্দের সঙ্গে নেমেছে। বলেছে, তুমি যখন রয়েছ তখন নিশ্চয় নামব।

ভূপতিকে পায়নি। তার আগেই সে চলে গেছে। রাত্রি তিনটেতে একটা ট্রেন ছিল।

টমাসকে একটা হোটেলে তুলে ফিরবার পথে আনন্দ শুনলে পবিত্রবাবুর নোট গোলমালের কথা। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বললে, আমিই এর জন্য দায়ী। ভূপতিকে আমিই এনেছিলাম।

পবিত্রবাবু হেসে বললেন, আমি তাকে চাকরি দিয়েছিলাম আনন্দবাবু।

আনন্দ কিন্তু এতে সান্ত্বনা পায়নি। তার ইচ্ছে হল সে পিছনে পিছনে ছোটে ভূপতির। দুনিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে ধরে এনে তাকে পবিত্রবাবুর পায়ের তলায় ফেলে দেয়। কিন্তু টমাসকে নিয়ে সে বিপদে পড়েছে।

বিকেলবেলা সেই কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ বেবী এসে হাজির হলো।

তুমি যাওনি ওবেলা? চল, মা ডাকছেন।

আনন্দ খুশি হল এতক্ষণে। এই ক-দিনেই বেবী যেন খানিকটা পালটেছে। ঠোঁটে তার লিপস্টিক নেই, মাথার খাটো চুলগুলি প্রসাধনে তেমন উগ্র বৈচিত্র্যে বিচিত্র নয়। শাড়ির রঙে ব্লাউজের ছাঁটেও উগ্রতা কমে এসেছে।

আরও একটা কথা মনে পড়ল আনন্দর টমাসকে বেবী চেনে। টমাসেরও বোধকরি মনে আছে। বেবী ডলিদের অভিনয় দেখেছে টমাস। নাচ দেখেছে।

সমস্ত কথা বলে আনন্দ বললে, এই জন্যেই যেতে পারিনি।

বেবী হেসে বললে, সেই টমাস কুপার। যামিনী রায়ের ভাঁড়ের কথায় পঞ্চমুখ।

—টমাস কুপার ভাল লোক বেবী।

—ওই তোমার দোষ। এই ধরনের যারা প্রোগ্রেসিভ আইডিয়ার বিরোধী তাদেরই তোমার ভাল লাগে।

আনন্দ তার মুখের দিকে তাকালে।

বেবী হেসে বললে, আই অ্যাম সরি। ঝগড়া শুরু করে দিলাম। রাগ করো না।

তারপর আবার করুণভাবে মৃদুস্বরে বললে, আমাকে তোমার মনের মতো করে তোমাকেই গড়ে নিতে হবে। সে তো এক দিনে হবে না।

আনন্দ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, নাঃ, তোমার মতের উপর আমি

জ্লুম করতে চাইনে। কিন্তু আমার মতকে অশ্রদ্ধা করবে কেন ?

—চল, চল, তোমার টমাসের সঙ্গেই দেখা করে আসি।

বাইরে একখানা এক্কা এসে দাঁড়াল।

ওদের দেখা করতে আর যেতে হল না। টমাস নিজেই এসেছে। এক্কা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বললে, ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল! এখানকার এক্কা ওয়াণ্ডারফুল! এমন ঘোড়া!

পরক্ষণেই সে সবিস্ময়ে উল্লাস প্রকাশ করে বললে, সত্যি দেখছি কি ? আপনি না মিস মজুমদার ?

বেবী বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই বললে, আমি অত্যন্ত সুখী যে আপনি আমাকে মনে রেখেছেন।

—আপনাকে এখানে দেখব আমি প্রত্যাশাই করিনি। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলতে হবে। তাহলে চলুন মিঃ রায়, আমরা বেরিয়ে পড়ি। আপনার দেরি দেখে আমি নিজেই চলে এলাম। মিস মজুমদারকে অনুরোধ করতে পারি কি ?

আনন্দ বললে, যাবে তুমি ?

বেবী চুপ করে রইল।

আনন্দ বললে, মিঃ কুপার। এই অল্প কিছুদিন আগে মিস মজুমদার তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। ওঁর মন বোধ হয় ভাল নেই। বেবী ঘাড় নেড়ে বললে, নাঃ, চল যাব।

দিন চারেক পরে টমাস চলে গেল।

এই চার দিনের মধ্যেই আবার বেবীর ব্যবহারে আনন্দ বিস্ময় অনুভব করলে। বেবীর ঠোঁটে আবার রং দেখা দিল। ভুরু ঘন কালো হয়ে উঠল পেন্সিলের শিসের দাগে। চুলগুলি শ্যাম্পুইংয়ে আবার খসখসে হয়ে উঠল। তার হাসিতে করকর ধ্বনি জাগল।

আনন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

বেবীকে শান্ত স্নিগ্ধ করে তুলতে অনেক সাধনা করতে হবে তাকে।

প্রতুল তাকে বললে, কিছু মনে করবেন না দাদা। একে নিয়ে কি সুখী হতে পারবেন ?

আনন্দ বললে, আমার ফেরবার পথ নেই ভাই।

টমাসকে গাড়িতে চড়িয়ে দেবার সময় একটা ফুলের তোড়া দিলে বেবী।

এর ঠিক দিন দশেক পরেই অকস্মাৎ বেবী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। চিঠি লিখে রেখে গেছে, সে দিল্লী যাচ্ছে। টমাসকে সে বলেছিল তার অসহায় অবস্থার কথা। সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। টমাস খবর দিয়েছে, একটি ভাল চাকরি তার হতে পারে। পত্রপাঠ চলে আসতে

লিখেছে। এ চাকরির ভবিষ্যৎ আছে! হয়তো বা বিদেশে যেতে হতে পারে। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র বিভাগে দেশ-বিদেশে কাজ বাড়ছে। সেই সুযোগ সে পেতে পারবে। আনন্দকে লিখেছে, সে যেন তাকে ক্ষমা করে। সে তাকে ভালবাসে, কিন্তু মতের দিক দিয়ে গরমিলের কথা ভেবেও ভয় পায়। অনেক ভেবেই সে যাচ্ছে। এবং তার গহনার জন্য আনন্দ তাকে যে হাজার টাকা দিয়েছিল, সেটা সে এখন নিয়েই যাচ্ছে। পরে শোধ দেবে নিশ্চয়।

কৃষ্ণাকে দেবার জন্য কলকাতায় 'ত্রিপুরে কে জাগে'—অভিনয় করে যে টাকা নিয়ে এসেছিল আনন্দ এ হাজার টাকা সেই টাকার টাকা।

আনন্দ প্রতুলকে বলেছিল চল, পবিত্রবাবুর বাড়ি যাব। আজ মদ খাব।

হোটেলের মধ্যে হঠাৎ হৈ-চৈ উঠল।

একটা টেবিলে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাতের ফলে উল্টে পড়েছে বোতল গেলাস। তাই কুড়োতে ছুটে এসেছিল বয়; একজন তাকেই মেরেছে ঘুষি। সামান্যকে অসামান্য, তুচ্ছকে সাংঘাতিক করে তুলতে সুরার মতো অসাধারণ শক্তি কার! সুতরাং এখানে ঝগড়া হলে অপর যারা থাকে বা আসে তারা চকিত-দৃষ্টি তুলে দেখে—আবার আপন আপন পানীয় শেষ করতে মনোনিবেশ করে; হৈ-চৈ বেশি হতে শুরু হলে বিল মিটিয়ে সরে যাবার তালে থাকে।

আনন্দও চকিত হয়ে উঠেছিল। অতীত কথার ছেদ পড়ে গেল। প্রতুলও চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সেও ভাবছিল, এই কৃষ্ণা আনন্দ রায়ের।

সে সময় প্রতুল সমস্ত কাশীটা প্রায় চষে বেড়িয়েছিল। এই কালো মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে। তার মনে হতো, কেমন সে কালো মেয়ে আনন্দ রায়ের মতো এমন একজন দুরন্ত প্রাণবান মানুষকে এমন করে আকর্ষণ করেছে? তাকে দেখবার তার সাধ হতো। এই সেই মেয়ে? কিন্তু সে ভাবনার তন্ময়তা ভেঙে গেল এই গোলমালে। এই ছবির মেয়েটিই কৃষ্ণা, এই কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

এবার সে উঠে বললে, উঠুন আনন্দবাবু। হয়তো একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে এইবার।

হেসে আনন্দ বললে, তা হয়তো নাও হতে পারে। এর পরই হয়তো দুই বন্ধুতে গলা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করবে।

আবার পুলিশ এসে হাজির হতে পারে। উঠুন। ওদিকে রাত্রিও হয়েছে।

আপত্তি করলে না আনন্দ।

ভূপতির খোঁচায় বেবীর আচরণে তার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল প্রতুলকে হঠাৎ পেয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে জ্বালা শান্ত হয়ে এসেছে অনেকটা। বিশেষ করে কৃষ্ণার এই ছবিখানি। এ যেন এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার।

কৃষ্ণার সেই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত—সেই তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সাল থেকে এই আট-ন বৎসরের মধ্যে এই অপরূপাকে তো সে কৃষ্ণার মধ্যে কোন দিন ক্ষণেকের জন্য পলকের মধ্যেও তো দেখতে পায়নি। কি করে প্রতুল তাকে আবিষ্কার করলে, ধরলে তার ক্যামেরার মধ্যে।

এ-কি ক্যামেরার চাতুর্য ? প্রতুলের হাতের নৈপুণ্য !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে আনন্দ রায়। অথবা তার চোখের দৃষ্টির অক্ষমতা ? দেখতে পায়নি সে। হয়তো তাই।

প্রতুল বললে, আসুন, আর দেরি করবেন না। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে।

আনন্দের মত্ততা সহজে আসে না। দেহে তার শক্তি আছে। সহ্যও সে করতে পারে। মদ্যপান সে অবশ্য সাধারণ হিসেবে কম করেনি। ছ-আউন্স এবং একটা বিয়ারের আধখানা। সাধারণ লোকের পক্ষে ওই অনেক। কিন্তু আনন্দ ওর চেয়ে অনেক বেশি খেয়েছে অনেকবার। টলেনি। কিন্তু আজ তার পা টলল। চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসবার মুখেই পা টলে গেল। টেবিলটার কোণাটা ধরে দাঁড়াল সে। প্রতুলের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

প্রতুল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আসুন।

বেরিয়ে এল তারা।

বাইরে আলোকিত চৌরঙ্গী তখন জনবিরল হয়ে আসছে। ফুটপাথে ভিড় একেবারে কমে গেছে। রঙীন আলোর বিজ্ঞাপনগুলো নিভে গেছে। হোটেল এবং সিনেমা ছাড়া কোন দোকানের আলোগুলো জ্বলছে না।

একখানা ট্যাক্সি ডেকে প্রতুল আনন্দকে চড়িয়ে দিলে। বললে, বাড়ি চলে যান।

প্রতুলের ডিউটি অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। তাকেও ফিরতে হবে শহরের এক প্রান্তে। অনেকটা রাস্তা। তবু সে বাসে বা ট্রামে চড়লে না। হাঁটতে শুরু করলে। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। এই কৃষ্ণা।

মেয়েটি যে অসাধারণ সে কথা সে জানে।

মনে পড়ল প্রথম সাক্ষাতের কথা। সেই লোক-গণনার সময়।

উঃ কি সে তার চেহারা। মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। নিকষ কালোর উপরেও মৃত্যুর কালো ছায়া ফুটে ওঠে। সে-রূপ প্রতুল ভুলবে না।

তেমনি কি কথা।

—দু-দিন কি দশদিন কি মাসখানেক পরেই যাকে হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে যার অস্তিত্বকে, তাকে যোগ দিয়ে হিসেবটা জটিল করে কি করবেন ? আর আমি তো মরেই গেছি। অনেক দিন মরে গেছি। মানুষের সঙ্গে প্রেতের সংখ্যা যোগ দিয়ে কি হবে ?

চোখ দুটো তার অস্বভাবিক দীপ্তিতে প্রখর হয়ে উঠেছিল।

তারপর। বাপের নাম ও জাতির প্রশ্নে বলেছিল, ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

—কিন্তু আমার যে চাই।

হেসে বলেছিল, সমাজে হয় তো ঠাঁই হয় না কিন্তু রাজ্যের মধ্যে অজ্ঞাত-পিতৃত্ব মানুষের ঠাঁই আছে। তাদের সংখ্যা তো একেবারে নগণ্য নয়! লিখে নিন পিতা অজ্ঞাত, জাতিও তাই।

পঞ্জাবী বুড়ী তাকে বলেছিল, দাঙ্গার সময় মুসলমান গুন্ডারা ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে নাকি এক ভয়াবহ কাহিনী।

প্রতুল আর জিজ্ঞাসা করেনি। করুণা হয়েছিল, বেদনা অনুভব করেছিল। এই মর্মন্তুদ কাহিনী শুনবার মতো কৌতূহল তার ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পড়েছিল, বউবাজার সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুর জংশনের কাছে। ওই আর খানিকটা গিয়ে, মেডিকেল কলেজের সীমানা পার হয়েই সেই পঞ্জাবী বুড়ীর আস্তানা। সেখানে যাবে নাকি? বুড়ীকে রাত্রে ডেকে বলবে—বল তো বুড়ীমা, সেই লেড়কীর কাহিনী। বল তো শুনি!

পরক্ষণেই সে সংকল্পটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উত্তরগামী একখানা বাসে উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে আনন্দের ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়। সাধারণত আটটার আগে উঠতে পারে না। অথচ প্রথম জীবনে সে উঠত সূর্যোদয়ের আগে। কৈশোরে তার একটা শখ ছিল ভোরবেলা পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানোর। খুব ভোরে উঠে মাঠে চলে যেত, সেখানে ঝরনায় মুখ হাত ধুয়ে একদফা গলা সাধত। তারপর ফেরার সময় গ্রামে ঢোকবার মুখেই প্রভাতী সুরে গান ধরে বাড়ি আসত। তখনও লোকজন সকলে উঠত না। উঠত প্রবীণা মেয়েরা, তারা ঠাকুরবাড়িতে জল দিত; কেউ কেউ গ্রাম প্রান্তের মন্দিরে যেত। দু-চারজন প্রাচীন উঠতেন; তাদের সঙ্গে পথে দেখা হতো।

জেলখানার জীবনেও এ অভ্যাস বজায় ছিল। তখন ভোরে উঠে বদ্ধ ঘরের মধ্যে ডন বৈঠক দিয়ে ব্যায়াম করত। গান তখন গাইত না। কারণ সঙ্গীদের অনেকে ঘুমোতেন। পড়াশুনা আলোচনায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত অতিবাহিত হতো তাঁদের।

অভ্যাসটা গেল—এই জীবনে। গালিফ স্ট্রীটের কাছে সুমিত্রার শিক্ষায়—মনের ভেতরের দেবমূর্তিটিকে টেনে ফেলে দিয়ে সেদিন থেকে ক্লাবে-হোটেলে-মজলিসে সান্ধ্য-সাধনা শুরু হলো সেই দিন থেকে ক্লাব-হোটেল-মজলিস সব দিন হয় না, কিন্তু এরপর বাসাতেও তার একটার আগে ঘুম আসে না। রাত্রি যত গাঢ় হয় তত মনের মধ্যে কেমন একটা উন্মাদনা জাগে।

তার উঠতে নটা বেজে গিয়েছিল। উঠে বসেও সে ঢুলতে লাগল। গত

রাত্রে মদ্যপান সে কম করেনি। উত্তেজনার মধ্যে অনেকটা খেয়েছে। এখনও মাথাটা কেমন করছে। জড়িত স্বরে সে ডাকলে কৃষ্ণা, চা দাও।

কোন উত্তর এল না। সে এবার একটু জোরে ডেকে বললে—কৃষ্ণা একটু তাড়াতাড়ি।

আবার বললে—র-চা, লেবু দিয়ে। দুধ না।

কেউ কোন সাড়া দেয় না।

এবার সে বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়িতে যেন কেউ নেই। সামনে রান্না-শালায় উনোন ধরে গম্ গম্ করছে।

একটা কেৎলী চাপানো রয়েছে। পাশের ঘর কৃষ্ণার ঘর, সেটাতে শেকল লাগানো। কি হলো? গেল কোথায়?

বেবী? সে গেল কোথায়?

ঠিক এই সময়েই মগের জল মেঝেয় পড়ার শব্দ হলো।

বাথরুমে কেউ আছে। যে আছে সে বেবী। কারণ বেবী কোথাও যেতে পারে না। সুতরাং এ বাড়িতে যে একটি মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করা যাবে বা যাচ্ছে সেটি বেবীর ছাড়া অন্য কারুর হতে পারে না। আনন্দ কয়েকবার গলা ঝেড়ে শব্দ করে সাড়া দিল। ফল হলো বেবী বাথরুম থেকেই সাড়া দিলে—যাচ্ছি আমি!

আনন্দ ঘর থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে এসে বারান্দায় বসল। আশে-পাশে বস্তিতে কল কল শব্দ উঠছে। আনন্দ গত রাত্রের কথা মনে করছিল।

ওঃ, কাশীতে সে কয়েক মাসের কথা তার কাছে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। প্রতুলকে দেখে মনে পড়েছে দীর্ঘদিন পর। কাশীর যে কথাটা মনে থাকে সেটা ভূপতির কলঙ্কের ঘটনাটা, ওই পবিত্রবাবুর নোটকেশ থেকে একশো টাকার নোটখানা যাওয়ার কথাটা। এছাড়া নিজের দিকের কথা, প্রতুলের কথা, তার মায়ের কথা, এমন কি কৃষ্ণাকে খুঁজতে গিয়েছিল—এ কথাটাও তার মনে নেই, বা ছিল না। 'ত্রিপুরে কে জাগে'—এই নৃত্যনাট্যের গানগুলোও তার মনে নেই সব।

কি করে থাকবে? কাশীতে সেই রাত্রে পবিত্রবাবুর বাড়িতে সেই যে আবার মদ্যপান শুরু করলে তাতে তার ছেদ পড়েনি।

কলকাতায় ফিরে এসেই জীবনটার মোড় ফিরে গেল আবার। হাওড়া স্টেশনেই।

হাওড়া স্টেশনে নেমে তখন ভাবনা হয়েছিল, যাবে কোথায়? হাতে যে টাকা ছিল, তার মোটা অংশটা বেবী নিয়ে চলে গেছে। যেটা অবশিষ্ট আছে, সেটা নিয়ে হোটেলে উঠতে ভরসা হচ্ছিল না আনন্দর। শ-চারেকের মতো টাকা আছে। কিন্তু একে হোটেল, তার উপর আনন্দ। হয়তো দু-তিন দিনে উড়ে যাবে। অবশ্য টাকার জন্য তার ভাবনা নেই। টাকা রোজগার

করতে সে জানে। গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে রয়ালটির হিসেবের সময় হয়নি বটে, তবে গিয়ে দাঁড়ালে অবশ্যই অগ্রিম হিসাব পাবে।

গান কতকগুলো লেখা আছে। কাশীতে লিখেছে। তার ঢং অবশ্য চলতি আধুনিক থেকে স্বতন্ত্র—ভাবে-সুরে দুদিক থেকেই। এগুলি ভারী গান। গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ ঠিক পছন্দ করবে কি-না আনন্দ বুঝতে পারে না। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই আনন্দ কথাগুলি ভাবছিল।

এই অবস্থায় কোথায় যাবে ? কুলিটা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ওদিকে বম্বে মেল আসবার সময় হয়েছে। সে ওদিকে যাবে। তখন ১৯৪৬ সালের প্রথম। যুদ্ধের বাজারের জনতা—উত্তাপ গমগম করছে। সায়েব-সুবোর ভিড়ের অন্ত নেই। তার উপর যুদ্ধ শেষ হওয়ায় তাদের মেজাজ হয়ে উঠেছে দিলদরিয়া। একটাকা দু-টাকার নোট তারা ছুঁড়ে দেয়, যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়।'

অগত্যা আনন্দ তার ব্যাগ বিছানা নিয়ে এসে উঠল—স্টেশনের ইণ্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে। জিনিসপত্র রেখে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে রওনা হবে। এরই মধ্যে ভেবে নেবে কোথায় যাবে।

ইণ্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুমের গায়েই ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাশের বুকিং অফিস। তার গায়ে প্লাটফর্মের ভিতর দিকে পাশাপাশি দেশি-বিলাতি খানাঘর। দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে কিছু খাবার জন্যই সে ওদিকে গিয়েছিল। ভাবছিল—কোথায় ঢুকবে। কেলনারের ভিতরে দরজার মুখেই ঠিক এই মুহূর্তে উঠল একটি নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার। অসুস্থ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ক্ষুব্ধ চিৎকার !—Leave me—Let me alone—

পরমুহূর্তেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল একটি অত্যাধুনিকা। বব-করা চুল, মুখে রং, ভুরু আঁকা, চোখে গগলস। পরিধানে পাতলুন এবং শার্ট : মাথায় বাঁধা রুমাল। হাতে সিগারেট ; পায়ের গতি খুব স্বচ্ছ নয় ; বেরিয়ে এল ওই চিৎকার করতে করতেই। তখনও বলছিল—No no—no—

মেয়েটির পিছনে একজন দুঃসাহসী অত্যাধুনিক ভারতীয় ; কোন্ প্রদেশের লোক বোঝা যায় না, তবে সে বাঙালী নয় এটা ঠিক। সে-ও খুব সুস্থ নয়। সুরার প্রভাব দুজনের উপরেই রয়েছে।

লোকটি বলছিল—Please—please—darling—please—No—no

পরমুহূর্তে সে অর্থাৎ মেয়েটি ডাকলে, কুলি, কুলি—আনন্দ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সে সবিনয়ে বললে, অনুগ্রহ করে আমাকে ভিতরে যেতে দিন !

মেয়েটি উগ্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, Good lord আনন্দবাবু ! কবি !

সঙ্গে সঙ্গে সে গগলসটা খুলে ফেলে বললে, চিনতে পার না আমাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে খুলে ফেললে, রুমালখানা।

—ডলি !

—ডলি ! ইয়েস। আমি ডলি।

আনন্দর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বললে, আমার বাবা মারা গেছেন, আমার মা, বেবী কেমন আছেন কবি !

আনন্দ ভেবে পেলে না, এই অবস্থায় এইখানে দাঁড়িয়ে সে কি জবাব দেবে।

—আনন্দবাবু !

—সে অনেক কথা ডলি। এখানে দাঁড়িয়ে—

—চল, এখুনি চল, আমাকে বাড়ি পেঁীছে দেবে।

—Darling ! ডাকলে সেই ভদ্রলোকটি।

ডলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্নকণ্ঠে বললে, কি চাও তুমি ! কি ভাব তুমি আমাকে ? এবার আমি পুলিশ ডাকব।

এবার আনন্দ বললে, উনি কে ?

—ট্রেনের সহযাত্রী। এক গাড়িতে বম্বে থেকে আসছি। অবশ্য কিছু আলাপ ছিল। এখন আমার সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছেন না। অসভ্য বর্বর। ওকে আমি বার বার বলছি—আমি বাড়ি যাব, আমার বাবা মারা গেছেন, you leave me। কিন্তু—

পরক্ষণেই সে লোকটির দিকে ফিরে বললে, Will youleave me or not ?

লোকটি বললে, আমাকে ক্ষমা কর মিস মজুমদার। তোমার এতটা গভীরতা আমি বুঝতে পারিনি।

ডলি বললে, Be a sportman, my dear sir, don't talk nonsense ; কোনো হোটেলে গিয়ে ওঠ। Grand আমার পছন্দ। আমি দেখা করব পরে। যাও—I promise—

ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় আনন্দর সঙ্গে বিছানা ব্যাগ দেখে ডলি বললে, তুমি কোথা থেকে আসছ কবি ?

—আনন্দ বললে কাশী থেকে ?

কাশী ? My god ! বম বিশ্বনাথ ! সেখানে কোথায় গিয়েছিলে ? তুমি শেষে কাশী গিয়েছিলে ? অথবা বিশ্বনাথের বদলে কোন চুম্বক আকর্ষণ করেছিল।

আনন্দ একটু হেসে বললে, বেবী কাশীতে ডলি !

—বেবী কাশীতে ?

—তোমার মা সেখানে !

—তা হলে এখানকার বাড়িতে কে আছে ?

—বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন।

—হুঁ। বাবার দেনার দায়ে বুঝি ? যাক, সে বেশ হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি ওদের সাহায্য করব বলেই এখানে এসেছিলাম। যে

লোকটিকে দেখলে না, ও ধনীর ছেলে। ওকে কলকাতায় সোসাইটি দেখাব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সঙ্গে এনেছি। এদিকে ভাল লোক। কিন্তু যাকে ধরবে, তখন তার সঙ্গ ছাড়বে না—not for a moment you may say; আমি কিন্তু তিক্ত হয়ে উঠেছি—sick of him—আমি পালাতে চাই।

চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল ডলি। তারপর বললে, এই জীবনের কাছ থেকে আমি পালাতে চাই। I am sick, tired, আনন্দবাবু—

আবার সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। আনন্দও স্তব্ধ, কি বলবে সে। তবে তার সর্বঅঙ্গে অন্তরে যেন দোলার পালা শুরু হয়েছে। দোলন লেগেছে। সেও গত রাত্রে ট্রেনের রেস্টুরেন্ট কারে বেশ খানিকটা মদ্যপান করেছিল। তার রেশ পুরো কাটেনি। তার উপর ডলি, দীর্ঘকাল পর মাদকতাময়ী ডলিকে পেয়েছে পাশে। ডলির নিশ্বাসের সুরাগন্ধ তার রুখু চুলের লাভেণ্ডারের গন্ধ তার শ্বাসের সঙ্গে বুকে গিয়ে ঘূর্ণির মতো পাক দিয়ে উঠছে।

জীবনাকাশে অকস্মাৎ কৃষ্ণা এসে উদিত হয়েছিল, তন্ত্রকথার মায়াময়ী যোগিনীর মতো। মানুষের মনের ভ্রান্তিতে অন্ধ-বিশ্বাসে তার বসতি। প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলিস্কোপের লেন্সকে আচ্ছন্ন করে অগ্নিপিণ্ড জ্বলন্ত সূর্যকে, সপ্তাশ্ববাহিত রথের রথী-মূর্তিতে দেখাতে পারে তার মায়া। মায়াময়ীর মায়া মিথ্যা, সে মিথ্যা থেকে আনন্দ আবার বাস্তবসত্যে এসে পড়েছে!

অথবা কৃষ্ণাই সত্য, এরাই মায়া—বেবী মায়াময়ী, ডলি মায়াময়ী। কৃষ্ণাকে পাবার সাধনায় এরা তার ধ্যানভঙ্গ করতে এসেছে। বেবী এল, ধ্যান ভেঙে মিলিয়ে গেল। আবার এল ডলি। কোথায় নামিয়ে দিয়ে যাবে ডলি? যেখানেই যাক, সেইখানেই যাবে আনন্দ।

ডলি বললে—বেবী আমাকে লিখেছিল তুমি আমাকেই নাকি চেয়েছিলে। আমার চলে যাওয়ায় তুমি এমন আঘাত পেলে যে, বেবীর দিকেও ফিরে চাইলে না। এই দেখ সেই চিঠি? যখন পেয়েছিলাম তখন জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া একটি কোমল মসৃণ ঢালুপথে সোনার ভাটার মতো গড়িয়ে চলেছে আমার জীবন; সে দিন বেবীর চিঠি পড়ে হেসেছিলাম—খিলখিল করে হেসেছিলাম। কিন্তু তবু চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি। রেখে দিয়েছিলাম জীবনের হাটে বা এক্জিবিশনে পাওয়া সোনালী হরপে ছাপা সার্টিফিকেটের মতো এই দেখ, দেউলে অবস্থায় সেইখানাই বুকের উপর রেখে কলকাতায় ফিরছিলাম. তোমাকেই খুঁজতাম আমি। বেবীর সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমি ছুটি নিতাম। বাঙালী মেয়েদের উপর ওর গাঢ় প্রলোভন। টেগোরের দেশের মেয়ে। এত বড় কালচার কোন্ প্রদেশে কোন্ দেশে আছে? বেবীকে ওর ভাল লাগত। তুমি বেবীকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। সে আসুক। আমি ছুটি চাই।

আনন্দর কাঁধে মাথা রেখে বললে। আমি তোমাকে চাই। ঘর চাই। Home --nest---sweet nest—cosy কবি, ছোট একখানি নীড়।

আনন্দ তার নরম খসখসে সুরভিত চুলগুলির উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আমি তোমাকে চাই ডলি। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

—তোমার বাসায়।

—আমার বাসায়।

—কেন ? এই পোশাকে আমাকে দেখলে—সেখানে দেখলে সেখানকার লোক হকচকিয়ে উঠবে ? হেসে উঠল ডলি।

—উঠলে খুশিই হতাম। ওটার মানেই হলো সৌভাগ্যে ঈর্ষা। কিন্তু আমার বাসা তো নেই।

—Then to some decent hotel--কিন্তু Grand—না ? Great Eastern না। ও লোকটা বিরক্ত করবে। কোন খুব কোয়ায়েট হোটেল। হৈ-হল্লা নেই যেখানে। শুধু তুমি আর আমি।

মিষ্টি ছোট একটি নীড়। শুধু তুমি আর আমি। বুঝেছ !—বলেছিল ডলি। ভারী মিষ্টি করে বলেছিল। হ্যাঁ, কথা এরা বলতে জানে।

একটি ছোট অথচ সম্ভ্রান্ত হোটেলে গিয়েই ওরা উঠেছিল। সম্ভ্রান্ত পল্লী, বড় রাস্তা। ছোট দোকানের হাট নয়, বড় বড় দোকান। একটা দোকানে লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্য, পণ্যের প্রতিটি বস্তু বহুমূল্য। দামী ফার্নিচার—মোটরকার—জুয়েলারী—বড় বড় টেলারিং শপ—সামনের দোকানের দিকটায় সমস্তটা কাঁচের দেওয়াল। কতকগুলি অভিজাত শ্রেণীর বার-কাফে-রেস্তরাঁও আছে ! কিছু অপিসও আছে। এখানে পথচারীর ভিড় নেই। ট্রাম বাস এ পথে চলে না। চলে মোটরগাড়ি। প্রাইভেট মোটরের সারি লেগে থাকে দিনের বেলা। রাত্রে প্রায় খাঁ-খাঁ করে।

কিছুটা কাল, মাস কয়েক সত্যই যেন স্বপ্নলোকের মধ্যে কেটেছিল সে সময়। কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ চূড়ে। তে-তলায় ওদের ঘরখানা ছিল। ডলির হাতে টাকা ছিল—হাজার কয়েক টাকা ? ব্যাঙ্কে না রেখে নিজের কাছেই রাখত সে। বলেছিল—টাকার জন্যে ভাবনা করো না। টাকা আমার কাছে আছে। সঙ্কোচ করো না তার জন্যে, আমি নিজেকে সমর্পণ করছি তোমার কাছে। সুতরাং আমার সব তোমার। আমি তোমার। তুমি শুধু বলো, তুমি আমার একথা অস্বীকার করবে না ?

—অগ্নিসাক্ষী করে কথাটা স্বীকার করতে পেলে আমি সবচেয়ে খুশি হব ডলি।

প্রথম দিন হোটেলে উঠেই কথা হয়েছিল তাদের।

ডলি বলেছিল—ডলি না। আমি হোটেলের খাতায় বেবীর নাম লিখে এসেছি।

'বেবী' বলে ডাকবে আমাকে ?

—কেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আনন্দ।

—কবি আনন্দ রায়ের গৃহিনীর জীবনের শ্লেটখানায় দাগ পড়েছে—এ কানাকানি আমার সহ্য হবে না। আমি নতুন জীবন শুরু করলাম। চল, আজ কালীঘাটে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে আসব।

আনন্দ রায় আকস্মিক সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ডলি তার ব্যাগ খুলে কাপড় বের করে, বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। স্নান সেরে সাদা পাড়হীন সিল্কের ব্লাউজ এবং শাড়ি পরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে, নাঃ, এ আমাকে ভাল দেখাচ্ছে না।

আনন্দ রায় কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুধের মতো সাদা নরম সিল্কের শাড়িখানি—কচি পাতার মতো সাদা শ্যামল রঙের ডলিকে এই শান্ত শ্রী দিয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে। মানাচ্ছে না শুধু বব করা খাটো চুল। ডলি আগের থেকে লম্বা হয়েছে, মাথায় খানিকটা বেড়েছে, এদিকে একটু শীর্ণ হয়েছে। তার সর্বাঙ্গে এই মুহূর্তে একটি ছাড়া অতীতের সব চিহ্নই ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। একটি, একটি নয়—দুটো চোখের কোণে কালো দাগদুটি মোছেনি। ও দাগও মুছে যাবে। নিশ্চয় যাবে।

আনন্দ উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হেয়ারলোশান-সুরভিত চুলের গন্ধ নিয়ে বললে, চমৎকার লাগছে তোমাকে। ডলি—

ইশ—বলে একটা শব্দ করে তর্জনী তুলে স্মরণ করিয়ে দিলে—বেবী।

হাসলে একটু আনন্দ। তারপর তার কপালে টোকা মেরে বললে—তাই হলো। কিন্তু তোমাকে আমি এই এমনি পোশাকেই দেখতে চাই। এই আমার বেশি ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে।

—উ—হু। আমি লালপেড়ে টকটকে, লাল শাড়ি পরতে চাই। কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। চল একবার বাঙালীপাড়ার দোকানে। লালপেড়ে গরদ কিনব খানকয়েক।

শুধু তাই নয়, ডলি আর চুল কাটলে না। কয়েক মাসে তার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠে গড়িয়ে পড়ল। ডলি আর-এক মানুষ হয়ে উঠল। আনন্দও আবার নতুন করে জাগল। নতুন করে সে আবার গান রচনায় মন দিলে।

তখন দেশেও নতুন করে জেগে উঠেছে পুরনো সুর।

জনযুদ্ধের গানের বাদ্যযন্ত্রগুলো ফেটে চৌচির হয়েছে, ওদের নাটকগুলোর রঙ্গমঞ্চের পর্দাগুলো ফেঁসে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান রবীন্দ্রনাথের 'ভুবন মনমোহিনী' গানের সুর ও ভাবের সঙ্গে সুর ও ভাব মিলিয়ে নতুন স্রোত জেগেছে। 'জাগে নব ভারতের জনতা, একজাতি একপ্রাণ একতা'! সে ঐক্যবদ্ধ একপ্রাণ একজাতি ভারতের জনতা প্রাণের সুর খুঁজে

পেয়েছে। গান খুঁজে পেয়েছে, ভাব খুঁজে পেয়েছে এই কলকল্লোলের মধ্যে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রশস্তি-গান রচিত হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে।

আনন্দ নতুন রচনা আরম্ভ করলে 'ভারত-ভারতী।'

সে কল্পনা করলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। প্রভাসকূলে যদুবংশও শেষ। ভারতবর্ষের মর্মলোক ভারত সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিভৃত কুঞ্জবনে দেবীর বীণার তারে একটি কম্পন জেগে উঠল, দেবী বীণা তুলে নিলেন; দিলেন করপদ্মের পাগড়ির মতো আঙুলের স্পর্শ। অস্পষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠল, বেশ ঝঙ্কার হয়ে বাজল।

এ কি—সুর! এ কোন্ রাগিণী? আকাশ বাতাস সম্মোহিত হয়ে গেল, নদ-নদীতে স্রোতধারা শিহরণ জাগাল, পুষ্পে পুষ্পে, পল্লবে পল্লবে তৃণাঙ্কুরে—অপরূপ কম্পন জাগল, মানুষের বুকে বুকে জাগল এক আবেগ; প্রসন্ন প্রশান্ত চোখ জলে ভরে উঠল। হিংসা ক্রোধ ক্ষোভ ক্লান্ত হয়ে উঠল! বিশীর্ণ হলো; ক্ষীণ কণ্ঠ হলো।

ভারতবর্ষ জোড় হাত করে দাঁড়ালেন বাণীদেতার সম্মুখে। প্রশ্ন করলেন এ কোন্ গান; আমার জীবন মথিত হয়ে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্রে প্রভু-উচ্চারিত গীতা-পাঠে আমার বিস্মৃতি ঘটছে। আমি আত্মসম্বরণ করতে পারছি না। বল দেবী, এ কোন্ নতুন গান? কে গাইবে এ গান?

দেবী বললেন—আমি জানি না। তুমি যাও, জেনে এস, কুরুক্ষেত্রের গীতা-উদ্গাতার কাছ থেকে।

প্রভাসের কূলে তখন দ্বাপরের যুগনায়ক মহাশয়ানে শায়িত। বৃক্ষতলে শুয়ে আছেন—পদতল থেকে অজস্র ধারায় শোণিতধারা নিঃসৃত হয়ে ধরণীতল সিক্ত করছে। পাশে পড়ে রয়েছে ব্যাধগোষ্ঠীর চিহ্নাঙ্কিত একটি তীক্ষ্নফলা শায়ক। ব্রহ্মাস্ত্র নয়, অগ্নিবান নয়, পাশুপত নয়, সামান্য লৌহখণ্ডে নির্মিত জীববধের জন্য ব্যবহৃত পাখীর পালক বাঁধা ব্যাধের তীর।

শিউরে উঠলেন—ভারতবর্ষ।

—এ কি হলো, হে পরম দেবতা! তাঁর চোখ থেকে অনর্গল গড়িয়ে পড়তে লাগল—গলদশ্রুধারা। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

যদুকুল-তিলক যুগনায়কের ধ্যাননিমীলিত বিশাল নয়নপল্লব—উন্মিলিত হলো—অধরপ্রান্তে ফুটে উঠল বিশীর্ণ অথচ প্রশান্ত হাস্যরেখা।

বললেন—কুরুক্ষেত্রে পাপীকে ধ্বংস করে পুণ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু পাপ? পাপ তো মরেনি। সে বেঁচে আছে। সে পিপাসার্ত হয়েছে; তার তৃপ্তির জন্য দিতে হলো আমারই শোণিত।

ভারতবর্ষ শিউরে উঠলেন। বললেন—তুমি চলে যাচ্ছ! সে আবার জাগ্রত হবে, আমাকে আবার জর্জরিত করবে—তুমি আবার কবে আসবে?

—আসব। নাও, ধর।

দিলেন তারই রক্তাসিক্ত একটি বটবৃক্ষের ফল। যে গাছের তলায় তিনি শুয়েছিলেন সেই গাছের ফল।

বললেন—ছড়িয়ে দাও। এর অংকুর জন্মাক। এরই ছায়ায় সাধনায় বসব। যুদ্ধ করব পাপের সঙ্গে। তাকে বিগলিত করব। তাকে মুক্তি দেব। শুনতে পাচ্ছ না তোমার বাণীদেবতার বীণার তারে সেই সাধনমন্ত্রের ঝঙ্কার জেগেছে। 'মা হিংসী'! শোন—কান পেতে শোন।

সঙ্গীত বাজতে লাগল।

ভারত-দেবতার ভবিষ্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হলো দূর দূর—সুদূর—ভবিষ্যতে এক বৃক্ষতলে এক সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে ওই সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেশ বাজছে। এগিয়ে আসতে লাগল কাল—এগিয়ে এল; চলে গেল কত কাল।

এরই মধ্যে কখন কোন্ স্থানে খসে পড়ে গেছে সেই হাতের বীজটি। হারিয়ে গেছে। অকস্মাৎ এক পূর্ণিমা সন্ধ্যায় এক উদ্যানে সেই শিশুকণ্ঠধ্বনি প্রত্যক্ষে ধ্বনিত হলো। তার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে প্রণতা হলো ভারত। বাণীদেবতার বীণায় উঠল ঝঙ্কার।

ডলির জন্যেই আনন্দ রায় পুরনো বন্ধুদের সন্ধানে গেল।

ডলিকে হিরোয়িন করে আনন্দ রায় সৃষ্টি করবে নতুন নৃত্যনাট্য—'ভারত-ভারতী'। ধর্মতলা—টালিগঞ্জ—বালিগঞ্জ প্রভৃতি স্টুডিও সংক্রান্ত আড্ডায় ঘুরতে লাগল নতুন সৃষ্টির আশায়। সেখানে ডলিকে রানী করে—প্রধানা করে দাঁড় করাবে তার নব মহীয়ান গাথা—নব সুর-সৃষ্টির মাধ্যমে।

এক সন্ধ্যায় এক ফাইনান্সিয়ারের আহ্বানে পাকা কথা স্থির করতে ডলিকে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। কথা শেষ করে সন্ধ্যার পর শরীর ঠিক করতে গেল এক অভিজাত পানশালায়। দু-একজন চেনা মুখও দেখা গেল সেখানে।

হঠাৎ আনন্দ তার-পাশে বসা ডলির দিকে চোখ পড়তেই দেখল একটি মধ্য বয়সী সুসজ্জিত ব্যক্তিকে। সে ডলিকে হাত ধরে টেনে নিলে। দূরে একটা টেবিলে গিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলে, ডলিও যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দিকে গেল।

সেই টেবিলে তারা অনেকক্ষণ কি সব কথাবার্তা বলল, তারপর সেই মধ্যবয়সী লোকটি এসে আনন্দকে শেকহ্যান্ড করে চলে গেল। আনন্দ কিছুই বুঝতে পারলে না।

হোটেলে ফিরে এল তারা। ডলি স্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল সারা পথটা।

আনন্দ প্রশ্ন করলে, ও কে ডলি?

—বললাম তো বম্বেতে আলাপ হয়েছিল। গোপন করব না ঘনিষ্ঠ আলাপ। সরকারী বড় চাকরি করত। এক সময় কল্পনা ছিল, দুজনে ঘর বাঁধব। তারপর হঠাৎ একটা কারণে ওকে আত্মগোপন করতে হলো। এতদিন পর দেখছি আত্মপ্রকাশ করেছে। মুসলীম লীগের একজন নেতার সহকারী। কলকাতায় এসেছে, পরশু ওদের ডাইরেক্ট অ্যাকশন-ডে।

সে খবর আনন্দ জানে। পাকিস্তানের দাবিতে কায়েদে আজমের নির্দেশে বাংলাদেশে ডাইরেক্ট অ্যাকশন-ডে নির্দিষ্ট হয়েছে ১৬ই আগস্ট। কিন্তু সঙ্গের ওই ভদ্রলোক! এত চেনা মুখ, অথচ ঠিক চিনতে পারছে না! —ও কে?

ডলি বললে, ব্যারিস্টার ঘোষালকে চিনতে পারলে না?

—ব্যারিস্টার ঘোষাল! হ্যাঁ ব্যারিস্টার ঘোষালই তো! সেকালে ডলি বেবীদের প্রতিষ্ঠানে তিনি একজন মস্ত উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের সম্পর্ক কি?

আছে কিছু। এককালে বন্ধুত্ব ছিল। বিলেতে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেইখানেই একসঙ্গে দুজনে এক রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কলকাতা এসে উনি ঘোষালের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাছাড়া ঘোষাল পাকিস্তান-নীতি সমর্থন করেন! লীগের দাবী ষোলো আনা সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ঘোষাল।

ডলি বললে, ও কথা থাক। আমার ভাল লাগছে না কিছু।

—কি হলো তোমার? পিছনের কথা মনে করে এমন মন খারাপ করছ কেন?

—জানি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সব বলতে পারছি না তোমাকে।

হোটেলে ফিরে এসে একটা ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করলে। বললে, ডেকো না আমাকে। আমার কাজ আছে।

রাত্রে সে কখন শুয়েছিল আনন্দ জানে না। খোঁজ করেছিল দুবার। দুবারই উত্তর পেয়েছিল—Please—please—

—কি করছ তুমি?

—চিঠি লিখছি।

—কাকে?

একটু স্তব্ধ থেকে খানিকটা হেসে উঠেছিল সে। বলেছিল, যদি বলি তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। আশ্চর্য হচ্ছো?

—না। কিন্তু তার তো প্রয়োজন ছিল না। যা বলবার তুমি তো মুখে বললেই পারতে।

—ওই ভদ্রলোককে লিখছি। আমি যাচ্ছি, তুমি শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়েছিল আনন্দ। ডলির কণ্ঠস্বরে আকুতি ছিল, অনুনয় ছিল, সে তা লঙ্ঘন করতে পারেনি।

সকালবেলা ডলি বেরিয়ে গেল ছোট একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে। বললে, একটু ঘুরে আসি আমি। দেরি হলে ব্যস্ত হয়ো না।

ডলি চলে গেল। আর ফিরল না। ফেরেনি কোনদিন।

বিকেলবেলা আবিষ্কার করেছিল একখানা চিঠি। চিঠিখানা ছিল আনন্দর ব্যাগের মধ্যে। যা আনন্দ খোঁজবার প্রয়োজনই অনুভব করেনি।

শুধু চিঠি নয়, সঙ্গে ছিল কিছু টাকা—এক হাজার টাকা।

সুদীর্ঘ চিঠি। লিখেছিল অনেক কথা।

ওই ভদ্রলোক যুদ্ধের সময় সরকারী উচ্চপদের সুযোগে অনেক টাকা আত্মসাৎ করে আত্মগোপন করেছিল। টাকাটার অধিকাংশ গচ্ছিত রেখেছিল ডলির কাছে। কথা ছিল সুযোগ পেলেই এসে সে ডলির সঙ্গে মিলিত হবে এবং চলে যাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে। যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। দেশান্তরে যেতে অসুবিধে হবে না। ডলি কলকাতায় এসেছিল। ইচ্ছে ছিল তার মায়ের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করে সময়টা কাটিয়ে দেবে। হঠাৎ দেখা হলো আনন্দর সঙ্গে।

'—তোমার মঙ্গল হবে। তুমি আমায় পক্ষপুট দিয়ে ঢেকে রেখেছিলে। এই কারণেই ডলি নামটা বদলে বেবী করেছিলাম। ডলি নামটা বম্বেতে প্রায় বিখ্যাতই বলো আর কুখ্যাতই বলো—খ্যাত হয়ে গিয়েছিল। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথাও গোপন ছিল না।

—শুধু তাই নয় কবি, তোমাকে আমার পাবার কামনা ছিল, তোমাকে আমি পেয়েছি। সে কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে। ভগবান— ভগবান মানি না, ভাগ্যও না! তবু তোমাকে পাওয়ার জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে না পেয়ে তাদেরই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—আমি পালাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে নয়। ওর কাছ থেকে। ওকে আমি ঘেন্না করি। I hate him —ওকে আমি ভয় করি। ওকে কথা দিয়েছি ১৭ই তারিখ সকালবেলা ওর সঙ্গে দেখা করব।

ও আমাকে বললে—তুমি প্রতীক্ষা করো হোটেলে। কলকাতা না-কি ডাইরেক্ট অ্যাকশনে রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। অন্য কোথাও গেলে পরিত্রাণ পাবে না। বিপদে পড়তেই হবে। ১৬ই তারিখ সকাল থেকে হোটেলের দরজায় ও পাহারা রাখবে, যাতে ওই হোটেলের উপর কোন আক্রমণ না হয়। আজ ১৫ই, আমি আজই পালালাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে তুমিও চলে যেয়ো।

কখনও থেকো না। আক্রোশে তোমাকে খুন করবে। কিছু টাকা রেখে গেলাম।'

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। আনন্দ হোটেল থেকে পালায়নি। ডলির সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও পালায়নি। তবে হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরছিল।

ডলি—ছলনাময়ী ডলি—তাকে কয়েক মাস ছলনা করে হঠাৎ যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

আঘাত পেয়েছিল আনন্দ। ডলিকে তার ভাল লেগেছিল। ডলির যেন কেমন একটা মোহ আছে। ওর ওই শ্যামলা রং, বড় বড় চোখ ওকে যেন মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর ওই কালো কোঁকড়া চুলের রাশি। চুল কেটে ফেলেছিল ডলি বম্বেতে, এখানে এসে আবার রেখেছিল। প্রথম বয়সে ডলি একটু মোটা ছিল। বম্বে থেকে সে ফিরেছে মেদ বিবর্জিত হয়ে, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী মনে হয় তাকে!

ডলির প্রকৃতি এই, তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এই। —সে কথা আনন্দ জানে। তবু জেনে-শুনেও আনন্দ ভুলেছিল ডলির অভিনয়ে। তবু সেদিন—সেই চলে যাওয়ার পরেও ডলিকে আনন্দর ভাল লেগেছিল। সকাল বেলাতেই সে একটি পুরো বোতল হুইস্কি নিয়ে বসেছিল।

হোটেলের ম্যানেজার তাকে বলেছিল আপনি কোন্ ট্রেনে যাবেন?

কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি আনন্দ।

ম্যানেজার বলেছিল—মিসেস রায় ভোরবেলা যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ওঁকে একটু মনে করে দেবেন। ওঁর যা ভোলা মন! আমি আগের ট্রেনে যাচ্ছি, পরের যে-কোন ট্রেনে উনি যাবেন। উনি না পেঁছিলে আমি খুব অসুবিধেতে পড়ব! সামান্য কাপড়-চোপড় ছাড়া সবই রইল পড়ে। টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। বলেছেন আপনাকে সাহায্য করতে। যখন বলবেন বয়দের পাঠিয়ে দেব। তারা বেঁধে-ছেঁদে দেবে, ট্যাক্সি ডেকে দেবে। আর বয়-টয়দের কিছু যেন দেবেন না। তিনি যথেষ্ট দিয়ে গেছেন।

আনন্দর ব্যাপারটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি। ডলি তার হোটেল থেকে চলে যাবার সকল ব্যবস্থাই করে গেছে। ম্যানেজারকে তাগিদ দেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত।

ওগো সহৃদয়া ছলনাময়ী, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইজন্যেই তোমার উপর রাগ হচ্ছে না আনন্দর। রাগ করতে পারছে না। তোমার প্রতারণার মধ্যেও ভালবাসার স্বাদ পাচ্ছে সে। তুমি কি কেঁদেছিলে ভোরবেলা আনন্দর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় কেঁদেছিলে। দু-ফোঁটা চোখের জল নিশ্চয় ফেলেছিলে।

হুইস্কির নেশা বেশ একটু ধরেছে আনন্দর। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। সে ম্যানেজারকে বলেছিল। যাব। তবে আজ না।

—তিনি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়বেন।

—পড়ুক। একটু অসুবিধে ভোগ করুক। যাব কাল কি কোন দিন যাব।

ম্যানেজার চলে গিয়েছিল।

আনন্দ একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে—তার মধ্যে হুইস্কির বোতল গেলাস পুরে বেরিয়ে পড়েছিল। চারিদিকটা তখন থমথম করছে। দোকান-পাট বন্ধ। লীগের পতাকা উড়িয়ে লরীতে লরীতে লীগ ভলাণ্টিয়ার্স চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। উত্তর দিকে কয়েকটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটে গেছে। কোথায় যেন একটা খাবারের দোকানে গোলমাল হয়েছে। কোন একটা সিনেমা হাউসের কাচ ভেঙে দিয়েছে।

আনন্দ চিড়িয়াখানায় গিয়ে বসে রইল। একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। হঠাৎ একসময় সে চমকে উঠল। গাছটা বটগাছ নয় তো।

বটগাছতলায় বসবার তার অধিকার নেই। সে অধিকার হয়তো এ জীবনে ফিরবে না তার। এই পথেই তার কর্ম-নির্দিষ্ট পথ, যে পথের ধারে ভারতের বৃক্ষ বটবৃক্ষ নেই।

ডলিই তাকে নিয়ে চলুক ইশারা দিয়ে।

বিকেল বেলা সে ফিরল। ডলি তাকে হাজার টাকা দিয়ে গেছে। দীর্ঘজীবী হও ডলি। হও তুমি আধুনিকা, ভালবাসতে জান তুমি।

ট্যাক্সিতেই ফিরছিল সে।

গঙ্গার ধার হয়ে আউটরাম ঘাটের কাছে এসে ট্যাক্সিটা মোড় ফিরল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সারা এসপ্লানেডটা আকাশ ফাটানো চিৎকার যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

লড়াই শুরু হয়ে গেছে।—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

ট্যাক্সির শিখ ড্রাইভার পূর্বমুখে গাড়ির মোড় ঘুরিয়েছিল; ক্ষিপ্র-হাতে সে গাড়িটাকে মোচড় দিয়ে মোড় ফিরিয়ে নিলে। ওদিক থেকে লরীর উপর লীগের লোকেরা ডাণ্ডা ঘুরিয়ে চিৎকার করতে করতে আসছে। একজনের হাতে একটা উলঙ্গ ছোরা।

উর্ধ্বশ্বাসে লরীটা ছুটল। ছুটল উত্তর মুখে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে।

—ইধর কাঁহা যাতা পাইজী?

পাইজী কি বললে শুনতে পেলে না আনন্দ।

গাড়ি এসে বড়বাজার পার হলো।—উতর যাইয়ে বাবু।

আনন্দ তখন অশক্ত, সারাদিনের মদ্যপানের নেশায় একটা আচ্ছন্নতা তাকে

আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে বললে, ইধর কাঁহা আয়া মেরা হোটেল তো হ্যায় পার্ক স্ট্রীটমে।

পার্ক স্ট্রীট কোথায় যাবে বাবু? দেখছ না, মুসলমানেরা দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। তুমি কি কিছু খোঁজ রাখ না বাবু? জান না, আজ ওরা জেহাদের ফতোয়া দিয়েছে।

ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে। বটে। ডলিকে বলেছিল সেই মুসলমান বন্ধু।

রাস্তায় তখন উত্তেজিত জনতা জমছে দু-ধারে। হাওড়া পুলের মুখ বন্ধ করে হিন্দুরা সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোড ধরে ফিরবে ময়দান-ফেরত হাওড়া ঘুষুড়ীর মুসলমানেরা। তারা নাকি হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে লুঠতরাজ করতে করতে আসবে। ধর্মতলায় লুঠ হচ্ছে। বন্দুকের দোকান ভেঙে বন্দুক লুঠ করেছে।

খবর আসছে ঝলকে ঝলকে—পলকে পলকে।

—কিন্তু আমি যাব কোথায়?

—যাবে কোথায় তা তো আমি বলতে পারব না। তবে আমি পার্ক স্ট্রীটে যাব না। জান দেনে নেহি যায়েগা। বাবুজী লড়াই করে মরতে পারি। বে-কায়দায় খুন হতে পারব না। নাম তুমি ট্যাক্সি থেকে।

আনন্দ পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে দিলে। পাইজী বললে—রুপিয়ার জন্যে বলিনি বাবুজী। তোমাকে তো আমি ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারিনি। টাকা তুমি রাখ।

আনন্দ ট্যাক্সি থেকে নামল—কিন্তু দাঁড়াবার ঠিক শক্তি ছিল না তার। পাইজী বললে—চড়ে পড় বাবুজী। এখানে থাকলে বেঘোরে মারা যাবে তুমি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে চল আমার আস্তানায়। শ্যামবাজারের ওদিকে আমার আস্তানা। যাবে?

—চল।

শ্যামবাজারে এসে দীর্ঘকাল পরে মনে পড়ল—সুমিত্রার কথা।

যাবে না কি সুমিত্রার ওখানে? অথবা সেই বন্ধু-পত্নী যে স্বামী বিয়োগের মাস তিনেক না-যেতেই দেওরকে বিয়ে করেছে তার ওখানে? নামও তার মনে থাকে না। তা যখন থাকে না, তখন আর ওখানে সে যাবে না, যাওয়া উচিতও নয়।

ড্রাইভারটি তাকে বললে, কোথাও তুমি আজ যেয়ো না বাবুজী। এখানেই থাক। কোনও ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে এনেছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কোন অনিষ্ট হবে না তোমার। নাও, তুমি এইটের উপর শুয়ে পড়।

বিরাট একটা টিনের চালা। চালার মধ্যে থাকে মোটর বাস। বাস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শিখেরা জটলা করছে। পাইজী একখানা বাসের একটা

লম্বা গদী টেনে বের করে তাকে দিয়ে দিলে। বললে—নিশ্চন্তে ঘুমোও। আমি বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। কিছু খাবে?

আনন্দ তখন শুয়ে পড়েছে। মনে মনে বলছে, ডলি! **Life is but an empty dream**—ডলিরা এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে জানে। সবচেয়ে ভাল কথা তুমি মুক্তি দিতে জান।

তিনদিন একইভ্যবে সেই টিনের চালার মধ্যে বাসের গদির ওপর শুয়ে কেটে গেল আনন্দর। তারপর চতুর্থ দিন সকালে পাঁইজীর ডাকে সে উঠে বসল। তারপর সে মুখ-হাত-পা ধুয়ে বসল চায়ের ভাঁড় নিয়ে। কিছুক্ষণ পর 'যুগান্তর' কাগজ পেল। কাগজে দাঙ্গার ভয়াবহতা পড়ে ফেলল।

বাংলার ভূতপূর্ব চীফ সেক্রেটারি স্যারহেনরি টোয়াইনাম তখন মধ্যপ্রদেশের গভর্নর। তাঁর বিবৃতিতে জানতে পারা গেল প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু ও কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এই দাঙ্গায় হয়েছে।

তখন আনন্দর হঠাৎ মনে পড়ল, সুমিত্রা সে সময় ইলিয়ট রোডে বাসা নিয়েছিল। কলকাতার পূর্বাঞ্চল ইলিয়ট রোড দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত। সুমিত্রা কি বেঁচে আছে? পাশের লোকদের কাছে জানতে পারলে **Red Cross** গাড়ি বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার করছে।

পাড়ার লোকদের চেষ্টায় আনন্দ একটা **Red Cross**-এর গাড়ি নিয়ে সুমিত্রাকে উন্ধারের চেষ্টায় গেল। সৌভাগ্যক্রমে বাসাবন্দী সুমিত্রাকে উন্ধার করে তার বান্ধবীর বাসায় আশ্রয়ের জন্য উত্তর দিকে ফিরে এল। লাস্যময়ী সুমিত্রাকে আর চেনা যায় না! আলু-থালু ছিন্ন বেশ। মৃতপ্রায় অবস্থা। তার ওপর অত্যাচারের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ক-দিনেই সে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে সাদা চুলের গুচ্ছ বেরিয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি শুধু ক্লান্তই নয়, আতঙ্কিত। গলার স্বর বসে গেছে।

ক্লান্তস্বরে সে বললে—আনন্দ! এ কি হলো?

—কি হলো?

—সব মিথ্যে হয়ে গেল—এত সাধনা—এত তপস্যা?

—কিসের সাধনা—কিসের তপস্যা?

—**Humanity**-র—মনুষ্যত্বের? **Culture**-এর? আমরা **brutes**—ইউরোপের লোকেরা মিথ্যে বলে না। আমরা **brutes**। বলব কি আনন্দ। এ-কদিন ভেবেছি—শুধু ভেবেছি, ভয়ে ঘুমুতে পারিনি, শুধু ভেবেছি। ভেবে দেখেছি—হিন্দুরাই বেশি **brutes**, এ বর্বরতার আদি-অন্ত নেই।

—কেন বলো তো? এটা তো হিন্দুরা আগে শুরু করেনি?

—তা করেনি। কিন্তু—। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—এই কি তোমাদের নন-ভায়লেন্স?

হেসে আনন্দ বললে—নন-ভায়লেন্সে তুমি বিশ্বাস কর না সুমিত্রা, তাকে তো তুমি উপহাস কর।

—করি, এই জন্যে। হাসতে চেষ্টা করল সে। প্রথমটা পারলে না। তারপর অকস্মাৎ হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো চিৎকার করে উঠল—মিথ্যে-মিথ্যে। পলিটিক্যাল স্টাণ্ট অথবা রিলিজিয়াস—যা খুশি বলতে পার!

পাশের চায়ের দোকান থেকে নেমে এল একটি ছেলে। ওদের খেয়াল ছিল না, চায়ের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তারা। ছেলেটি নেমে এসে দাঁড়াল। বললে, ভয় থেকে প্রথম যখন মুক্তি পায় মানুষ, তখন সে প্রথমটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারপর সেই হয় অভয়দাতা। অহিংসায় যেতে হলে হিংসাকে অতিক্রম করতে হয়। হিংসার কোঠায় পা দিয়েছি। যাব অহিংসায়। শুধু আপনাদের মতো মেকী মানুষগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। আরও একটা এমনি হিংসা হয়তো আসবে যাতে আপনাদের মতো মেকী মানুষ—অবিশ্বাসীর দল মুছে যাবে। চিৎকার করে উঠল সে হিন্দুরা বেশি brutes! কি করে বললেন আপনি? তাই যদি হয় তবে আপনি হিন্দুর পাড়ায় ছুটে এলেন কেন প্রাণভয়ে! কেন? কেন গেলেন না আপনি অহিন্দু পাড়ায়? অহিন্দু মুসলমানদের হয়তো ঘৃণা করেন আপনি। আপনি ইউরোপীয়ান পাড়ায় কেন গেলেন না? কেন? আজকের দিনে ভারতবর্ষের সাধনার সবচেয়ে বড় শত্রু আপনারা। মেকী ফিরিঙ্গী।

লোক জমে গিয়েছিল চারিদিকে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের মানুষ। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুমিত্রা। থর থর করে কাঁপছিল। সে আনন্দর হাত-দুটো চেপে ধরলে। আর্তকাতর কণ্ঠে বললে—আনন্দ!

ওই শব্দটা যাদুমন্ত্রের কাজ করলে।

একজন এগিয়ে এল—আপনি আনন্দ রায়? কবি, গায়ক!

সেই ছেলেটিই এগিয়ে এল বললে, আপনি আনন্দ রায়?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। একেবারে যেন খুঁটিয়ে দেখে যাচিয়ে নিচ্ছে।

যে লোকটি প্রথম আনন্দকে চিনেছিল সে বললে, আমি ওঁকে চিনি, অনেকবার দেখেছি।

ছেলেটি বললে, আমিও ওঁকে দেখেছি ছেলেবেলা, কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, কিন্তু এমন চেহারা হয়ে গেছে আপনার?

আনন্দ একটু হাসল ম্লান হাসি।

ছেলেটি বললে, কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে কিছু বলিনি। বলছি ওঁকে। ওই আলট্রা-মডার্ন মহিলাটিকে। যিনি হিন্দুদের বলছেন—ব্রুটস।

আনন্দ বললে, না, না। আপনি একটু ভুল বিচার করছেন। ওঁর

এখনকার মনের অবস্থা—

—না। ছেলেটি তাকে বাধা দিলে। বললে, একচুল ভুল বিচার করিনি। আমি ও'দের জানি। খুব ভাল চিনি। এখন বলছেন ও'র মনের অবস্থা খারাপ, হয়তো শক পেয়েছেন, কিন্তু যখন সুস্থ ছিল মন, সহজ ছিল দিনকাল, তখনও উ'নি বলতেন। আমরা ব্রুটস। একজন ইংরেজ বা কোন ইউরোপীয়ানের সঙ্গে ও'কে আমি বহুদিন ঘুরতে দেখেছি।

হেসে বললে সে, আমি একটু আধটু ছবি আঁকি। তাই ওদিকে ঝোঁক আছে। একজিবিশনে যাই, বড় বড় আর্টিস্টদের বাড়িও যাই। প্রায় জায়গাতেই ও'কে আমি দেখেছি। এবং এই কথাই বলতে শুনেছি ও'কে একাধিকবার।

সুমিত্রা পাংশুমুখে দাঁড়িয়েছিল। চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে আসছিল। মাটির ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল। আত্মসম্বরণের সামর্থ্য পর্যন্ত নেই।

আনন্দ বললে, তবু বলব আপনারা অবিচার করছেন।

ছেলেটি হেসে বললে, মাফ করবেন তাহলে, আপনার প্রতি সম্মান রেখেও সত্যকথা কয়েকটা বলব আমি। আপনার এই বিদগ্ধ সমাজ-প্রীতির কথাও আমার অজানা নয়। সেও জানি আমি। সেই কারণেই বলছি, আপনারা যখন আত্মরক্ষার জন্য এই ব্রুটসদের আশ্রয়ে এসেছেন তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন বা না করুন, দয়া করে গালাগাল দেবেন না। আর দিতেই যদি চান তবে চলে যান, ওই ইংরেজ পাড়ায় অথবা যদি এমন কোন আপনাদের পাড়া থাকে, যেখানে হিন্দু-মুসলমান-কৃশ্চান ইণ্ডিয়ান-ইউরোপীয়ান—পরস্পরের গালে মধু লেপন করে সস্নেহে লেহন করেছ। আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই। বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দেবার মতোও বুকে বল নেই। ভীরু বিলাসপ্রিয় ভোগবাদী আপনারা। জানেন ঘর সাজাতে। জানেন রং মাখতে, জানেন মিহিসুরে হাসতে, জানেন ইংরেজী ভাষা, ইউরোপের উচ্ছিষ্ট-ভোজী আপনারা—আপনারা আমাদের যতখানি ঘৃণা করেন—তার অনেক গুণ বেশি ঘৃণা করি আপনাদের। কিন্তু এই ঘৃণা কাউকে করতে নেই, এই আমাদের শিক্ষা। তাই সেই ঘৃণাকে দমন করতে চেষ্টা করি আমরা। আজ নিরুপায় হয়ে আশ্রয়ের জন্য আমাদের পাড়ায় এসেছেন, ফিরিয়ে দিতে চাইনে, তাড়িয়ে দিতে চাইনে। শুধু আজকের এই উত্তেজিত মুহূর্তে চারিদিকে যখন আগুন লেগেছে, জীবনে যখন হানাহানি এসেছে তখন খোঁটা দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করে আমাদের সংযমের বাঁধ ভেঙে দেবেন না। যান।

বলে সে হাতখানি প্রসারিত করে দেখিয়ে দিল পথ।

অস্ফুটস্বরে সুমিত্রা এতক্ষণে বললে—চল আনন্দ।

—কোথায় যাবেন আপনারা?

নাম বললে আনন্দ। নামটা শুনে চাপা হাসি খেলে গেল সকলের মুখে

—জনদুই কুৎসিত হাসি হেসে উঠল। একজন বলে উঠল—বিভীষণ মন্দোদরীর বাড়ি!

ধমক দিলে ছেলেটি। চুপ কর সব। ছি! যান আপনারা।

ধমক সত্ত্বেও একজন বললে, বেড়ে জায়গায় যাচ্ছেন দাদা। যান, যান। জমবে ভাল।

এবার ছেলেটি তার হাত চেপে ধরলে, ধীরে।

আনন্দ সুমিত্রাকে নিয়ে অগ্রসর হলো।

বান্ধবীর বাড়িতে পেঁছে সুমিত্রা প্রায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে লাগল।

আনন্দ বললে, কি করবে কেঁদে! উপায় কি? এ সহ্য করতেই হবে।

সুমিত্রা এতক্ষণে ক্ষিপ্তের মতো ক্ষোভ প্রকাশে উদ্যত হলো। সুমিত্রার বান্ধবী শিউরে উঠে চাপা গলায় বললে, চুপ কর সুমিত্রা। শুনতে পাবে।

—শুনতে পাবে? কে?

—পাড়ার লোকে। শুনতে পেলে সর্বনাশ হবে। এরই মধ্যে ওঁকে শাসিয়ে গেছে। বলে গেছে—বিশ্বপ্রেম চলবে না। ক্ষেপে গেছে লোকেরা। আমাদের বাড়ির ওপর বেশি নজর!

আনন্দ হাসলে।

—তুমি হাসছ আনন্দ।

—কি করব বলো?

—কাঁদো, বুঝলে কাঁদো।

—কেন? 'কি হারাইতেছি বুঝিতেছি না!' অথচ সেটি বিশেষ মার্কা সিগারেট। হা-হা করে হেসে উঠল আনন্দ। তারপর বললে, আমার তাতে আসে-যায় না কিছু। সুমিত্রা, আমি থেলো হুঁকোয় তামাক খেতে পারব। তাতে আমি অসভ্য অসংস্কৃত একথা মনে করব না। সিগারেটের আপিং-রস অভিষিক্ত গন্ধের সঙ্গে বালাখানার তামাকের গন্ধের কোন অসহনীয় পার্থক্য আমার কাছে নেই। তবে তোমাকেও কাঁদতে বারণ করব। দাঙ্গাও থামবে। সহজ দিনও আসবে, ইংরেজ পাততাড়ি গুটুচ্ছে, তখন তোমাদের দিন আসবে ডবল জোরে। একদিকে ওরা নাচবে, একদিকে তোমরা। দুভাগ হয়ে যাবে। ওই ছোকরার দল তাদের সঙ্গে হয়তো আমিও আবার চাপা পড়ব। তোমাদের দু-তরফের রণনৃত্য শেষ হলে তারপর ওরা উঠবে। তার দেরি আছে কিছু। ভয় আছে গান্ধীকে। এবং বৃদ্ধ সংলাপ করেছেন একশো পঁচিশ বছর বাঁচবেন। ওটা একটা শঙ্কার কথা। কিন্তু কি জান, মানুষের সংলাপ অটল সাধনা ব্যর্থ করতে আর একটা শক্তি আছে। তার নাম কাল। মানুষ কত ষড়যন্ত্র কত কল্পনা করে ফাঁদের-পর-ফাঁদ পেতে, ছকের-পর-ছক কেটে কালের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ওই ছকের ক্যানেলে নদীর জলের মতো নিয়ে গিয়ে—অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু নদীর বাঁধ ভাঙার মতো কোন্‌খানে যে ভাঙে কালের

বাঁধ, সে বলা বড় শক্ত। গান্ধীজির পর বিলেতের পণ্ডিতের পালা। পণ্ডিতকে যে দোষ দেবে দাও, তোমাদের ইংরেজি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিরোধী একথা বলতে পারবে না। চাণক্যের আমলে বামুনদের খাতির বেড়েছিল। আওরংজেবের আমলে গানের নাকি কবর হয়েছিল, এ আমলে তোমাদের খাতির যায় কোথা? নিশ্চিন্ত থাক আমি উঠলাম।

—আসলে তুমি সেই রি-এ্যাকশনারিই থেকে গেছ। ছি! ছি! ছি তোমাকে!

—তা বলতে পার। কারণ এর উত্তরে আমি বলব, আজ হঠাৎ যেন আমার আর একটা চোখ খুলে গেছে। ভবিষ্যৎটা আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের মতে তো তৃতীয় নেত্রের কথা ভণ্ডামি। রামকৃষ্ণদেবই তো তোমার এবং তোমার দলের মতে ভণ্ড।

বলেই আনন্দ বেরিয়ে চলে গেল।

আশ্রয় নিয়েছিল একটা আধা মেস আধা হোটেল জাতীয় জায়গায়। আর একদিনও যায়নি সুমিত্রার সন্ধানে। আলাপ করেছিল ওই ছেলেটির সঙ্গে।

দুরন্ত আক্রোশ তার এই ধরনের বিদগ্ধ শ্রেণীর ওপর! নিজেও সে ইংরেজি-জানা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। নিজেও কম লেখাপড়া শেখেনি। বি-এ পাশ করেছে। এককালে সাহিত্যচর্চা করেছে, ছবি আঁকে। সেকালে ওই প্রগতিশীল দলের সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা করত। সেই সময়ই আনন্দকে সে দেখেছিল। তখন আনন্দের শরীর এমন রুগ্ন শীর্ণ হয়নি। আনন্দর সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। ঠিক নিজে আলাপ করেনি, আলাপ করেছিল ওর ভগিনীপতি, ও পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। ওর ভগিনীপতি বাংলাদেশের এক বিখ্যাত প্রগতিশীল লেখক, বিলেত ফেরত বাংলাদেশের বিখ্যাত ঘরের ছেলে। কিন্তু—

ছেলেটির নাম সন্দীপ। সন্দীপ বললে—বলতে গিয়ে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। বললে—কিন্তু ওই প্রগতির মোহ আমার একেবারে মুছে গেছে। আমার মতো ঘৃণা ওদের কেউ করে না। আমার বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারত পড়েছি। আমার ঠাকুরদাদা বেঁচে আছেন—তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁকে এককালে আমার এই ভগিনীপতির সংশ্রবে এসে তাঁকেও আমি ঘৃণা করেছি। হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল! জানেন আমার ওই ভগিনীপতি —হঠাৎ আমার বোনকে ত্যাগ করলেন দশ বৎসর ঘর করার পর। কারণ জানেন—কারণ তিনি এক অতি বিদগ্ধ আধুনিকার প্রেমে পড়ে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি তাঁকেই আমার বোনের চেয়ে বেশি ভালবাসেন এবং তাঁকেই তিনি বিবাহ করলেন। তিনি আধুনিক—তিনি বিদগ্ধ, তিনি মনের সঙ্গে ছলনা করবেন কি করে? কি করে ভালবাসার অপমান করবেন? আমার সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে গেল।

সন্দীপ হাঁপাতে লাগল।

আনন্দ জানে। এই বিশাল প্রগতিশীল কবিটির দ্বিতীয় বিবাহের কথা কারুর অবিদিত নয়। আনন্দ চুপ করে রইল। একটু ভেবে নিয়ে বললে, কিন্তু আমাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে ভাই।

—আছে নয়, ছিল। আজ আর নেই। ক্বচিৎ কোথাও হয় না—এ কথা বলিনে, তবে বহুবিবাহ উঠে গেছে। সে বিশ্বাস পূর্বকালের। এককালের ভুল আর-এককালে সংশোধন হয়। কিন্তু কোনোকালেই প্রেমের দোহাই দিয়ে বিবাহকে শ্রেষ্ঠ সত্য বলে আমরা জাহির করিনি। আমার বোন বলে বলছি না—সত্যকারের গুণবতী মেয়ে। সে শিক্ষিতা। সে সুন্দরী। কেন ওই লেখক ভদ্রলোক দশ বছর পর তাকে ভাল লাগল না, জানেন? ভাল লাগল না সে লাস্য হাস্যময় রংকরা জীবনের পক্ষপাতী নয় বলে। সে হোটেল পছন্দ করে না বলে। তার একরাশি চুল, সে চুল কেটে বব করেনি বলে। সে উল্কার মতো দিনরাত্রি ঘুরে বেড়ায় না বলে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আমার বোনকে অবলম্বন দিলেন আমার ঠাকুরদাদা। তিনি তাকে পড়াতে শুরু করলেন সংস্কৃত। আমিও তার সঙ্গে পড়তে শুরু করলাম। ন্যায়কে, সত্যকে, নীতিকে, জীবনকে নতুন করে চিনলাম।

ওরা দুজনে কথা বলছিল দোতলার ঘরের দরজার সামনে একটুকরো বারান্দায় বসে। হঠাৎ কে তাকে ডাকলে, মিঃ রায়। হ্যা-লো!

কে? আনন্দ রাস্তার ওপর তাকিয়ে দেখলে, একখানা ট্যাক্সি ওদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। তার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে একজন ভদ্রলোক। —মিঃ জাভেরী।

মিঃ জাভেরী একজন গুজরাটী ভদ্রলোক, থাকতেন পার্ক স্ট্রীটের সেই হোটেলে।

—ইয়েস। কিন্তু তুমি বেঁচে আছ? নেমে দাঁড়ালেন তিনি।

আনন্দও নিচে নেমে এল। বললে হ্যাঁ। বেঁচে আছি।

—রায়টের প্রথম সন্ধ্যে থেকেই তোমার পাত্তা নেই। ওঃ, দ্বিতীয় দিন, ১৭ই সকালে হোটেলে সে কি হাঙ্গামা তোমার এবং মিসেস রায়ের খোঁজে। হোটেল তছনছ করে দিয়েছিল, একদল আর্মড মুসলীম এবং তাদের মাথায়, একজন হ্যাণ্ডসাম লীডার জাতের ভদ্রলোক। কতকগুলো মার্ডার হয়ে গেল। কোনো রকমে বেঁচেছি আমরা। অবশ্য সন্ধ্যের আগেই পালিয়েছিলাম তাই বেঁচেছি। তারপর দশদিন পরে ওখানে ফিরেছি। তুমি আর ফিরলে না। আমরা ভেবেছিলাম, তুমি বেঁচে নেই। ভাল করেছিলে, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেছেন, ওখানে তুমি যাওনি! কিন্তু কাল তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে আছে। মিসেস রায় করেছেন।

হোটেলে সে আর যায়নি।

টেলিগ্রামের খবরেও সে উৎসাহিত হয়নি। কি টেলিগ্রাম করবে বা করতে পারে ডলি? ফিরে আসছে? তাকে যেতে লিখেছে? সে অসুস্থ? এর কোনোটাই তাকে চঞ্চল করতে পারেনি। রাত্রির মায়া রাত্রিতেই কেটে গিয়েছে।

ওই সন্দীপ ছেলেটি যেন তার জীবনের বন্ধ ঘরের দরজা জানলায় হানা দিয়ে কৃত্রিম রাত্রির অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। নতুন করে শুরু করে দিয়েছে দিনের পালা।

দিনের আলোয় ডলিদের মুখের প্রসাধন প্রলেপ, ঠোঁটের রং বিশ্রী বীভৎস মনে হচ্ছে। শ্যাম্পু-করা খসখসে চুল, যা রাত্রির স্বপ্নাঞ্জন-ঘষা-মাখা দৃষ্টিতে রেশমগুচ্ছ বলে মনে হতো, সে চুলগুলোকে করকরে কর্কশ বলে মনে হচ্ছে। এরা রং-করা মাটির প্রতিমাকে পুজো করার মধ্যে ফাঁকি আবিষ্কার করছে, কিন্তু নিজেদের মুখে রং করে আপনাকে ফাঁকি দিতে লজ্জা অনুভব করে না। ডলির সংবাদে আর তার প্রয়োজন নেই।

মুক্ত দৃষ্টিতে দিনের আলোয় সে নতুন করে খতিয়ে দেখছিল মানুষকে। অদ্ভূত লাগছে। ঘুমন্ত মানুষেরা জেগে উঠেছে। বিচিত্র তাদের পরিচয়। সে দেখে, আর তার কানের কাছে বাজতে থাকে সন্দীপের সেই কথাগুলি। সুমিত্রাকে সেদিন বলেছিল যে কথাগুলি।

—আর একটা লড়াই হবে। সে এই আপনাদের সঙ্গে।

অর্থাৎ ইংরেজী সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের সঙ্গে। কথাটা মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে না। এরই মধ্যে তারা পৌঁছিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়েছে। সভ্যপাড়ায় বড় বড় বাড়ির বারান্দায়, ফ্ল্যাটে, বেতের চেয়ারে বা সোফা-সেটিতে বসে এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করছে আর সিগারেট টানছে। কংগ্রেস কম্যুনিস্ট হিন্দু-মহাসভা সবাই আছে এদের মধ্যে। অসহ্য হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের এই বিরূপাক্ষ রূপ। এ-দল ও-দলকে দোষ দিচ্ছে। ও-দল এ-দলকে দোষ দিচ্ছে। কেমন করে এই স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানকে নিজের আয়ত্তে এনে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগান যেতে পারে, তার ফন্দী আবিষ্কার করছে। কিন্তু এদের কেউই এই মানুষগুলোকে চেনে না, জানে না। তাই এই বিক্ষোভের সামনে দাঁড়াতে সাহস করছে না। ঘরে বসে উত্তপ্ত তর্ক এবং আলোচনার অজুহাতে আত্মরক্ষা করছে। এরা যেদিন সত্য করে জাগবে সেদিন এদের কি হবে? এবং এরা যে জাগবে, জাগবার মতো শক্তি যে এদের মধ্যে রয়েছে সে সত্যকে এদের এই মূর্তি দেখে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পর দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই সব ভাবনাই সে ভাবছিল। চার মাথার মোড়

সেটা। মোড়ের উপর একটা দোকান ছিল হামিদ শেখের—তুলো আর তামাকের কারবার। আর ছিল খান কয়েক ছ্যাকড়া গাড়ি। এক একটি গাড়িতে তিনটি করে লোক ; সেই হিসেবে জন পঁচিশেক লোক ছিল হামিদের। দাঙ্গার প্রথম দিনেই হামিদ এখানে ১৬ই আগস্টের একটা শোভাযাত্রা নিয়েই ওই রাস্তায় ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। ঢুকেও ছিল খানিকটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। তারপর হামিদ পালিয়েছিল। গাড়ির মধ্যে খানতিনেক গাড়ি পড়েছিল, সেগুলো পুড়ে গেছে। ঘোড়াগুলো কোথায় পালিয়েছে। হামিদের দোকান ভেঙেচুরে জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে লোকে। সেই হামিদ আজ ফিরে এসেছে সকালে। সঙ্গে পুলিশ রয়েছে। হামিদ একটা হৈ-চৈ করবার চেষ্টা করছে। সেই দৃশ্যটাই দেখছিল আনন্দ।

হঠাৎ একখানা গাড়ি এসে থামল—ট্যাক্সি একখানা।

আনন্দ অবশ্য লক্ষ্য করেনি প্রথমটা। কিন্তু ডাক শুনে সে তাকিয়ে দেখলে, সেদিনের সেই জাভেরী। এ কি? ওর সঙ্গে ও কে। একটি মেয়ে নামছে?

চমকে উঠল আনন্দ। এ কি? এ যে বেবী।

জাভেরী তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে—রয়,—**Look here,** দেখ কে এসেছে।

বেবী এসেছে। দিল্লী থেকে বেবী ফিরে এসেছে। বেবী ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। ডাকছে তাকে—নেমে এস।

আনন্দ তাদের উপরে ডাকতে ভরসা পেলে না। একখানা ঘরে তারা তিনজন থাকে। ডবল সিটেড রুম। আনন্দকে স্থান দেবার জন্য ঘরের লোকেরাই ত্যাগ-স্বীকার করে তিনজনের জায়গা করে নিয়েছে। এখানে বেবী এসে বসলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

আনন্দ জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল।

—তুমি এখানে বেবী?

—কি করব? টেলিগ্রাম করে জানিয়েই তো এসেছিলাম। কিন্তু পেঁৗছে দেখি তুমি নেই। হোটেল ম্যানেজার আমাকে দিদির বোন বলে স্বীকার করতে চায় না। তার বাক্স-টাক্সগুলো দিতে চায় না। আমি নিরুপায়। আমাকে identify করে কে? ম্যানেজার এক তুমি ছাড়া অন্য কারুর **identification** মানবে না। শেষে মিঃ জাভেরী বললেন আমাকে তোমায় ঠিকানা। বললেন দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে। তোমাকে টেলিগ্রামের কথাটিও বলেছেন বললেন। কিন্তু তবু তুমি আসনি। অগত্যা এলাম।

হাসলে আনন্দ।—তুমি দিল্লীর স্বর্গলোক থেকে এখানে নেমে আসবে ভাবতে পারিনি। তা চল। তোমাকে সেগুলো দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

—গুড বয় হয়েছ রায়।

—তুমি দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছ। আমাকে 'তুমি' বলতে আটকাচ্ছে না?

বেবী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। কানের কাছে মুখ এনে সে বললে, আমিই হলাম বেবী রায়। আনন্দ রায়ের স্ত্রী। হোটেলের পাতায় লেখা আছে।

চমকে উঠল আনন্দ।—কি?

হেসে বেবী বললে, Don't ; একটা সিন করে তুলো না। ওটা নেহাতই রহস্য। দিদি বলে গেল আমাকে। বলে গেল, বেবী তুই আমার কাপড়-চোপড়গুলো নিস, ওগুলো তোকে আমি দিয়ে গেলাম। অনেক টাকার জিনিস। অন্ততঃ পাঁচ-সাত হাজার টাকা দাম হবে। তারপর হেসে বললে, আরও একটা জিনিস তোকে দিয়ে যাচ্ছি। তার দাম অনেক। তোর বেনামীতেই কিনেছিলাম, তোকেই দিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে তুই নিস। সে মহার্ঘ বস্তুটি আনন্দ রায়। বেবী নাম নিয়েই তাকে বিয়ে করেছিলাম। এই নে সে সনদখানা। ম্যারেজ সার্টিফিকেট। তোর নাম যে বেবী সে তো তোকে প্রমাণ করতে হবে না। সে চলে গেল। আমি এখানে এলাম। যে হোটেলে নেমেছি সেখানে বেবী রায় নামই লিখিয়েছি। কিন্তু ভয় করো না রায়, উপাধি নিয়ে নাম লেখালেও তোমার ঘাড়ে চাপবার ইচ্ছে আমার নেই। দিদি যাকে খুব বেশি দামী মনে করেছে, তার দাম আমার কাছে অত্যন্ত কম।

আনন্দ এ কথার উত্তর দিলে না। শুধু বললে, চল। বাক্সটাক্সগুলো উদ্ধার করে দিয়ে আসি তোমার।

জাভেরী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। হামিদের গোলমাল দেখছিল। বেবী তাকে ডাকলে,—মিঃ জাভেরী!

জাভেরী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

—চল।

১৯৬৬ সালে বেবী সেদিন বলেছিল, "যে হোটেলে উঠেছি সেখানে বেবী রায় নামই লিখিয়েছি! দিদির দেওয়া ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানাও আমার কাছেই আছে। কিন্তু ভয় করো না, তোমার রায় উপাধি নিয়ে নাম লেখালেও তোমার ঘাড়ে চাপবার ইচ্ছে আমার নেই। এবং দিদি এটাকে খুব দামী জিনিস বলে দিয়ে গেলেও এর দাম আমার কাছে অত্যন্ত কম।"

খিল খিল করে হেসেছিল সেদিন শ্রীমতী বেবী। তুচ্ছ বস্তুর মতো তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছিল। হয়তো বা আঘাত করতেও চেয়েছিল। কিন্তু আনন্দ আঘাত পায়নি। ওর মন তখন বৈরাগ্যের এমন একটি সহজাত বর্মে আচ্ছাদিত হয়েছিল যে কোন আঘাতই দিতে পারত না। বৈরাগ্যের এই ধর্মটি তো বাইরে থেকে সংগ্রহ করে ইচ্ছে হলেই পরা যায় না। ওটি থাকে মনের

মধ্যেই। হঠাৎ এক সময় মনকে মর্মকে আবৃত করেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই আনন্দ হেসেছিল। হাসতে পেরেছিল অত্যন্ত সহজে। হেসে বলেছিল, তোমার কাছে আমার দামের নিরিখটা যেন সত্য হয় বেবী! তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বেবী হেসে বলেছিল, তা হয়ো না, তাতে ঠকবে!

—কেন?

—কেন? তার কারণ ক-জন মানুষের পুঁজি আছে বলো? পুঁজিবাদী না হলে হীরে জহরৎ খোঁজে না কেউ। পুঁজিহীন মানুষ সস্তা সকল জিনিস নিয়েই টানাটানি করে বেশি। তোমার গিলটি আছে। তাই তো তোমাকে খুঁজে বেড়ায় সকলে।

এতেও আনন্দ বিচলিত হয়নি। জাভেরীকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে গিয়ে—ডলির বাক্সগুলি খালাস করে নিয়ে বেবীর হাতে দিয়ে এসেছিল।

বেবী থেকে গিয়েছিল জাভেরীর সঙ্গেই।

বেচারী জাভেরী। গুজরাটি তরুণটি বম্বে থেকে কলকাতায় এসে বাংলাদেশের অতিবেগে ছুটন্ত বাংলা সংস্কৃতির মোহে পড়ে গিয়েছিল। অতিবেগে ছুটন্ত বাংলা সংস্কৃতি সেকেলে রথে চড়ে চলে না, সে চলে ডবল-ডেকার বাসে, নয়তো এরোপ্লেনে কিম্বা স্টেশন ওয়াগনে। বেবী হয়েছিল তার গাইড। একেবারে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল টালিগঞ্জের ফিল্ম স্টুডিয়োতে।

বছর দেড়েক পর হঠাৎ জাভেরী একদিন ঝড়ো কাকের মতো এসে আনন্দর ওই বোর্ডিং-এর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ল।—রায় আমাকে বাঁচাও।

—কি ব্যাপার জাভেরী? কি হলো?

—**I am ruined man** রায়—আমাকে ধ্বংস করে দিলে।

—কে? কি বলছ?

—সে একটা দল? তাদের প্রধান হলো বেবীর এক বন্ধু?

—বেবীর বন্ধু? তার আবার বন্ধু কে জুটল?

—সে একদল জুটেছে? তার নাম ভূপতি?

—ভূপতি? কোন্ ভূপতি?

—তুমি বোধহয় তাকে চেন।

—আমি চিনি? বুঝেছি। সে কি করে জুটল?

—বেবী জুটিয়েছে।

—বুঝলাম। কিন্তু কি ব্যাপার বলো। ব্ল্যাক মেলিং?

—তাতে তো খুব ভয় করি না। বেবীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। চাইও। মকদ্দমা করলেও লড়াই করতে পারি।

—তবে?

—আমাকে ছবির ব্যবসাতে নামিয়ে আমার সর্বনাশ করে দিলে ?

—নামলে কেন ?

—তিরস্কার যত খুশি কর রায়, কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচাতে পার তো বাঁচাও।

—কি হয়েছে বলো ? বুঝে দেখতে দাও কিছু করতে পারি কি না ?

—একখানা ছবি করেছিলাম। সেখানা মার খেয়েছে। তারপর আর একখানা ধরিয়েছে। সেই বই আর শেষ হচ্ছে না। আমার বম্বের কারবার আমাকে গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। এখানকার অন্য ব্যবসাও শেষ। টাকা নেই, কি করব আমি দিশে পাচ্ছি না। তুমি যদি এস রায়, তুমি হয় তো আমাকে বাঁচাতে পার।

আনন্দ চুপ করে বসেছিল ?

।

এক বছর ধরে সে পুরানো নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিল। মধ্যে মধ্যে মনে হতো সে যেন কর্মদোষে ব্রাহ্মণ থেকে ব্রহ্মরাক্ষসে পরিণত হয়েছে—জেকিল এবং হাইডের মতো। হাইড থেকে জেকিলে ফিরে আসতে যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা অন্তরে অন্তরে, সে তাই অনুভব করত। ব্রহ্ম রাক্ষসের শাপমোচনের তপস্যা।

—রায়। আনন্দ রায় !

—আমাকে মাফ কর জাভেরী।

—আমাকে তুমি রক্ষা করবে না, রায় ? বার বার করে কেঁদে ফেলেছিল গুজরাটী তরুণীটি।

—আমি কি করে তোমাকে রক্ষা করব ? আমার ক্ষমতা কি ?

—তোমার ক্ষমতা আছে।

—না। তোমার ও-ধারণা ভুল।

—ভুল নয়। তুমি হয় তো নিজেকে জান না রায়। কিন্তু আমি জানি।

—কি জান ?

—জানি, ওরা তোমাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। রায়, ভয় করে তোমাকে। তুমি চল ?

—ভাল। গেলাম। তারপর।

—তুমি থেকে আমার ছবিটা শেষ করিয়ে দাও। তুমি থাকলে ওরা শেষ করতে বাধ্য হবে। তোমাকেই আমি সকল ভার দেব !

স্টুডিয়োতে আনন্দর বেবীর সঙ্গে দেখা হলো। ভূপতির সঙ্গে দেখা হলো।

আবার আনন্দ রায় ডুবল।

বেবী সেদিন অহঙ্কার করে বলেছিল। আনন্দবাবু আপনার উপাধিটা গ্রহণ করেছি শুধু দিদির খাতিরে। দিদি ওটাকে খুব মূল্যবান মনে করে আমাকে

দিলে। বললে, তোর জন্যে আমি তাকে ভালবেসেও ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম একদিন। তুই তবু তাকে নিজের করে নিতে পারিসনি, এবং কষ্টও অনেক পেয়েছিস তার জন্যে। আমি তাকে পেয়েছি আমার ভাগ্যের বলে। কিন্তু কর্মদোষে ভাগ্যের দান রাখবার শক্তি হারিয়েছি। ফেলে যেতে হচ্ছে। মনে এর জন্য দুঃখ অনেক। তারই মধ্যে সান্ত্বনা রইল তোকে দিয়ে যেতে পারলাম। তোর নাম নিয়েই বিয়ে করেছি। ম্যারেজ সার্টিফিকেট রাখ। এইটে দিলাম। এই আমার দানপত্র। কিন্তু—

তীক্ষ্ম ব্যঙ্গভরা হাসি খেলে গিয়েছিল বেবীর মুখে। বলেছিল—কিন্তু আপনার দাম এখন আর আমার কাছে নেই আনন্দবাবু। ছেলেবেলায় মায়ের একখানা বইয়ের ওপর কি ঝোঁকই না ছিল আমার। বইখানা মিস্ট্রি অফ দি কোর্ট অব লণ্ডনের ট্রানশ্লেশন, নাম ছিল—বিলিতি গুপ্তকথা। বইখানা মা লুকিয়ে রাখত। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে আধখানা পড়েছি, এমন সময় মা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়েছিল। বইখানার জন্যে আমি প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিলাম। তারপর বাবার মৃত্যুর পর মন খুব খারাপ, মা বইখানা বের করে দিলে, বইখানা পড়। মনটা অন্যদিকে ফিরবে। এক সময় পড়বার জন্যে খুব ঝোঁক ছিল তোর। বিশ্বাস করুন আনন্দবাবু, পৃষ্ঠা কয়েক পড়ে আর পড়তে পারলাম না। কি ভালগার যে লাগল। ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। আপনার ওপর একদিনের ঝোঁকের আজ ঠিক সেই দশা হয়েছে আনন্দবাবু। আজ বেবী নামধারিণী দিদির কাপড়-চোপড়গুলোর দাম আপনার চেয়ে বেশি। এগুলো নিয়েই আমি চলে যাব।

আনন্দ প্রশান্তভাবেই হেসেছিল সেদিন। হাসতে পেরেছিল। কাপড়-চোপড়ের বাক্স সমেত তাকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল।

সেই বেবী মাস ছয়েক আগে অকস্মাৎ ফিরে এল।

তার সর্বাঙ্গে বসন্ত-প্রারম্ভে মাধবীলতার নবপল্লবের শোভা দেখা দিয়েছে। ফুল ফুটবে—একথা সেই পল্লব শোভাই যেন বলে দিচ্ছিল। সঙ্গে ওই স্কাউণ্ড্রেল ভূপতি।

বেবী এসে চোখ রাঙিয়ে পত্নীত্ব দাবী করলে। বললে, নালিশ করব! ভরণ পোষণ দিতে হবে। আমার গর্ভে তোমার সন্তান। তার সকল দায় খরচ বইতে হবে তোমাকে।

আনন্দ বিস্ফারিত চোখে উগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলতে পারেনি।

ভূপতি বলেছিল, রাজী হয়ে যাও আনন্দ। বেবীকে নিয়ে একটা বাসা করে থেকে যাও। বেবীর খরচ, তোমার জীবিকা সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। ব্যাপারটা হলো, ভূপতির বস দিল্লীতে বেবীর সঙ্গে পরিচিত হলো। পরিচয়ের সুতোর দুদিকের দুই প্রান্ত অবশ্য

ভূপতিই দুজনের হাতে তুলে ধরেছিল। ভূপতির সঙ্গে বেবীর পরিচয় হয়েছিল সেই কাশীতে। তারপর ওরা দুজন বন্ধু ও বান্ধবীতে পরিণত হয়েছিল দিল্লীতে। ভূপতি আসত-যেত সিনেমা সংক্রান্ত কাজে। বেবী তখন সেখানে হঠাৎ বেকার হয়ে পড়েছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ পেয়েছিল ইংরেজ আমলে। দেশের স্বাধীনতার পরও সে কাজটা ছিল, কিন্তু হঠাৎ বিশেষ এক বৈদেশিক দূতাবাসের বাসিন্দাদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশার জন্য পুলিশের চোখ পড়েছিল তার উপর। এরপর হঠাৎ একদা ওর বাসা তল্লাশ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ নিয়েও গেল। মাস কতক রাখলে ডিটেনশনে। তারপর ছেড়ে দিলে। বেচারা হলো বেকার। ভূপতির সঙ্গে হলো আলাপ পরিচয়। ভূপতির অন্তরের গোপন উচ্চাশা সজাগ হয়ে উঠল। বেবীকে আয়ত্তে রেখে ওর সাহায্যে সে অনায়াসে বিখ্যাত হয়ে যাবে ছবির জগতে। বেবী হিরোইন, ভূপতি লিখবে নতুন সুরের গল্প, সেই দেবে ডিরেকশান। বেবীও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। দুজনের উৎসাহ সমান প্রবল, পরস্পরের কল্পনাকে চন্দ্রালোক-গামী হাউইয়ের মতো গড়ে তুলেছিল, এর সংশয় দূর করেছিল ও, ওর সংশয় দূর করেছিল এ। ভূপতি বলেছিল—ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় ছবি হবে। প্রথম গল্পের নাম হবে—নতুন জীবন। বেবী বলেছিল, নতুন জীবন না, নতুন ভারত, নয়া ভারত। শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় হবে না। পৃথিবীর অনেক ভাষায় হবে। প্রথম হবে ইংরেজীতে নিউ ইণ্ডিয়া। বৈদেশিক দূতাবাসের সঙ্গে মেলামেশার ফল এইবার সে লেডিস চেস্টারফিল্ডের দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে নিয়ে আসবে।

ভূপতি বলেছিল—একবার শুরুতেই দেখাব সানরাইজ। আলোর ছটা এসে পড়েছে একটা জায়গায়। সেই আলোর ছটার মধ্যে ফুটে উঠবে এক-এক দেশের পতাকা। তারপর পুরো সূর্যোদয়ের সঙ্গে দেখাব সব পতাকা বাঁধা হয়েছে একসঙ্গে—সবগুলি মিলে এক পতাকা হয়ে গেল। বিরাট একটা পতাকা। ছবির হিরোইন সেই পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে। হিরোইন হবে একেবারে সকল সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত—**I mean**—একেবারে আরণ্য বন্য। বুঝেছ? একেবারে শেষে পতাকা নিয়ে আবার তাকে যখন দেখাব তখন সে পূর্ণ সভ্যতার দীপ্তিময়ী। বন্য করলে একটা অদ্ভুত সুবিধে হবে কি জান? **salt or sauce**—বল-প্রয়োগের চরম সুবিধে হবে। **I mean sex**।

বেবী বলেছিল—আমার একটা সাজেসন আছে।

—বলো।

—প্রথমেই দেখাও, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ব্যাক গ্রাউণ্ডে ডেন্স ফরেস্ট। একটি মেয়ে চলে যাচ্ছে সেই বনের দিকে। একটি গাছের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সূর্যের লাল আলোয় সব যেন রক্তাক্ত হয়ে গেল। গাছতলাতেও

তাই। রক্তাক্ত একটি শিশু। কাঁদছে। সে কান্না মিশিয়ে দাও পাখীর ডাকের সঙ্গে? বুঝেছ? ইললেজিটিমেট বেবী। অ্যান্ড দি মাদার ইজ এ উইডো। কপালে তিলক গলায় মালা—বুঝেছ? দেন—সূর্যাস্তের মধ্যে দেখাও এক একজন এই রটন সমাজের ঋষি মুখলাল করে ডুবে যাচ্ছে দিগন্তে। শেষ ডুবিয়ে দাও এক একজনকে—রামকৃষ্ণ—রবীন্দ্রনাথ—মহাত্মা অ্যান্ড অরবিন্দকে।

তারপরই তোমার ওই সানরাইজের আইডিয়া। এতে ওই যে বন্য হিরোইন, তার হিস্ট্রি এস্টাবলিশড হয়ে থাকল। তার ব্লাডে রইল—বিদ্রোহ। দেন ইউ প্রসিড। সব ভেঙে-চুরে—। মধ্যে মধ্যে হিরোইনের হা-হা করে হাসি দিয়ো। ওয়াইল্ড রিভোলটিং—থেটনিং হাসি। তার সঙ্গে মাথা ঝাঁকি দেওয়া। বুঝেছ? কল্পনা করে নাও।

– গ্র্যান্ড ব'লে টেবিল চাপড়ে লাফিয়ে উঠেছিল ভূপতি।

—মিউজিক কিন্তু চাই নতুন।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকে মনে পড়েছিল তাদের। কিন্তু তারও তখন দেরী ছিল। আগের কাজ আগে। কিছুদিন পর ভূপতি নিয়ে এল তার বসকে। বসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বেবীর। বেবীকে বলে দিল—শক্ত বাদাম। ভাঙবার দায়িত্ব তোমার। আমি তোমার হাত পর্যন্ত পেঁছে দিয়েছি।

—আমার দাঁত বাঁধান নয়। নিশ্চিন্ত থাক।

বাদাম ভাঙল, বেবী প্রমাণ করলে তার দাঁত আসল দাঁত এবং দাঁতের গোড়ায় কোন প্রকার রোগ নেই। কিন্তু ভূপতির কথাও মিথ্যে হলো না, বাদাম ভেঙে দাঁতের কুচি ছেড়ে গেল। বেবীর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠল।

বিজ্ঞানের যুগে অবশ্য ওটা খুব একটা শঙ্কার কথা ছিল না। কিন্তু বেবী নিজে ভয় পেলে। তার এক বান্ধবীর এতেই মৃত্যু হয়েছে—এই দিল্লীতেই হয়েছে। সে চোখে দেখেছে তার যন্ত্রণা। মৃত্যুর পূর্বে সে ওকে সংবাদ দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিছু বলবার ছিল তার। কিন্তু যন্ত্রণায় সে কথা বলতেও পারেনি, বেবীও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ভয়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছিল। এরপর আনন্দ রায়ের উপাধির কথা মনে পড়েছিল! আর কি উপায় ছিল?

বেবী এসে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়াল। বললে নালিশ করবে। ডলির দেওয়া ম্যারেজ সার্টিফিকেটের বলে সে আদালতে দাঁড়িয়ে আনন্দকে দায়ী করবে। অভিযোগ করবে, বিবাহ করে কবি আনন্দ রায় তাকে ত্যাগ করেছে। তারই সন্তান গর্ভে নিয়ে সে আজ আশ্রয়হীনা সম্বলহীনা। আদালত করেই ক্ষান্ত হবে না। আনন্দ রায় দেখতে পাবে যে, কলকাতা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে এই কাহিনী লেখা প্রচার-পত্র ছেয়ে গিয়েছে।

আনন্দ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বেবীর দিকে তাকিয়ে ছিল, তারপর হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, আনন্দ রায়ের জীবন বিষে জর্জর হয়ে গেছে বেবী, তাতে আর বিষ ঢেলে কিছু করতে পারবে না। বেবী, আমাদের গ্রামে ছেলেবেলা গঙ্গারাম বেদেকে দেখেছিলাম, সে নেশার জন্যে সাপের বিষ পেলে তাই খেত। সাপের কামড়ে তার কিছু হতো না বলে শুনেছি। লোকে বলত, তাকে যে সাপ কামড়ায় সেই সাপটাই নাকি মরে যায়। তোমার অবস্থা তাই হবে।

ভূপতি তাকে বুঝিয়েছিল।

এমন একটা সুযোগ হারিয়ো না আনন্দ! এত বড় একটা হাঁস জালে পড়েছে। হাঁসটা অবশ্য তার বস্। সারা জীবনটা ওই হাঁসটাকে দিয়ে ডিম পাড়িয়ে তোফা প্রোটিনের ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারবে। বেবীকে প্রত্যাখ্যান করে লাভ খুব হবে না। বড় জোর বেবীকে বিপন্ন করে দুঃখ দিতে পারবে। তাই বা কতটুকু? ওটুকু সামলে নেবার মতো শক্তি বেবীর আছে বা অনায়াসে অর্জন করে নেবে সে। বুঝে দেখ।

বেবীর দায় নিতে ভূপতিই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাতে এ্যাডালট্রির দায়ে পড়বে। এ কথাও ভূপতি বলেছিল।

প্রথম দিন আনন্দ তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে যেন ক্ষেপে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন আবার এল বেবী! সে দিন সে একা এল। আনন্দের পা দুটো চেপে ধরলে। বললে, আমি যাব না, আমি যাব না, তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। আমাকে বাঁচাও।

আনন্দ পাথর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে সে বেবীর হাত ধরে তুললে। বললে, তাই হোক বেবী। আমার এই বিষজর্জর জীবন ছাড়া তোমার মতোন বিষে-জরা জীবনের তো ঠাঁই নেই যখন, তখন তাই হলো, তোমাকে আমি গ্রহণই করলাম। কিন্তু আজ আমি নিঃস্ব। আমার হাতে একটা পয়সা নেই, আমার জীবনের পুঁজি আমি হারিয়েছি। প্রথম জীবনে তপস্যা করে যা অর্জন করেছিলাম তা সুমিত্রার মোহে গ্যালিফ স্ট্রীটের ধারে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। সুমিত্রা, তুমি—তোমরা যা দিতে চেয়েছ বিষ, সেই বিষেই আমি জর্জরিত হতচেতন; চেতনাই যার নেই সে রচনা করবে কি? সে কিছুই রচনা করতে পারে না। সে অর্জন বা উপার্জন-ই বা কি করে করবে? আমার জীবনে দুঃখ-অভাব-অপমান আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে? এর মধ্যে তুমি আসতে পারবে তো?

বেবী বলেছিল, আসব। তাই আসব। আজ মনে হচ্ছে—আজ আমি বেশ বুঝেছি, এই ভাল, এই ভাল। একখানা ছোট ঘর, এক টুকরো উঠানের মাথায় এক টুকরো আকাশ, এক মুঠো অন্ন, এক কণা শাক, একখানা মোটা

কাপড়। এই ভাল। ওতে সুখ না থাক শান্তি আছে। উল্লাস না থাক, আনন্দ আছে। গতি না থাক, বিশ্রাম আছে। আমার এই ভাল।

আশান্বিত হয়ে উঠেছিল আনন্দ রায়।

বেবী আর সে দুজনেই পড়েছে, উঠবে দুজনে দুজনের হাত ধরে।

হায় হায় হায়! আনন্দের অট্টহাসি হাসতে ইচ্ছা করে।

সুস্থ মানুষ দুজনে পড়লে, দুজনে দুজনের হাত ধরে উঠতে পারে। অসুস্থ, প্রমত্ত এরা পারে না। এরা উঠতে গিয়ে আবার পড়ে আঘাত খায়। ধুলো মেখে বীভৎস হয়ে ওঠে, পরস্পরকে দোষারোপ করে সমগ্র স্থানটাকে বীভৎস কুৎসিৎ চিৎকার মুখরিত করে তোলে। পাঁকে যারা পড়ে তারা একা একা হয়তো উঠতে পারে, দুজনে একসঙ্গে উঠতে গেলে আরও ডোবে। পাঁকের তলায় তাদের সমাধি হওয়া নিয়তির নির্দেশ।

—কিছুদিনের মধ্যে আবার আনাগোনা শুরু করলে ভূপতি!

প্রথম আনন্দকে লুকিয়ে, তারপর প্রকাশ্যে।

তার বস্ ছবিতে আনন্দের গান নেবে, সুর নেবে। বেবী ছবিতে নামবার অবস্থা ফিরে পেলেই তাকে হিরোইন করে বই তুলবে। পকেট থেকে বের করলে হুইস্কির ফ্লাস্ক বোতল।

হুইস্কির পর ট্যাক্সি। ময়দান—হোটেল।

কয়েকদিন আর্তনাদ করেছিল আনন্দের পরমাত্মা। তারপর সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

তাই হয়। আনন্দ জানে, এক সময় সে অনুভব করেছিল, জেনেছিল। সাধনাও খানিকটা করেছিল।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব সেই সাধনা।

অন্ধকার থেকে আলোকের সাধনা। মৃত্যু থেকে অমৃতের সাধনা। মন্দ থেকে ভালর সাধনা। ক্ষুধা থেকে পরমতৃপ্তির সাধনা। অসুরত্ব থেকে সুরত্বের সাধনা।

বিশ্বপ্রকৃতির কেন্দ্রে চলেছে সেই সাধনা! মানুষের মধ্যে সেই সাধনার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রকাশ। আপনাকে, মানুষের আত্মাকে সেই সাধনায় গড়ে তুলছে। সেই আত্মা ওই মন্দের প্রভাবে সাধনা-ভ্রষ্ট হয়ে ওঠে অহং; অহংয়ের প্রভাবে সকল সাধনা হয়ে ওঠে অহংকার। জীবনের রসায়ন অমৃতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যপথে ও হয়ে ওঠে বিষ। ডেকে আনে মৃত্যু। তামসী প্রকৃতি অট্টহাসি হাসে। আজ যেন সকল জগৎজুড়ে সেই হাসি প্রলয় হাসি হয়ে বেজে উঠছে। পৃথিবীর বুকের মানুষের সমাজের এতকালের সাধনাকে সে গ্রাস করবে। আনন্দ কি করবে? কি করতে পারে? একান্ত অসহায়, নিতান্ত দুর্বল সে। আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে পড়েছে সে। ভেসে চলেছে স্রোতে। ভাসতে

চেয়েছিল আনন্দের স্রোতে, অমৃতের স্রোতে। ভেসে চলেছে উল্লাসের স্রোতে, মৃত্যুর স্রোতে। চল, ভেসে চল। বেবীর সঙ্গে নিরন্ধ্র অন্ধকার গভীরতর—গভীরতম লোকে প্রবল আবর্তনে আবর্তিত, ক্ষুধা তৃষ্ণার অতৃপ্তির লালসার হিংসার ক্রোধের সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়ে গিয়ে সেই প্রবলতম গভীরতম সমুদ্রকে আরও গভীর, আরও প্রবল করে তুলুক। অনন্ত আকাশলোক থেকে একবিন্দু জল পৃথিবীর সমুদ্রকে তো একবিন্দু পরিমাণেও বৃদ্ধি দিয়ে থাকে। তাই হোক।

দিন দিন বেবী দুর্বল হচ্ছিল। তার দেহাভ্যন্তরস্থ শিশু তার স্বাস্থ্য রক্ত জীবনীশক্তি যেন জলোকার মতো তাকে শোষণ করছিল। স্বাস্থ্য গেল, তার সঙ্গে গেল শ্রী; শক্তি গেল, তার সঙ্গে গেল উল্লাস। ভূপতি আসা যাওয়া কমিয়ে দিলে। ক্রমে একদিন বন্ধ করে দিলে।

আনন্দর জীবন ওই অন্ধকার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল তাতেও বাধা পড়ল। অসহায় জেলিমাছের মতো ঢেউয়ের ঠেলায় এসে পড়ল উত্তপ্ত বালুচরে। অন্ধকার স্রোত ভাটির টানে নেমে গেল। আর একটা ঢেউ অচিরে আসবে এমন প্রত্যাশাও রইল না। জোয়ার আসবে আবার বেবীর স্বাস্থ্য ফিরলে তার শ্রীর টানে। তার আগে নয়। কিন্তু ততদিন জেলিমাছের জীবন বাঁচবে?

হঠাৎ এই সময়ে একদিন—আর-একটি স্রোত যেন এগিয়ে এল।

দেখা হয়ে গেল কৃষ্ণার সঙ্গে।

কৃষ্ণার জীবন-স্রোত ওই অন্ধকার সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে অমৃত সমুদ্রের সন্ধানে চলেছিল? সার্কুলার রোডের উপর দোকানে বসেছিল কৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখা হলো কৃষ্ণার সঙ্গে।

কৃষ্ণা নাম আনন্দই দিয়েছিল, ওই নামটাই তার মনে পড়ল। আনন্দের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। মনে হলো কালো চোখ দুটিতে আলো জ্বলে উঠেছে। আবেগের আতিশয্যে থর থর করে কাঁপছে।

সেই প্রথম কথা বললে। নেমে এল দোকান থেকে, প্রণাম করলে।

—কৃষ্ণা। গাঢ়স্বরে চুপি চুপিই বললে আনন্দ।

—আমাকে মনে আছে আপনার?

হাসল আনন্দ। বললে—তোমাকে ভোলা যায় না কৃষ্ণা। কিন্তু তোমাকে আর দেখতে পাব আশা করিনি। এক সময় তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কাশী পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তারপর—। হাসল সে। মনে পড়ে গেল বেবীকে। বেবী তার পিছনে সেবার কাশী পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। তারপর চলে গিয়েছিল দিল্লী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আনন্দ বললে—কোথায় ছিলে এতদিন?

দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণার চোখ থেকে।

—তুমি কাঁদছ? তা হলে থাক্। কিন্তু এ দোকান কার? তুমি কি করছ এখানে।

চোখ মুছে হাসলে কৃষ্ণা। বললে—দোকান আমার নিজের।

—তোমার নিজের? তোমার মা? ভাইরা?

—জানি নে তাদের খবর। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার ঝড়ে ওলোট-পালট খেয়েছি—সে অনেক কথা আনন্দবাবু। এখান থেকে মুসলমানেরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল বেহার। বেহারে দাঙ্গা হলো; সেখান থেকে আবার এলাম কলকাতায়। তারপর ধরল টি. বি.। সে অনেক কথা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা চলে না। টি. বি. থেকে বেঁচে গেলাম এক সন্ন্যাসীর ওষুধে। যখন বাঁচলাম—তখন খেতে পরতে হবে তো। এখন এই দোকান করেছি।

অবাক হয়ে গেল আনন্দ। বিস্ময় কাটিয়ে হেসে বললে—চল তোমার দোকানে বসে তোমার কথা শুনব। বলবে তো আমাকে?

দোকানে বসে কৃষ্ণা বললে, বলব আর কি আনন্দবাবু! দাঙ্গার প্রথম দিন ১৬ই আগস্ট। হাসলে কৃষ্ণা—বিচিত্র হাসি। ছিলেন আপনি কলকাতায়? দেখেছিলেন সে দুর্যোগ।

দেখেছিল বই-কি আনন্দ। ডলি সাবধান করে দিয়ে আগের দিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল। মনে পড়ল সেই মুসলমান ভদ্রলোকের কথা, মনে পড়ল বামপন্থী ব্যারিস্টারের কথা। মনে পড়ল সারাটা দিন চিড়িয়াখানায় কাটানোর কথা। মনে পড়ল শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা। ময়দানে জনতার কথা। আগুনের কথা। হিংস্র চিৎকারেয় কথা। মনে পড়ল রাত্তিরটা ও তারপর দিন-তিনেক ট্যাক্সি-গ্যারেজে কাটানোর কথা। সব মনে পড়ে গেল। পুরনো কথা অনেক।

কৃষ্ণার মা তাকে ঠেলে দিতে চেয়েছিল, তার দাদার সঙ্গে পথের উপর। নিত্য অপরাহ্নে দাদার সঙ্গে যাবার জন্য নিঃশব্দে হাত চেপে ধরে টানত। পরের বাড়ি ভিক্ষা করবার সময় যেমন স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, তেমনিভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার হাত ধরে টানত।

কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। আশ্রয় নিয়েছিল স্কুলের মেমসাহেবের কাছে। কোন কথা লুকোয়নি; অকপটে সব কথাই খুলে বলেছিল। বলেছিল—আপনি আমাকে বাঁচান।

মেমসাহেব তাকে বাঁচিয়েছিলেন। আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও এল বিপদ। দাবী এল কৃশ্চান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। কৃষ্ণা আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ধর্ম কি সে তো ভাল করে জানতাম না, আনন্দবাবু। শুধু জানতাম আমি হিন্দু। ভালবাসতাম দুর্গাকে, ভালবাসতাম শিবকে, কালীকে, কৃষ্ণকে, রাধাকে, লক্ষ্মীকে, সরস্বতীকে, রামকে, সীতাকে। নইলে ঈশ্বর ওদেরও আছে। আমার ঈশ্বর যে ওদের ঈশ্বরও সেই। সেই সকলের

ঈশ্বরকে কোনো কালে জানি নে। জেনেছি এদের, শুনেছি ওদের কথা, স্বপ্নে এদের দেখেছি, এদের ছাড়তে প্রাণটা টনটন করে উঠল। মেমসাহেবের কাছে গিয়ে কাঁদলাম। মেমসাহেব বললেন, তা হলে তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে অন্যত্র থাকতে হবে। তোমার খরচ তোমাকে—নিজেকে উপার্জন করতে হবে। তাই মেনে নিলাম। একটা মেয়েদের বোর্ডিংয়ে আমার জায়গা করে দিলেন। আর চিঠি লিখে যোগাড় করে দিলেন গুটি তিনেক কাজ। ছোট ছেলে পড়াবার কাজ। এরই মধ্যে একটি ছিল এক পুরনো বড়লোকের বাড়ি। কলকাতা শহরের পত্তনের কাল থেকে মস্ত বড়-লোক। সেকালে ছিলেন বড় বড় কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। সিন্দুক বোঝাই সোনা রোজগার করে ব্যবসা ছেড়ে সুদে টাকা খাটিয়ে সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটান। বাড়িটা এঁদের বউবাজারের কাছে সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর পশ্চিম দিকে চিৎপুরের পূব দিকে। ছোট একটি ছেলেকে পড়াতাম, তিরিশ টাকা দিতেন। যেতাম তিনটের সময়, ছুটি সন্ধ্যের কাছাকাছি।

ষোলই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। সকালবেলা থেকে গুজব পাঁচ রকম ছিল। কিন্তু এমনটা হবে এ ধারণা সাধারণ লোক করতে পারেনি। আমিও করিনি। দুপুর বেলা গড়ালেই যেমন সে বাড়িতে যেতাম তেমনিই গিয়েছিলাম সেদিন। হেঁটেই বরাবর যেতাম। সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু থেকে সে বাড়ি যাবার ছোট পথটায় ঢুকলে বরাবরই গা ছম ছম করত। গলির মধ্যে ঘুরে বেড়াত ছোকরাদের দল। শিস দিত, হিন্দীতে গান করত, ইশারা জানাত। আমি মাথা হেঁট করে চলে যেতাম। সন্ধ্যের সময় ফিরতাম। সে বাড়ির দারোয়ান আমাকে মোড় পর্যন্ত রেখে যেত। সেদিন গলির মধ্যে ঢুকে দেখলাম আর এক চেহারা। দেখলাম ওরা যেন থমথম করছে। চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ঝকমক করে খেলা করছে। সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল সাজছিল। জয়ঢাক বাজাচ্ছিল। ছোরা গুঁজছিল কোমরে। গুঁজবার আগে ধারে হাত বুলিয়ে, রোদের ছটায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে শ্লোগান দিয়ে উঠছিল পাকিস্তান জিন্দাবাদ! লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

বুকটা যেন কেঁপে উঠল আমার। গলির মধ্যে ঢুকেছিলাম, কিন্তু আর এগিয়ে যেতে সাহস হলো না। মিনিট খানেকের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। হঠাৎ একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ওই গলির মধ্যে ছিল তার পানের দোকান। ইউসুফ গুণ্ডা। ওরই দোকানখানা ছিল ওখানকার গুণ্ডা ছোকরাদের আড্ডা। বাবুদের দারোয়ান কয়েকদিনই ইউসুফকে বলে দিয়েছিল ইউসুফ, বাবুর হুকুম এই লেড়কীর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। এ লেড়কী বাবুর লেড়কার লেড়কাকে পড়ায়। খবরদার, কোন কিছু খারাবী শুনলে বাবু বহুত গোস্সা করবেন, হঁ্যা।

বাবুকে ওরা সম্ভ্রম করত। ও পাড়াটার মালিকই ছিলেন বাবু। সব

বাড়ির মালিক। বারণ সত্ত্বেও ওরা ইঙ্গিতে অনেক অসম্ভ্রম করতে চেষ্টা করত কিন্তু তার বেশি না। তার বেশি এগোতে সাহস পেত না। সেদিন ইউসুফের চোখে চোখ পড়তেই সে—ইয়া বলে একটা চিৎকার করে দোকান থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল। ছুটল আমার দিকে। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম,—পিছনে ফিরলাম, তখন ইউসুফের সাগরেদ দু-জন —পিছনের পথ আটকে হি হি করে হাসছে। দুই হাত বাড়িয়ে পথ আগলেছে।

থমকে দাঁড়ালাম।

মুহূর্তে ইউসুফ এসে আমাকে জাপটে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে।

তারপর ?

তারপর সে এক অন্ধকার, তমসাময়ী পৃথিবী। আলো নেই, আনন্দ নেই। শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই—বোধ করি বাতাসও ছিল না। ছিল শুধু বিকার-বিষ-ক্ষুধা-হিংসা-লালসা-বুভুক্ষিত গ্রাস, উন্মত্ত পাশব চিৎকার উল্লাস। মহা প্রকৃতির সে কি ভয়ঙ্করী রূপ! বস্তুজগতে মহাপ্রকৃতির কুপিত রূপ আত্মপ্রকাশ করে ভূমিকম্পে ঝড়ে প্লাবনে, কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েকটা দিন তার স্থায়িত্ব। আর চেতনাময় জীব-জীবনে তিনি কুপিতা হলে আর যেন শান্ত হতে চান না।

বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ক্ষতবিক্ষত বিষজর্জর দেহের যন্ত্রণায় কয়েকটা দিন কৃষ্ণার আর চেতনা ছিল না। ভয়ে বিহ্বলতায় চেতনা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। খানিকটা লোভনীয় মাংসপিণ্ডের মতো তাকে নিয়ে ইউসুফের দল লোফালুফি করেছিল, যার হাতে যখন গিয়ে পড়েছিল, তখন সে তাকে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। নিরেট রবারের বল নিয়ে কুকুর যেমন কামড়ায়, মাটিতে ফেলে আবার কামড়ায়। গড়িয়ে যেতে দেয়। খানিকটা দেখে, আবার ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরে চিবুতে থাকে, ঠিক তেমনি—ঠিক তেমনি। এর মধ্যে হতচেতন হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা বলে, কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র আনন্দবাবু, বড় কঠিন, অপরিসীম তার সহ্যশক্তি। এই অত্যাচারেও জীবনটা গেল না। কি করে বাঁচল, বেঁচে থাকল, তা জানি না। চেতনা যখন হলো তখন ট্রেনে। বোরখা পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ইউসুফ। রাত্রির ট্রেন, বাইরে অন্ধকার, ট্রেনের কামরার আলোয় ইউসুফ সামনে বসে নিয়ে গেল। ভোর রাত্রে ট্রেন থেকে নেমে নিয়ে গেল বেহারের একটা গ্রামে। পথে মনে পড়ে দুটো স্টেশন, একটা জামালপুর জংশন, সেখানে গাড়ি বদল করেছিল। আর মনে পড়ে মুঙ্গের। মুঙ্গেরে নেমেছিল। তারপর গরুর গাড়ি করে শহর পার হয়ে এক পাড়াগাঁয়ে।

খাপরার চাল, খুপচি ঘর, ধুলোভর্তি রাস্তা—বেহারের এক অখ্যাত মুসলমান পল্লী, সেখানে আর একদফা লোফালুফি।

তারপর আর মনে নেই।

অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আনন্দবাবু। জ্ঞান যখন হলো তখন বাড়ির একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানায় পড়ে আছি। একদিকের দেওয়ালের গায়ে গোল একটা ঘুলঘুলি। সেই ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে আলো এসে পড়েছিল খানিকটা, এক ঝলক রোদ। উঠবার শক্তি ছিল না। গড়িয়ে গড়িয়ে সে রোদ-পড়া জায়গায় মাথা পেতে দিলাম। রোদের উষ্ণ স্পর্শ বড় ভাল লাগল। মাথা পেতে রোদ নিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। হঠাৎ এক সময় চোখে পড়ল ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে দূর আকাশের সূর্য দেবতা। প্রণাম জানালাম। প্রার্থনা জানালাম—

আমাকে এ অন্ধকার থেকে ত্রাণ কর, আমার সকল পাপ তুমি নাশ কর হে দিনের ঠাকুর। হে সর্বপাপঘ্ন! সেই রোদেই এক সময় নিজের দেহের পানে চাইলাম। দেখলাম চামড়া-ঢাকা কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় হলো। আমার চেতনা ফিরেছে। আবার, আবার যদি সেই লোফালুফি শুরু হয়। ঘরে ঢুকল এক বুড়ী। ইউসুফের নানী। আমাকে দেখে বললে, আ, চোখ মেলে চেয়েছিস তাহ'লে।

তারপর গালে হাত দিয়ে বললে, বহুত কড়া জান তোর।

আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম।

সে বললে, নে তাহ'লে কুছু খা। এনে দিলে খানিকটা দুধ। খেলাম।

বুড়ী বললে, ইউসুফ কলকাতার দিকে গেছে। তাকে লিখে দেব। এক মুর্দা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। উল্লুর বেটা উল্লু। স্রেফ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গেছে। বলে গেল, মরে গেলে, মাটি চাপা দেবে, তার আর ক-টাকা খরচ। এখন তুই যখন বাঁচলি তখন সে টাকা পাঠাক। টাকা না পাঠালে তোকে খেদিয়ে দেব আমি। তা বলে দিলাম।

তারপর বুড়ীর কি মনে হলো। বুড়ী আমার খুব যত্ন শুরু করলে। যাতে আমি খুব বেশি বেশি খাই তার জন্যে জেদ করতে লাগল। তখন বুঝলাম না কারণটা।

কারণটা বুঝলাম মাসখানেক পর।

আমাকে স্নান করালে বলির পশুর মতো। ও দেশের ছাপা কাপড় কাঁচুলী দিলে, বললে, বাংগালী লেড়কীর মতো কাপড় পরবি। আয়না চিরুনি দিলে! বললে—কলেজ পড়নেওয়ালী লেড়কী তুই। ঠিক কলকাতার ছোকরীর মতো চুল বাঁধবি। আজ মুঙ্গের শহর থেকে মীর সাহেবের পোতা দেখতে আসবে তোকে। তোকে দেখে যদি পছন্দ হয় তো তোকে সে নিয়ে যাবে, আমার খরচার টাকাটা সে দিয়ে দেবে। সে হলে বুঝবি তোর নসীব খুব ভাল। একেবারে আমীর—বাড়িতে গিয়ে উঠবি। না হয় তো তোকে দিয়ে আসব মুঙ্গের শহরের কসবী পাড়ায়।

সেদিন কিন্তু এল না মীর সাহেবের পোতা।

পরের দিন খবর এল গ্রামে বেহারে কোথায় কোথায় যেন হিন্দুরা লুঠ করেছে, দাঙ্গা চালিয়েছে মুসলমানদের গ্রামে গ্রামে।

বলছে —নোয়াখালির বদলা।

নোয়াখালিতে নাকি কলকাতার চেয়ে বড় দাঙ্গা হয়ে গেছে। সেখানে হিন্দু নেই, সেখানে মুসলমান ছাড়া কেউ নেই। মুসলমান রাজ্য হয়ে গেছে। বেহারে সেই খবরে হিন্দুরা ক্ষেপে উঠেছে। বদলা চাই। নোয়াখালির বদলা চাই।

বেলা বারোটা হতে-না-হতে গ্রামে কোলাহল উঠতে লাগল। এ গ্রাম থেকে ক্রোশ চারেক দূরে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। সেখানে নাকি এক রাজপুতের গাঁওয়ে নাকারা বাজছে। জুলুষ হচ্ছে। চিৎকার উঠেছে— বদলা চাই।

এখানে এ-গাঁও ও-গাঁও থেকে লোক আসছে। লাঠি সড়কি তরোয়াল বের হচ্ছে। হুঁশিয়ারির হাঁক হেঁকে বেড়াচ্ছে সমর্থ জোয়ানেরা।

আমি একলা ঘরে বসে আছি।

বুড়ী সকালে উঠেই গেছে মুঙ্গের শহর। ফেরেনি। আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে গেছে। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে গেছে। গেছে মীর সাহেবের পোতার কাছে।

ফিরল বিকেলবেলা।

তখন গ্রাম থমথম করছে। মধ্যে মধ্যে চিৎকার উঠছে। ওই ধোঁয়া উঠছে। ওই গাঁওয়ে আগুন লেগেছে। ওই ওধারেও। ওই ওই।

সন্ধ্যেবেলা বুড়ী ঘরে ঢুকল হাতে একখানা ভোজালি।

বুড়ীর চেহারা হয়েছিল ভয়ংকর।

পিঙ্গল চোখ দুটো যেন অন্ধকার রাতের বেড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল। নিস্তব্ধ হয়ে ভোজালি হাতে বসেছিল। চোখ নিবদ্ধ ছিল বন্ধ দরজার দিকে। যেন [illegible] দরজার [illegible] এসেই পড়বে [illegible] দিয়ে। [illegible]

ওদিকে কোলাহল [illegible] থেকে প্রবল [illegible] হয়ে উঠছে।

যেন উন্মত্ত কল্লোল [illegible] এগিয়ে আসছে [illegible] বান।

সে কি কলরব, সে কি গর্জন। তার সঙ্গে আর্তনাদ। [illegible] জানালার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ রেখায় [illegible] আলোর রেখা। গ্রাম জ্বলছে।

বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড তার [illegible] প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। ছুটতে পারছে না, থেমে যেতে চাচ্ছে কিন্তু অসহ্য উদ্বেগে যন্ত্রণায় চলছে।

হঠাৎ এক সময় উন্মত্ত চিৎকার বাড়িখানার চারপাশে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

খানিকটা হাত পা ছুড়লে তারপর স্থির হয়ে গেল।

কৃষ্ণা অবাক হয়ে গেল। এ কি হলো? সভয়ে সে নেড়ে দেখলে বুড়ীকে। বুড়ী মরে গেছে। ভয়ে হার্টফেল করেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পড়ল দরজায় ধাক্কা।

পলকা দরজা। অল্প কয়েকটা ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে গেল। ঘরে ঢুকল মশাল হাতে অস্ত্রধারী জন-কয়েক লোক। লাঠি সড়কি তলোয়ার—তাতে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

মশালের লালচে আলো পড়েছিল কৃষ্ণার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের উপর। আয়ত চোখ দুটির শুভ্রস্বচ্ছে আলোর প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল। কৃষ্ণা মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ। এমন মানুষের দল তার চোখের সামনে নতুন নয়। কলকাতায় একবার দেখেছে। তবু যেন পার্থক্য রয়েছে। এদের চোখে শুধু রয়েছে প্রতিহিংসা। কলকাতায় যাদের দেখেছিল তাদের চোখে হিংসার সঙ্গে দেহলোলুপতা ছিল! এদের তা নেই, আছে শুধু ক্রোধ। সে এই ক-দিনই শুনে আসছে যে, এরা ধর্মান্ধতায় পরমাসুন্দরী নারীকেও স্পর্শ করে না। অস্ত্রের মুখে সমর্পণ করেছে। কাতর আকুতিতে নারী আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে কিন্তু সে তাদের কানে প্রবেশ করেনি।

মৃত্যু তা হলে আসছে। স্তম্ভিত এতক্ষণের জন্য কথাটা খেলে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে প্রতীক্ষা করে রইল।

হা, বুঢ্‌ঢী মর গয়ি! উয়ো ছোকরী।

—নেহী। ঠহর যাও।

একজন তলোয়ার তুলে এগিয়ে আসছিল। পিছন থেকে অন্য একজন চিৎকার করে উঠল। নেহী ঠাহর যাও।

সে এগিয়ে এল। তুম! আ! আরে সিঁথিকে লাট্টুর বহেন না তুম? আাঁ?

ব্রিজনন্দন পানওয়ালা। সিঁথির মোড়ে পানের দোকান ছিল ব্রিজনন্দনের। ছেলেবেলা থেকে ব্রিজনন্দন তাকে দেখছে। ব্রিজনন্দনের বাপ করত দোকান। ব্রিজনন্দন বিড়ি বাঁধত। পাড়ার মধ্যে ছিল কুস্তির আখড়া! সেখানে কুস্তি লড়ত। মধ্যে মধ্যে তাড়ি খেয়ে রাস্তায় হল্লা করত। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে বাসায় ফিরত। সেই ব্রিজনন্দন।

কলকাতা থেকে ব্রিজনন্দন এই দাঙ্গার জন্যেই এসেছিল বেহারে মুঙ্গেরের পাশে তাদের নিজের গাঁয়ে। কলকাতার দাঙ্গা ব্রিজনন্দন নিজের চোখে দেখেছে। সে দাঙ্গাতেও সে লড়াই করেছে। নোয়াখালির খবর শুনেছে। নোয়াখালি থেকে যারা কোনরকমে পালিয়ে এসেছে তাদের দেখেছে। কলকাতায় তার বন্ধু-বান্ধব যারা মুসলমান ছিল তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর পাইকপাড়ার মুসলমান দুধওয়ালাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ছুরি খেয়েছে কাঁধে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই খবর পেয়েছিল বেহারের। গোপন খবর। বেহারে বদলা নেওয়া হবে। আয়োজন হচ্ছে। সেই শুনেই সে চলে এসেছিল গ্রামে।

ব্রিজনন্দন তাকে বাঁচাল।

বাঁচালে নয়। তাকে নিয়ে এল কলকাতায়।

কলকাতায় এসে তাকে ব্রিজনন্দনই তুলেছিল ওই পাঞ্জাবী বুড়ীর বাসায়। ব্রিজনন্দন তাকে ভালবাসতে চেয়েছিল। তাকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলে তার জীবনে গ্রহণ করবে স্থির করেছিল। কিন্তু ব্রিজনন্দন একদিন সকালে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরল না। ব্রিজনন্দন কলকাতায় ফিরে ওই দাঙ্গা নিয়েই মেতেছিল। তার লড়াই ছিল বিখ্যাত কলাবাগান বস্তির গুণ্ডাদের সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা ছিল কলাবাগান বস্তি সে পোড়াবে, ধ্বংস করবে। কলাবাগানের হালিম ছিল তার চিরশত্রু। ছেলেবেলায় শত্রুতার সূত্রপাত হয়েছিল। হালিমের বাপ ছিল রাজমিস্ত্রী। ব্রিজনন্দনের বাপ তখন মাথায় করে ইঁট বইত। যখন যে ইমারতে খাটত, সেইখানেই বাসা একটা তৈরি করে নিত। দশ বছরের ব্রিজনন্দন থাকত বাপের কাছে। হালিমের বয়স তখন চোদ্দ। সেও আসত বাপের সঙ্গে। বাপ তাকে ভারার ওপর পাশে বসিয়ে রাখত। যোগান দেওয়ার কাজ করত। হালিম বয়সে বড়, তার উপর রাজমিস্ত্রীর ছেলে। সে ব্রিজনন্দনকে নিয়ে ইশপের গল্পের ছেলেদের ব্যাঙ নিয়ে নিষ্ঠুর খেলার মতো খেলা খেলত। তারপর ছাড়াছাড়ি - ব্রিজনন্দনের বাপ সিঁথির মোড়ে পানের দোকান করে বসল, তার সঙ্গে দু-চার টাকা লেনদেনের কারবার। ওদিকে হালিমের পরিণতি হলো গুণ্ডার দলের সর্দারিতে। হালিমের ছ-খানা ঘোড়ার গাড়ি, দুটো পানের দোকান। কলাবাগান লেনের দু-মুখে দুটো ঘাঁটি। হালিমের ভাই জালিম গরু মোষ কিনে দুধের কারবার করত পাইকপাড়ায়। পাইকপাড়া ও সিঁথির মাঝখানে চিড়িয়ার মোড়ে হালিমের দু-খানা ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিল। সেই উপলক্ষে ব্রিজনন্দনের সঙ্গে হালিমের শত্রুতায় মরচে ধরেনি। মাসে অন্তত একবার করে বচসা-গালাগালির-উখোর কর্কশ ঘষামাজায় ধারালো এবং হিংস্র হয়েই থাকত। পাইকপাড়ার দুধওয়ালাদের সঙ্গে দাঙ্গায় ব্রিজনন্দন কাঁধে ছুরি খেয়েছিল। সে ছুরি মেরেছিল হালিমের লোক, হালিমের নয় জালিমের ভঁইসার এক খিদমদগার। ব্রিজনন্দনের কাছে জালিমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যে জালিম সেই হালিম। তাছাড়া জালিম দাঙ্গাতে খুন হয়ে গেল। ব্রিজনন্দন বেহার থেকে ফিরে তাই হালিমকে শেষ করে জীবনের সকল ক্ষোভ মেটাবার জন্যে এসে বসল হ্যারিসন রোডের সেন্ট্রাল-এ্যাভেন্যুর মোড় বরাবরই ওই বাড়িটাতে। আরও একটা কারণ ছিল। সে কারণ এই কৃষ্ণা। সিঁথির ওদিকে কৃষ্ণাকে নিয়ে যেতে সাহস হয়নি ব্রিজনন্দনের। বাঙালীর

মুলুক। তাছাড়া এই দাঙ্গায় বাঙালী ছোকরাদের চেহারা যে দেখেছিল তাতে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

এদের ভয় যেন কোথায় উপে গিয়েছে। চোখের ভেতর যেন ছুরি ঝকমক করছে, সে তা দেখেছে। এরা কোথা থেকে এসে ব্রেনগান স্টেনগান বের করে কট কট শব্দে গুলি চালিয়ে পাঁচ সাতটা লাশ ফেলে দিয়ে চলে যায়। দু-তিনজন পাতলা কাঠির মতো বাচ্চা ছেলে হাঁ করে পকেট থেকে বের করে বম্‌—বাস চোখের নিমেষে ছুঁড়ে মেরে হাওয়া হয়ে যায়। ওদের ক্ষেপিয়ে কলকাতায় থাকা যাবে না।

সে জানত এই কালো মেয়েটার মা ভাই কে কোথায় গেছে তার পাত্তা নাই। মেয়েটার ভাই নিজেই বহেনকে বেচে ব্যবসা করতে চাইত, সেও তার অজানা ছিল না। এও সে জানে যে এ মেয়েকে এখন ফিরিয়ে দিলে তাকে ঘরে কেউ নেবে না। হয়তো এমন কোন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবে, যেখানে এই সব মেয়েদের খেতে দেয়, পরতে দেয়, থাকতে দেয় বাস। কিন্তু এই মেয়েটিকে সে ওখানে পাঠাতে চায়নি। ওকে চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তুলবে। নিজের জীবনে গ্রহণ করবে এই ছিল তার বাসনা। ওই মোড় থেকে মিটিয়া কলেজও খুব কাছে। আর পেয়েছিল এই পঞ্জাবী বুঢ়ীয়াকে।

বুঢ়ীয়া তার অনেক দিনের চেনা লোক। ব্রিজনন্দনের বাপের সঙ্গে বুঢ়ীয়ার জানপহছান ছিল। বুঢ়ীয়া ব্রিজনন্দনকে ভালবাসত।

বুঢ়ীয়ার কাছে রোগজীর্ণ মেয়েটিকে এনে তুলে ব্রিজনন্দন বলেছিল, দাদি, ওকে আমি সাদী করব, তুই ওকে সেবা করে ভাল করে তোল। ডাগডর আর ইলাজের খরচ আমি দোব। কিন্তু সেবা করতে তো আমি জানি না।

বুঢ়ীয়া বলেছিল, এ মতলব তুই করিস নে রে ভাইয়া। বাপরে! এই বাঙ্গালী মুলুকের কলকাতার শহরের বুকে বাঙালীর ছোকরী নিয়ে থাকবি এ মতলব করতে তোর বুকটা কেঁপে উঠছে না? তোকে জানে মেরে দেবে।

ব্রিজনন্দন বলেছিল, ও মেয়ে যদি নিজে আমাকে সাদী করে তা লোকে আমাকে মারবে কেন? আমি ওকে মুসলমান লোকের হাত থেকে সেই মুঙ্গের ইলাকার গাঁও থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। ওর মুখ দিয়ে রা উঠছে না রাত বুখার লেগে রয়েছে। তবু ওকে আমি ফেলে দিইনি; কাঁধে করে নিয়ে এসেছি। যত টাকা খরচ লাগে ডাগডরে আর ওষুদে সে আমি করব। তব লোকে বলবে কেন? আর ওই ছোকরীই বা আমাকে সাদী করবে না কেন?

বুঢ়ীয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, তোর কপালে দুখ আছে রে ব্রিজনন্দন। কপালের দুঃখ ঘোচায় কে বল? আমি তোকে বলতে পারি ও মেয়ে ভাল হলে কখনও তোকে সাদী করতে চাইবে না। ও লেড়কী লিখাপড়ি জানে আমি দেখেছি আংরেজী আখবরের একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে পড়ছিল।

ব্রিজনন্দন বলেছিল, আচ্ছা দেখা যায়ে গা। আমিও না হয় আংরেজী শিখে নোব।

বুড়ী আর কিছু বলেনি, হেসেছিল। ব্রিজনন্দন চলে গেলে গান ধরেছিল আপন মনে, -

'হায় কানাইয়া! কেন তুই সোনার বরণ মেয়েকে ভালবাসলি?
আরে তুই রাখাল। রাখাল হয়ে রাজার মেয়েকে ভালবাসলি?
কানাই বললে, করব কি? দোষ আমার নয়।
দোষ—মহব্বতির। প্রেমের।
ভাল লাগল আমার, ভালবাসলাম আমি—সে না বলব কি করে?
তার চেয়ে মরণ ভাল। মরণ হোক আমার।'

পঞ্জাবী বুড়ী সে এক বিচিত্র মেয়ে।

পৃথিবীকে সে এমনভাবে দেখেছে, এমনভাবে চিনেছে, এমনভাবে গ্রহণ করেছে যে, ভাবলে বিস্ময় লাগে। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম রূপ দেখেছে। তার সুন্দরতম রূপও দেখেছে। বুড়ী বলে, ওরে মেয়ে, তোর দেশে তো এই একবার এই হাল দেখলি। আমার দেশে পঞ্জাবের সেই উত্তর তরফের মুলুকে আমাদের ছেলে বয়সে তো এসব লেগেই ছিল। রাত্রে এসে পড়ত লুঠেরারা। সে সব ডাকাত বড়া বড়া ডাকাত। মানুষের জান আর ছাগল ভেড়ার কুকুর বেড়ালের জান এসবের মধ্যে কোন তফাত নেই তাদের কাছে। কোতোয়ালি-ফতোয়ালি এসব কিছু মানে না তারা, দস্তুরমতো লড়াই দেয়। কোতোয়ালি লুট করে নিয়ে চলে যায়। গাঁয়ে ঢুকে দুয়ারে যাকে দেখে গুলি করে। বাড়ি ঢুকে কচাকচ পুরুষদের কেটে ফেলে। মেয়েদের কান ছিঁড়ে গয়না নেয়, নাক ছিঁড়ে গয়না নেয়, হাত কেটে ফেলে, আঙুল কেটে ফেলে: আঁটা গয়না খুলে নেবার তর সয় না। জোয়ানী খুবসূরতি মেয়ে হলে তো রক্ষে নেই, লুটে নিয়ে যায়। বেশি কাঁদাকাটি করলে তার উপর অত্যাচার করে কেটে দেয়। নইলে বেচে দেয়। নিয়ে যায় পাহাড়িয়া মুল্লুকে যেখানে না আছে রাজা, না আছে বাজা, না আছে আইন, না আদালত সেই সব মুল্লুকের হাটে বেচে দেয় পঞ্চাশ-একশো টাকায়। মেয়ে, আমি সেই মুল্লুকের বেটী। আমার বয়স যখন সাত কি আট, তখন আমার বাবার ঘরে ডাকাত পড়েছিল। বাবাকে কেটেছিল আমার চোখের সামনে। বিছানার গাদার মধ্যে লুকিয়েছিলাম আমি। আমার মাকে আর এক ফুফীকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। জনমভোর আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর সে গাঁও থেকে ঘুরে ঘুরে এলাম এক সর্দারের বাড়ি। তারা খেতে দিলে। থাকতে দিলে। বড় হতে লাগলাম। হয়ে গেলাম একরকম কেনা বাঁদী। জোয়ানী হয়ে উঠলাম,

তখন চোখে রং লাগল। পালালাম ওই বাড়ির এক নোকরের সঙ্গে। নোকরের মা করত এই দাইয়ের কাম। দাইয়ের ছেলে আমার পেয়ারের আদমী—সেও খুন হলো দাঙ্গায়। দেখলাম অনেক। যে দেখে ডর করে—ডরকে মারে—ভেঙে পড়ে, বাস্ তার আর রক্ষে নাই। তার আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না এ দুনিয়ায়। যে ডরকে মানবে না, সেই জিতল। ঠিক দিন কতক বাদে, যে দুনিয়া ভয়ংকরী হয়ে গিলতে আসছিল সেই দুনিয়া একেবারে খুবসুরতি আর মনোহারী হয়ে বুকে তুলে নিয়ে দুই গালে চুমা খাবে দশ-বিশটা। ভয় করিস না মেয়ে, ভেঙে পড়িস না।

বলতে বলতে পৃথিবীর রহস্যকে যেন উপলব্ধি করে ঘাড় নেড়ে হাসত, কৃষ্ণার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিত।

ব্রিজনন্দন যেদিন ফিরল না, সেদিন রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বারকয়েক বারান্দায় উঠে রাস্তার উপরটা দেখে এল, তারপর বারোটার সময় এসে বললে, খতম! ব্রিজনন্দন তা হলে খতম হয়ে গেছে। উ হালিম শয়তান ডাকুকে আমি জানি। সে ঠিক শেষ করে দিয়েছে।

সঠিক খবরটা এল পরের দিন সকালে। খবর দিয়ে গেল অন্য এক হিন্দু দলের লোক। বলে গেল—ব্রিজনন্দন কোন ডাক্তারের কাছে যেত নিত্য নিয়মিত, কার জন্য দাওয়াই নিয়ে আসত। কার যেন বেমার হয়েছে জ্বর ছাড়ে না আর মুখ দিয়ে খুন নিকলায়। হালিম কার কাছে পেয়েছিল খবরটা। সে খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে এই খবরের উপর ফাঁদ পেতেছিল। ব্রিজনন্দনের কানে খবর পৌঁছে দিয়েছিল—কি, করপোরেশন ষ্টীটের ওধারে আছে একজন বড়া ভারি চীনা ডকডর। সে নাকি এক মাহিনার অন্দরে বেমালুম ভাল করে দেবে। ব্রিজনন্দন কিছুদিন থেকে কলাবাগান অঞ্চল ছেড়ে ওই চৌরঙ্গী অঞ্চলেই যাওয়া-আসা করছিল, কেন না—কলাবাগানের মুসলমানের দল তখন এদিক ছেড়ে ওদিকে গিয়েই ঘাঁটি গেড়েছিল। দিন দুই থেকে যে গলিটার ভিতর ঠিকানা দিয়েছিল চীনা ডগডরের, সেখান থেকে হালিম ষড়যন্ত্র করে দলবল সরিয়ে দিয়েছিল। কেন, যাতে ব্রিজনন্দন মনে মনে ভেবে নেয় যে, হালিমরা উঠে গেছে। ফাঁদটা হুঁশিয়ারির সঙ্গে পেতেছিল হালিম, এবং সে ফাঁদে ঠিক ব্রিজনন্দন পা দিয়েছিল, হালিমের মতলব অনুযায়ী। বাস, ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষে আছে। ব্রিজনন্দনের শরীরে শক্তি ছিল, তার উপর ইদানীং সে যোগাড় করেছিল এক পিস্তল, তারই জোরে আর সাহসে, কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করতে চাইত না। কিন্তু হালিম যোগাড় করেছিল এক পাইপগান। বাস, ওই পাইপগান দেগে দিয়েছে হালিম। লাস যে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে, সে বলতে পারে হালিম। আর পারে এক ভগবান। ব্রিজনন্দনের দলের ছোকরাদের মধ্যে জন দুই ঘায়েল হয়েছে। একজন আছে হাসপাতালে। বাকি লোক এখন গা ঢাকা দিয়ে আছে। দলের যে লোক

ঘায়েল হয়ে হাসপাতালে গেছে, সে যদি পুলিশের কাছে কবুল খেয়ে বসে তো বহুৎ গোলমাল হয়ে যাবে। তা ছাড়া হালিমের জান না-নিয়ে তারা ফিরবে না।

বুড়ী হাসলে বিচিত্র হাসি। বললে সে দিন রাত্রে বারোটা পর্যন্ত যখন সে ফেরেনি, তখন বিলকুল মালুম হয়ে গিয়েছে। এ সবই আমার জানা কথা।

অনেক আগে থেকেই আমি জানতাম যে এমন হবে। তবে আমার ধারণা ছিল, ব্রিজনন্দন একা নয়, হালিম সুদ্ধ দুজনেই দুজনকে কলিজা ছিঁড়ে নিয়ে পড়ে থাকবে। তা—।

হ্যাঁ তাই-ই হতো। তবে ফারাক হয়ে গেল এই জন্যে যে, এই লেড়কীটার মহব্বতিতে পড়েছিল ব্রিজনন্দন, হালিম তা পড়েনি।

কৃষ্ণা তখন শয্যাশায়িনী, উঠতে পারে না। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল নীরবে নিঃশব্দে। খবরটা তার কানে যেতে সে একটা আরামের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিল। এইবার নিশ্চিন্ত। এইবার সে বিনা বাধায় মরতে পারবে। আর ওষুধের বালাই থাকবে না। পঞ্জাবী বুড়ী কিন্তু ঠিক সময়ে ওষুধ এবং পথ্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—খেয়ে নে মেয়ে।

খেতে চায়নি কৃষ্ণা। বলেছিল, আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি খাব না।

মাথার কাছে বসে হেসে পঞ্জাবী বুড়ী বলেছিল, কি হলো তোর? ব্রিজনন্দনকে তবে কি তুই ভালবেসেছিলি মেয়ে?

রূঢ়ভাবেই বলেছিল কৃষ্ণা, না। পরক্ষণেই অবজ্ঞাভরে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

—হ্যাঁ, বুঝেছি।

—কি?

হেসে বুড়ী বলেছিল—ব্রিজনন্দন তোকে বলেছিল কথাটা, আমার মনে আছে। বলেছিল দাওয়াই যদি নাই খাস, তুই যদি মরেই যাবি তবে তোকে ভোগ না করে মরতে দেব কেন? তোর সঙ্গে তোর এই রোগা দেহ নিয়েই বাসর পাতব। তোকে ভোগ করে নেব আমি। ছাড়ব কেন? মনে পড়েছে। ঠিক বলিনি মেয়ে।

কথার উত্তর দেয়নি কৃষ্ণা।

বুড়ী আবার বলেছিল।—কিন্তু তুই মরবি কেন মেয়ে?

—কেন? সে তুই বুঝবি না বুড়ী?

—বুঝব না? হেসে উঠেছিল বুড়ী।

—না রে মেয়ে, তা বুঝি। খুব বুঝি।

—বেঁচে কি করব বলতে পারিস? কি হবে?

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল বুড়ী।

—তুই এমন করে হাসিস নে বলছি।

—তোর কথাশুনে হাসছি।—বেঁচে কি হবে, কি করব? কেন, যদি এমন দুর্ভোগ তোর কপালে না ঘটত তা হলে বেঁচে যা হতো যা করতিস তাই হবে তাই করবি। খাবি-দাবি আনন্দ করবি। ইচ্ছা যায় তো ঘর-বাঁধানি সাদী করবি।

এবার কৃষ্ণা বিষণ্ণ হেসে বলেছিল—তুই জ্বালাস নে। আমার অবস্থা তোর বোঝবার ক্ষমতা নেই বুড়ী। এ যদি তোর ভাগ্যে ঘটত তবে বুঝতে পারতিস।

এই কথার উত্তরে বুড়ী ওই কথাটা বলেছিল। বলেছিল—ওরে মেয়ে তোর দেশেতে এই হাল এই একবার দেখলি। আমার দেশে আমার পঞ্জাবের সেই উত্তর তরফের মুল্লুকে এ তো হামেসাই লেগে ছিল এককালে। আমার ছেলে বয়সে এসব ঘটত দিনে একটা দুটো। ছ-মাসে একটা-না একটা দাঙ্গা। দু-পাঁচ বছরে এক-একটা লড়াই। আরে, বাপ রে বাপ!

পঞ্জাবের গল্প বলে বলেছিল—দেখ, পরের মর্দানা ছুঁলে বুকে ছুরি মেরে জহর খেয়ে মরে যায় এমন মেয়েও দেখেছি। আবার হাটে বিক্রি হয়। এক হাট থেকে আর এক হাটে যায়, চোখের জল মুছতে মুছতে—এমন মেয়েও দেখেছি লুট হয়ে যায়, তারপর বাজারে কসবীগিরি করে এমন মেয়ে অনেক দেখেছি। আবার এমনও দেখেছি যারা কোন রকমে ছাড়া পেয়ে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়, তপস্যা করে সারাজীবন। আবার এমনও দেখেছি মেয়ে, যারা ছাড়া পেয়ে এসে গঙ্গাজীনে আস্নান করে সুরষ দেওয়ের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলে কি—হে সুরযদেও, তুমি তো জান আমার কসুর এতে ছিল না, আমি কমজোরি আওরৎ, জোর করে জবরদস্তি করে আমার দেহের ওপর যে অত্যাচারের পাপ চাপিয়ে দিয়েছে তার এতটুকু আমার পরমাত্মাকে স্পর্শ করেনি। আমার মনের দুঃখ, দেহের কষ্ট গঙ্গাজীর পানিতে ধুয়ে দিলাম। তোমার আলোতে আমার দেহমন পুণ্যময় হলো, বলে তারা আবার ঘর করে সংসার করে; কাজ করে, কাম করে, পাট করে দিন গুজরাণ করে। কতজনের ভাগ্যে কাজ কাম করতে করতে মিলে যায় মনের মানুষ। তার সঙ্গে সাদি করে নেয়। সাদি যদি হতে না পায় ভাই, তবে দেশ-দেশান্তরে চলে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর-সংসার বাঁধে। এই দেখ না, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার কি হয়েছিল শোন—।

বুড়ী দিব্যি হাসিমুখে নিজের গল্প বলে বলেছিল—দেখ না, সেই সর্দারজীর নোকরের সঙ্গে মহব্বাত হলো, তার সঙ্গে চলে গেলাম। তার মায়ের কাছে দাইগিরি শিখেছিলাম, সেই দাইগিরি করেই তো খাচ্ছি-দাচ্ছি বেঁচে আছি। পঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসেছিলাম—সেও এসেছিলাম বড় আদমীর

বাড়ির ছেলে মানুষ করার কাজ নিয়ে। তাদের বাড়িতেই একটি মেয়ের প্রসবের সময় আমি যা কাজ করেছিলাম সেই দেখে সেই বড়া আদমী এখানকার পঞ্জাবী মহলে আমার সেই দাইয়ের কাজের সুবিধা করে দিয়েছিল। কই মনে তো হয় না—আমি পাপী, আমি নরকে যাব। ভগবান আমার উপর গোসা করেছেন। কোন অধর্মী কাজ আমাকে করতে হয় না। মনের মধ্যে কোনদিন এমন ভাবনা হয় না কি--মরে গেলে আমায় নরকে যেতে হবে। বিশ্বাস কর তুই জীবনভোর কোনদিন এমন স্বপ্নও আমি দেখিনি।

কৃষ্ণার রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে চুলের ফাঁস ছাড়াতে ছাড়াতে কথাগুলি সে বলেছিল। কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। এক সময়ে হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণা ওষুধটা নিয়ে বলেছিল—দে খাই।

তারপর বলেছিল, এই শিশিটা ফুরলে তো আর বলবি নে তুই?

দিন দুই পরে বুড়ী তাকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এক পঞ্জাবী হিন্দু কবিরাজের কাছে। বলেছিল, বিনা ওষুধে তোকে মরতে দিলে আমার পাপ হবে। তুই ভাবিস নে, আমার টাকা আছে। কে খাবে আমার টাকা? হোক তোর চিকিৎসাতেই খরচ হোক।

অতি বিচিত্র ওই কালো মেয়েটি। তেমনি অদ্ভুত ওর প্রাণ-শক্তি। তারও চেয়ে বিচিত্র বোধ করি ওর অদৃষ্ট। স্মৃতি-স্মরণ করতে করতে আনন্দ রায় অদৃষ্টের কথা ভেবে একটু হাসলে। অদৃষ্টকে ও অবিশ্বাস করে, তবু এমন ক্ষেত্রে এই একটা ছাড়া অন্য কথা নেই। কি বলবে অদৃষ্ট ছাড়া।

রোগের জর্জরতার মধ্যে একদিন কৃষ্ণা মরতে গিয়েছিল। গিয়েছিল গঙ্গায় ডুবে মরবে বলে। সেখানে এক সন্ন্যাসী তাকে আত্মহত্যার সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাতেই কৃষ্ণা বেঁচেছে। এই সর্বনাশা রোগ থেকে সেরে উঠেছে। তারপর বেরিয়েছিল বাঁচবার পথ খুঁজতে। একালের বাঙালীর মেয়ে, অনেক পথের কথা সে শুনেছিল। বুড়ী বলেছিল—যা করবি কর্ ভাই। নিজেকে বেচে যেন বাঁচতে তোকে না হয়। সে পথ খোলা। সে পথ সোজা। সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই দেখতে পাবি, পুরুষ মানুষের ক্ষিধের দৃষ্টি তোর ওপর পড়েছে, সামান্য ইশারায় তারা তোর কাছে ছুটে আসবে। অনেক সঙ্গীও হয়তো মিলবে। তারা তোকে সাহায্য করে তোর রোজগারে ভাগ নিতে চাইবে। তোর দেহের উপরেও জুলুম করবে। ও-পথে চললে সে তোর খারাপও লাগবে না। কিন্তু ও-পথে যাস নে।

কৃষ্ণা হেসে বলেছিল, তুই ভাবিস না, সে পথে চললে অনেক দিন আগেই আমার অদৃষ্ট খুলত! সেই যুদ্ধের সময়। সেথো মিলত আমার নিজের সহোদর ভাই, ব্রিজনন্দন তাকে জানত।

কিছুদিন কয়েকটা টয়লেট কোম্পানির মাল নিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে আসত, মূলধন যুগিয়েছিল ওই বুড়ী। মূলধন নয়, জমা রাখতে হয়েছিল টাকা, সেই টাকাটা দিয়েছিল সে। তাই থেকেই সে করেছে একটা ছোট স্টেশনারী দোকান।

পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আনন্দর সঙ্গে।

বেবীকে নিয়ে আনন্দ নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। বেবীর বর্তমান অবস্থার জন্যে যে লোকটি দায়ী সে হঠাৎ মারা গেছে। তাদের ছবির কোম্পানি উঠে গেছে। ভূপতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। অদৃশ্য না হলেও সে তাদের সংস্রব ছেড়েছে। নতুন লোক খুঁজেছে। আনন্দর অর্থ নেই প্রায় আশ্রয়বিচ্যুত অবস্থা।

কৃষ্ণাকে দেখে আনন্দর প্রথমটা কুৎসিত কুটিল প্রবৃত্তি জাগল। আনন্দ তখন আবার পড়েছে, মদ ধরেছে, পয়সার জন্য লোকের কাছে ধার করে বেড়াচ্ছে, কৃষ্ণার দোকান দেখে তাকে প্রবঞ্চনা করতে চেয়েছিল। প্রথমটা চেয়েছিল কিছু টাকা। কিন্তু কৃষ্ণা বললে না, আপনার সকল বোঝার ভারের ভাগ আমি নিতে চাই। শুধু আপনার নয়, বেবীর দুঃখের ভাগ তাও নেব আমি। বাসা করুন, আপনাদের সেবা করব, যতদিন আপনার নতুন গান নতুন বই না লেখা হয়, রেকর্ড হয়, ততদিন এই দোকান থেকে আর আমার সঞ্চয় থেকে চলে যাবে কোন রকম করে। আপনার সেই শরীর, সেই চেহারা এমন হয়েছে! আনন্দ রাজি হয়েছিল।

বুড়ী কিন্তু বারণ করেছিল কৃষ্ণাকে—মেইয়া, এ আদমীকে আমার ভাল লাগছে না।

কৃষ্ণা হেসে বলেছিল কিন্তু আমার যে ভাল লেগেছে বুঢ়ীয়া।

—ও তোকে ঠকাবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

—আমি তো ওর কাছে কোন প্রত্যাশা করে যাচ্ছি না যে, আমাকে ঠকাবে।

—এর ওপর আর কি বলব তোকে। তা হোলে তুই যা। কিন্তু এ লোকটা যেন কেমন।

—তুই বাঁশুরিয়ার কথা বলিস বুঢ়ীয়া কথায় কথায়। ও সত্যি সত্যি বাঁশুরিয়া। ও হলো কবি, ও হলো গাইয়ে মানুষ। ওরা এই রকমই হয়ে থাকে। ওরা লোক ঠকায়। কিন্তু ঠকাব বলে ঠকায় না। ওরা আসলে ঠগ নয়। বড় ভাল মানুষ ওরা। লোক ওদের কাছে ঠকে। কিন্তু লোকদের ঠকার দুঃখে ওরা নিজেরা কষ্ট পায় বেশি। ঠকলে আমি দুঃখ পাব না।

হেসে বলেছিল যতই ঠিক ওর কাছে, সে ঠকার পালায় তোর আশ্রয় তো আমার যাবে না!

—না, তা যাবে না। তুই যেদিন ফিরে আসবি আমি আবার তোকে নিয়ে যেমন ঘর বেঁধেছিলাম, তেমনি বাঁধব।

এ সমস্ত কথাই আনন্দ জেনেছে শুনেছে।

কৃষ্ণাই বলেছে তাকে। বলেছে, সে কালে যে মানুষটিকে সেদিন সেই গাছতলায় দেখেছিলাম, সে মানুষকে আপনার মধ্যে খুঁজে পাই না। এই কটা বছরে সে বোধহয় হারিয়ে গেছে। এ আপনি অন্য মানুষ, তবু আপনাকে সকল কথাই বললাম। গোপন কিছুই করলাম না। আমি আপনার সব আচরণই সহ্য করব—বিনা নালিশে সহ্য করব। যদি হঠাৎ টাকা পেয়ে ভাল অবস্থা হয় আপনার আমার সঙ্গ যদি না চান তবে যেন না-বলে হঠাৎ চলে যাবেন না, বলেই যাবেন। টাকা আমি ফেরত চাইব না, শুধু মিথ্যে কথাটা বলবেন না।

টাকা এসেছে। ওই কৃষ্ণার জন্যই এসেছে, এবার আর বেবীর জন্য নয়, ভূপতিই এনেছে প্রস্তাব। হঠাৎ একদিন এসে কৃষ্ণাকে দেখে তার বিবরণ শুনে লোলুপ হয়ে উঠেছে ভূপতি। ওর কাহিনী নিয়ে ওকেই নায়িকা করে ছবি তুলবে।—চল আনন্দ, আজই চল। নিয়ে চল ওকে। তুমি বললেই ও রাজি হবে।

আনন্দ কুণ্ঠিত হয়েই বলেছিল। কৃষ্ণা হেসে বলেছিল, চলুন যাব। আপনাকে তো বলেছি, আপনার জন্যে আপনি যা বলবেন তা করব।

আনন্দর চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।

এমন ভাবে নিজের কাছে নিজে কখনও ছোট হয়নি। ওই কালো মেয়েটি তার জীবনে এ কি আগুন জ্বালিয়ে দিলে? সে যেন জ্বলছে, সে যেন গলছে। তার সকল মালিন্য, সকল খাদ পুড়ে যাচ্ছে, উপে যাচ্ছে।

—আনন্দবাবু!

—কে? কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা এসে দাঁড়াল।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল কৃষ্ণা। এ কি! সে আর্তকণ্ঠেই ডেকে উঠল, বেবীদি! বেবীদি!

ঘরের মধ্যে বেবী আহত পশুর মতো গোঙাচ্ছে। তিক্ততায় বিরক্তিতে আনন্দর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। রাগ হলো তার। এ কি; ক্ষোভে অভিমানে দুঃখে কি মানুষ এমন পাশব চিৎকার করে, সে দরজার ওপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে তীব্র উচ্চকণ্ঠেই ডাকলে বেবী! বেবী!

কৃষ্ণা বললে, দরজা ভেঙে ফেলুন।

বিস্মিত হয়ে আনন্দ বললে, ভেঙে ফেলব? বলেই সে আবার ডাকলে বেবী। দরজা খোল, বেবী। এ আর আমি সহ্য করব না তোমাকে বলে দিচ্ছি।

—চুপ করুন। কাকে কি বলছেন? বুঝতে পারছেন না কিছু?

—কি ?

—অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধ হয়। বোধ হয়—

—কি বোধ হয় ?

—প্রসব-বেদনা উঠেছে।

—কি বিপদ।

কথাটা আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রায় বেরিয়ে এল। হাত পা কাঁপতে লাগল আনন্দর। কি করবে সে ? জীবন তার কেটেছে উন্মাদনার মধ্যে বক্তৃতামণ্ডে-জলসার আসরে-হোটেলের কোলাহলে। সংসারের দায়িত্ব বহমের অভ্যাস নেই, এ সব সে জানে না, বুঝতে পারে না।

—কি করি বলো তো ?

—দরজায় ধাক্কা দিন, দেখুন ছিটকিনি খোলে কি না! দরজা খোলবার বা ভাঙবার ব্যবস্থা ·· ।

—কি হলো ?

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই প্রশ্ন করে বাড়িতে ঢুকল প্রতুল।

—কি হলো আনন্দবাবু ?

—দরজাটা খুলতে বা ভাঙতে পারবেন ? দেখুন তো।

আনন্দ কথা বলতে পারলে না। বললে—কৃষ্ণা।

—কি হয়েছে ?

—আগে খুলুন বা ভাঙুন।

প্রতুল এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।—এ কি ?

ঘরের মধ্যে থেকে গোঙানির সঙ্গে নবজাতকের কান্না শোনা যাচ্ছে। প্রতুল তার ব্যায়াম-পুষ্ট বাহুর পেশীগুলি কঠিন করে তুলে ধাক্কা দিল দরজায়। একখানা ইটের দেওয়ালখানা কেঁপে উঠল। পলকা দরজাখানার জোড়ের মুখ ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁকের মধ্যে আঙুল পুরে টানতে লাগল সে। আরও খানিকটা ফাঁক হতেই হাতখানা পুরে দিলে। সজোরে টান মেরে মড় মড় করে ছাড়িয়ে দিলে তক্তাখানা। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা ভিতরে হাত পুরে দিয়ে ছিটকিনি খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

রক্তে ঘরের মেঝে ভেসে গেছে। বেবীর পাশে পড়ে রয়েছে সদ্যোজাত শিশু। কিন্তু এ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়নি। সে থমকে দাঁড়িয়েছে বেবীকে দেখে। বেবী অজ্ঞান হয়নি। নিদারুণ যন্ত্রণায় সে বোধ হয় এমনি পশুর মতো চিৎকার করছিল। এখন সে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু এই হাঁপানীর মধ্যেও সে একখানা কাপড় টেনে নিয়ে ওই সদ্যোজাত শিশুটার মুখের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে।

—বেবীদি! ও কি করছ ?

বেবী জানোয়ারের মতো যন্ত্রণাকাতর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণার দিকে।

কোন কথা বললে না।

প্রতুল বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু দরজার মুখে ঢুকে সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না কিছু। কৃষ্ণা দ্রুতপদে এগিয়ে গেল এবার। বেবীর হাত থেকে কাপড়খানা কেড়ে নিয়ে বললে—ছি!

তারপর আনন্দর দিকে ফিরে বললে—শীগগির ডাক্তার কি নার্স ডাকুন। কিম্বা ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করুন।

আনন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক একভাবেই দাড়িয়েছিল। সে বুঝতে চেষ্টা করছিল সমস্তটা। কৃষ্ণার ওই ছোট 'ছি' কথাটা তাকে সচেতন করে তুলেছে। কৃষ্ণা আবার বললে—আনন্দবাবু। শুনছেন? দাঁড়িয়ে থাকবেন না এমন করে। ও পাশ থেকে প্রতুল বললে—আমি যাচ্ছি।

—দাঁড়ান।

—বলুন।

—আপনি তো আমার পুরনো বাসা চেনেন। আপনি বরং সেখানে যান, পঞ্জাবী বুড়ীকে ডেকে আনুন।

—ডাক্তার? ডাক্তারের দরকার হবে না?

—সে কথা সেই বুড়ীই ঠিক বলে দেবে। আপনি বরং ট্যাক্সি করে যান।

প্রতুল বেরিয়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—আর একটা কথা।

—বলুন।

বুড়ীকে বলবেন, আমার কিছু টাকার দরকার, সে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

—বলব। কিন্তু—

—বলুন।

—টাকা যদি দরকার তো আমি দিতে পারি এখন।

প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বললে—তা হলে পাঁচটা টাকা দিয়ে যান। পাঁচখানা এক টাকার নোট দিয়ে প্রতুল বেরিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণা ফিরল। ঘরের মধ্যে ঢুকবার মুখেই তার কানে এল আনন্দর রূঢ় কণ্ঠস্বর।

—কাপড়খানা নিয়ে কি করছিলে তুমি?

—ওর কান্না আমি সইতে পারছি না। ও আমার জীবনের অভিশাপ।

—ওই কাপড়খানা দিয়ে জীবনের চিহ্ন তুমি মুছে ফেলতে চাইছিলে? চমৎকার!

এক মাস পরের কথা। বেবী তখন খানিকটা সেরে উঠেছে। তার শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে খানিকটা সবলতা ফিরছে। বিছানায় শুয়েছিল, হঠাৎ উঠে

দাঁড়াল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মকাল, মহানগরী যে মহানগরী সেও যেন চেতনা হারিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে সূর্যতাপে দগ্ধপক্ষ সম্পাতির মতো। ছোট বাসাটিতেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন ধরেই বেবী এই সময়টিকে লক্ষ্য করে আসছে। শুধু এই সময়টিই নয়, আরও একটি সময়ও সে লক্ষ্য করেছে মধ্যরাত্রি। কিন্তু মধ্যরাত্রির একটা ভয়ংকর রূপ আছে। মহানগরীর আলোকোজ্জ্বল জনহীন মধ্যরাত্রির পথে সে ভয়ংকর যেন আশে পাশে অদৃশ্যরূপে ঘুরে বেড়ায় - গা ছমছম করে। শুধু তাই নয়, মধ্য রাত্রে জনহীন মহানগরীর পথে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়, স্থান কাল যেন অসীম অন্তহীন হয়ে উঠেছে। এর যেন শেষ নেই, এর যেন পার নেই। বেবী মহানগরীর মধ্যরাত্রি অনেক দেখেছে। ট্যাক্সিতে উল্কার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। খিলখিল করে হেসেছে, কিন্তু সে বেবী আর এক বেবী। সে শক্তি আজও সে ফিরে পায়নি। সেই মধ্যরাত্রির গতিবেগ সেই উল্লাস তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতছানি ইশারার টানেই সে চলেছে। কিন্তু মধ্যরাত্রেই আজ বের হবার সাহস তার নেই। তাই মধ্যদিনের লগ্নেই তাকে যাত্রা শুরু করতে হবে। মুক্তি তাকে পেতেই হবে। এ বন্ধন তার সহ্য হবে না। এ বোঝা বয়ে সে জীবনের পথে চলতে পারবে না। ভাবতেও সে শিউরে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিজের সেই দুর্গতি জীবনের প্রতিচ্ছবি।

এই কারণেই সে সদ্যঃ ভূমিষ্ঠ ছেলেটার মুখের ওপর একখানা কাপড় টেনে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কান্না সে সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু অন্তরের গোপন তার নিজের কাছেও গোপন অভিপ্রায়টা আনন্দ কথার খোঁচা দিয়ে আবরণটি টেনে ফেলে নগ্ন করে দিয়েছিল। আনন্দর কথাতেই বুঝতে পেরেছিল -সে অন্তরে অন্তরে কি চায় ?

আনন্দর তিরস্কারে সে সংকুচিত হয়নি। সে শিক্ষা তার নয়। কেন সংকুচিত হবে সে ? সে যা চায়। যার মধ্যে তার জীবনের আনন্দ - যার মধ্যে তার জীবনের স্ফূর্তি তার চাইতে সেই চাওয়া—যার কথা মুখ ফুটে বলতে কেন সংকুচিত হবে সে ?

আনন্দ তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বলেছিল—ছি ?

বেবী সবিস্ময়ে আনন্দর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছিল। কথা বলেনি, সবিস্ময় স্থির দৃষ্টিতেই প্রশ্ন ছিল ? -ছি কেন ? কিসের জন্য ছি ?

—কি করছিলে তুমি ? এত বড় অনাচার —

চকিতে বেবীর মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—কি হতো কাপড়খানা চাপিয়ে দিলে ? এবং সঙ্গে সঙ্গেই আপন অন্তরকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। পরমুহূর্তেই সে অসংকোচে বলে উঠেছিল—ওটাকে আমি সইতে পারছি না। পারব না আমি সইতে।

তারপর—মুহূর্তেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে।

ছেলেটাকে কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণা। ওই কালো মেয়েটা। তারপর এল ওই পঞ্জাবী বুড়ী।

পঞ্জাবী বুড়ী এসব কাজে পাকা মেয়ে। ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষতা অসাধারণ। শুধু তাই নয়, তেমনি চতুর। মনের ভিতরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। বেবীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিপুণ সেবায় তাকে সুস্থ করে বিছানায় শুইয়ে কোলের কাছে ছেলেটাকে দিয়ে বুড়ী তাকে স্তন্যপান করাতে বলেছিল। বেবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল আবার। বুড়ী বলেছিল—তোকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তোর মতলব আমি বুঝেছি।

আজ এক মাস বুড়ী অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছে তার উপর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটাকে স্তন্যপান করিয়ে সরিয়ে নেয়। হেসে বলে—পেটে ধরেছিস, য-দিন আছিস, ত-দিন অন্তত খাওয়া, তারপর—হেসেই ইঙ্গিতে কথাটা শেষ করে।

একদিন স্পষ্ট করেই বলেছে তুই থাকবি নে, পালাবি তা জানি, কিন্তু তাড়াতাড়ি পালাস নে। কিছুদিন থেকে যা। ছেলেটা একটু ডাঁটো হোক।

কৃষ্ণাকে দেয় ছেলেটাকে তেল মাখাতে, যত্ন করতে, ফিডিং বটলে দুধ খাওয়াতে। বলে—তুই মানুষ কর, একটু অভ্যেস কর্ ভাই।

কৃষ্ণা লজ্জা পায়। কৃত্রিম কোপে তিরস্কার করে। সে ভাবে অন্য কথা। কিন্তু বেবী বুঝতে পারে বুড়ীর কথার আসল অর্থ।

আনন্দ কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন ঝড়ের মতো প্রচণ্ড বেগে ছোটে। প্রচণ্ড উল্লাসে উন্মত্তের মতো খেয়ে বেড়ায়, রাত্রি একটা-দুটোয় প্রচুর মদ্যপান করে ফেরে। আবার কয়েকদিন নিজেকে এমন সম্বরণ করে যে কৃষ্ণা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। দিন রাত্রি ঘরের কোণে বসে শুধু ভাবে। কি ভাবে সেই জানে।

আনন্দর জীবনে দেবতা আর দানবের লড়াই চলছে। জেকিল আর হাইড।

বুড়ী বলে—ও পাগল হয়ে যাবে। এমন আমি দেখেছি। অনেক দেখেছি।

একদিন হঠাৎ তার ঘরে এসে আনন্দ রায় দাঁড়িয়েছিল। তার সে কি দৃষ্টি, ভয় পেয়েছিল বেবী। আনন্দ বলেছিল—বেবী, আমার জীবনে এ পাতালের অন্ধকারের উল্লাসকে যারা জাগিয়ে তুলেছে তাদের মধ্যে তুমি একজন। হয়তো বা প্রধানা তুমি। তুমি সেদিন ছেলেটার কান্না বন্ধ করতে একখানা কাপড় টেনে চাপাতে গিয়েছিলে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে—

দু-হাতের আঙুলের সম্প্রসারণে সঙ্কোচনে তার বাকী কথাটা ইঙ্গিতে শেষ হয়েছিল। বেবী চিৎকার করে উঠেছিল, কৃষ্ণা ছুটে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এ আবেষ্টনী এ বন্ধন থেকে মুক্তি তাকে পেতে হবে। এ আর বেবী সহ্য

করতে পারছে না। তার বন্ধনহীন জীবনস্বপ্ন তাকে ডাকছে। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল উল্লাসের জীবন তাকে ডাকছে।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে যাত্রা শুরু করবে।

ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। অভিভূত আচ্ছন্ন মহানগরী। ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘরের দরজাটা সে খুললে। দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্নের একটি সন্ধিক্ষণ আছে। সে সন্ধিক্ষণ সময়ের মাপে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ধরা যায় না। সে ক্ষণ নির্ণীত হয় তাপমানের মাপে, তাপ কমতে শুরু করলেই পাখীরা কলরব করে ডেকে ওঠে। মানুষের দ্বিপ্রহরের অলস তন্দ্রা কেটে আসে। বাতাস ওঠে। ঘড়ির কাঁটায় সে ক্ষণ কোনদিন বা দশ মিনিট আগে আসে কোনদিন দশ মিনিট পরে আসে। গতকাল দিনে তাপ মাত্রা একশো বার ডিগ্রির কাছে পৌঁচেছিল —আজ বোধহয় এক ডিগ্রি আরও চড়েছে। আজকের সন্ধিক্ষণ এসেছে আরও বিলম্বে।

ঘুম ভেঙে গেল কৃষ্ণার, বাইরে বস্তির মধ্যে শুকনো আম গাছটির ডালে কাকের দল কা-কা শুরু করে দিয়েছে। কৃষ্ণা তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের উপর হাত কচলে ঘুম ছাড়িয়ে ছোট টাইম-পিসটার দিকে তাকিয়ে দেখল, চারটে বেজে গেছে, চারটে বেজে দশ মিনিট। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। উঃ বেলা যেন গড়িয়ে গেছে, পঞ্জাবী বুড়ী এখনও ঘুমচ্ছে। বুড়ীর ঘুমের একটু বৈচিত্র্য আছে। দিনে যখন সকলের ঘুম আসে বুড়ীর তখন ঘুম আসে না। সাধারণের যখন ঘুম ভাঙবার সময় হয়ে আসে ওর চোখে তখন ঘুম নামে। বুড়ীর নাক ডাকছে। বুড়ীর কাছেই বেবীর শিশুটি শুয়ে আছে। মাস খানেকের শিশু, কাপড়-চোপড় ঢাকা পড়ে আছে মাংস পিণ্ডের মতো। মধ্যে মধ্যে জীবনী শক্তির স্পন্দন সঞ্চারিত হচ্ছে, মুঠো বাঁধা হাতের কম্পনে, বন্ধ চোখের পাতার কম্পনে, ভুরু দুটির ঈষৎ কুঞ্চনে। কখনও কখনও কপালে চামড়া কুঁচকে উঠেছে। ঠোঁট দুটি কখনও কান্না কখনও হাসির ব্যঞ্জনায় স্ফুরিত হচ্ছে। অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

ঘরের দরজা খুলেও সে বেরিয়ে এল না। বাইরে এখনও ঝাঁঝা রয়েছে। গায়ে অল্প লাগলে যেন জ্বালা করছে। থমকে দাঁড়াল সে। তাড়াতাড়ি নেই, চায়ের তাগিদ নেই।

আনন্দবাবু বাড়িতে নেই। কদিন থেকেই তার কিছু যেন হয়েছে। ভাবান্তর ঘটেছে, কখনও চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। সে যেন উন্মাদের মতো। কখনও বা বিষণ্ণ বেদনায় চোখের মধ্যে ফুটে ওঠে বিচিত্র উদাসী দৃষ্টি। এই শিশুটির বয়স যতদিন ততদিন যেন কেমন হয়ে গেছেন। হঠাৎ জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে যান, দীর্ঘ সময় পর ফিরে আসেন। কোন কোন দিন যান দিনে, ফেরেন গভীর রাত্রে। প্রশ্ন করলে

উত্তর দেন না। শুধু একদিন বলেছিলেন, পরিত্রাণের পথ খুঁজছি।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, তার মানে?

—মানে খুব কঠিন নয় কৃষ্ণা।

আবার প্রশ্ন করতে চেয়েছিল কৃষ্ণা। আনন্দ বুঝতে পেরে তার আগেই বলেছিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না। উত্তর দিতে পারব না। দেব না।

কৃষ্ণা আর প্রশ্ন করেনি। মানুষটিকে এককালে সে শ্রদ্ধা করত। অপরিসীম শ্রদ্ধা। আজ সে তাকে করুণা করে। সে করুণাও সুগভীর। সেই মানুষ এই হয়েছে। অর্থের জন্য কৃষ্ণার তোষামোদ করে আনন্দ রায়। সেই আনন্দ রায় মদ খেয়ে রাস্তার ইতর মদ্যপের মতোই বীভৎস হয়ে ওঠে। ওকে ঘৃণা করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাও পারে না। এখনও আনন্দ রায়ের মধ্যে কোথায় যেন কি মূলধন আছে। ভস্মস্তূপের মধ্যেও কোথায় আছে যেন ঘৃত নিষিক্ত বহ্নিকণা যে শুধু উত্তাপই বিকীর্ণ করে না গন্ধে হোমকুণ্ডের মহিমার আভাস দেয়। তাকে ছাইয়ের গাদা বলে ঝাঁটা দিয়ে বাইরে ফেলাও যায় না। তার উপর জল ঢেলে নিভিয়ে দিতেও পারে না।

ভাবতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল আপনা আপনি। আনন্দ রায় সম্পর্কে ভাবতে গেলেই এটা আসে। আনন্দ রায়কে সে ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। বাইরে ফালি উঠানটার পূর্ব দিকের দেওয়ালে দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে রোদ রয়েছে। এই চারটের পরও সে রোদের দিকে চাইলে চোখ জ্বালা করে। কিন্তু সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলে কৃষ্ণা, এ কি বাইরের দরজাটা হাওয়ায় দুলছে কেন? দরজা খোলা কেন? বেরিয়ে এল সে তাড়াতাড়ি। বাসন-কোসন অবশ্য নিতান্তই অল্প কয়েকখানা, সে কখানাও গেল না কি?

না। এই তো বারান্দার কোণে কলাই-করা থালা দু-খানা, গেলাস তিনটে, বাটি তিনটে গাদা করা রয়েছে। আলনায় তার শাড়িখানাও ঝুলছে।

তবে বোধহয় দরজা দিতেই ভুল হয়েছে তার। কিন্তু তাও তো না, ঠিক মনে পড়ছে সে দরজা দিয়েছে। তবে কি আনন্দবাবু ফিরেছেন, বেবী দরজা খুলে দিয়েছে।

বেবীর ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। আনন্দবাবু বেবীর ঘরে রয়েছেন তা হলে। একটু হাসলে কৃষ্ণা। চায়ের জল তাহলে এখনি চাপাতে হবে। ওদের আলাপে একটু বিঘ্ন উৎপাদন করতে হবে। কেৎলী আছে ও ঘরে। বিঘ্ন না করে উপায় নাই। সে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে, বেবী! বেবীদি!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না—বেবীদি! এরা কি ঘুমিয়ে গেছে নাকি? বেবীদি!

দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকলে এবার। বেবীদি! শুনছ! বেবীদি।

তবু কোন সাড়া নেই। এবার হাল্কা দরজাটাকে সে একটু জোরে নাড়া

দিয়ে ধাক্কা দিলে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা।

বিস্ময়ের অবধি রইল না তার। ঘরখানা খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই ঘরে। বেবী নেই। কোথায় গেল বেবী? ঘরের মধ্যে দুখানা ইটের উপর বেবীর সুটকেস ছিল সেটাও নেই। ট্রাঙ্কটা খোলা। ভিতরের কাপড়-চোপড় বিপর্যস্ত ওলোট-পালোট করে কেউ যেন কিছু খুঁজেছে। ছড়িয়েছে।

এ কি হলো? এ সবের অর্থ? বেবী? কোথায় গেল বেবী? বেবী পালিয়েছে? এ কি হতে পারে? এই দেহ তার আর ওই ঘরে তার শিশু-সন্তান শুয়ে রয়েছে এই অবস্থায় সে পালিয়েছে এ কি হতে পারে? ওটা কি? বিছানার উপর একখানা কাগজ অপরাহ্ণের উত্তপ্ত মৃদু বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে। কৃষ্ণা এসে কাগজখানা তুলে নিল।

হ্যাঁ তাই। চিঠি। চিঠিতেই তার মনের ক্ষণপূর্বের প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। ক্ষণপূর্বে তার মনে প্রশ্ন উঠেছিল, একি হতে পারে। এই দেহ তার আর ওই ঘরে তার শিশু-সন্তান শুয়ে রয়েছে—এই অবস্থায় সে পালিয়েছে এই কি হতে পারে?

পারে। তাই পেরেছে বেবী।

চিঠিতে লেখা রয়েছে।—আমি মুক্তি নিচ্ছি। তোমাকেও মুক্তি দিচ্ছি। এই চুক্তিই ছিল তোমার সঙ্গে। সে চুক্তি পালন করছি, শুধু ওই অবাঞ্ছনীয় জীবনটা রইল। ওটা আমার পক্ষে অসহ্য। সন্তান আমার জন্য নয়। বেবী চিরদিন কিশোরী। ওটা কাউকে দান করে দিয়ো। কেউ না নিলে ভিখিরি-দের দিয়ে দিয়ো। যারা ছেলে কোলে করে ভিক্ষে করে তাদের। আমায় খুঁজো না। আমার পথ আমি চিনি। আমার লক্ষ্য আমি জানি। আমার জীবনের কম্পাসের কাঁটা একবার শুধু ভুল করেছে। আর করবে না। শরীরে বল যেটুকু পেয়েছি তা বেশি না হলেও চিন্তা করো না। পথ দেখে নেবার পক্ষে এই যথেষ্ট। ওই জীবনটাকে আমি আর সইতে পারছিলাম না। তেমনি পারছিলাম না ওই কালো মেয়েটাকে। তোমাকেও চাই না। এই কারণেই বেরিয়ে পড়লাম। এ ঘরেও থাকতে আমি অভ্যস্ত নই সে তুমি জান। প্রয়োজন হওয়ায় তোমার কৃষ্ণার ট্রাঙ্কটা খুলেছিলাম। হাত রিক্ত কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল।

চিঠিখানি লিখেছে আনন্দকে।

বেবী পালিয়েছে। মুক্তি নিয়েছে। এই জীবন বেবীর পক্ষে অসহ্য। হঠাৎ চোখে পড়ল দেওয়ালের গায়ে যেখানে আয়না ঝুলছে সেইখানে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে লিপস্টিকের স্টিকটা।

যাওয়ার সময় বেবী লিপস্টিক ঘষে নিতে ভুলে যায়নি।

আনন্দ ফিরল অনেক রাত্রে। রাত্রি তখন এগারোটা। কৃষ্ণা জেগেই বসেছিল। পঞ্জাবী বুড়ী আপন মনেই অভ্যাস মতো বকে যাচ্ছিল, তিরস্কার করছিল তার বুদ্ধিহীনতার জন্য। বেবী চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং বলেছিল থানায় ডায়েরি করে আসবার জন্য। বাক্স খুলে টাকা নিয়ে গেছে। নিজের ছেলে ফেলে চলে গেছে, তার নাম ডায়েরি করে তার তসবীর একখানা দিয়ে এলে পুলিশ তাকে দুদিনের মধ্যে খুঁজে বের করে এই বাচ্চাকে তার কোলে গছিয়ে দিয়ে হাজতে পুরবে। তারপর কম-সে-কম ছ-মাহিনী ফাটক।

কিন্তু কৃষ্ণা তাতে রাজি হয়নি। বুড়ী বলেছিল তবে ওই বেজাত বাচ্চাটাকে ফেলে দে ঘর থেকে বের করে। পরের বোঝা নিয়ে ঘাড়ে চাপাবি কেন?

কৃষ্ণা তাতেও বলেছে না।

সে অপেক্ষা করে রয়েছে আনন্দবাবুর। জানে কোন ফলই নেই, তবু অপেক্ষা করে রয়েছে। জীবনে অনেক বিপদ, অনেক দুঃখ এসেছে, চরম প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে। তার দেহকে শক্তিতে পরাভূত করেছে কিন্তু তার ভিতরের মানুষ হার মানেনি, আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে সকল নির্যাতন সহ্য করেছে। মানুষের পাশবিকতা রোগের ব্যাপকতা তার দেহটাকে সহস্রমুখী জলৌকার মতো শোষণ করেছে। দেহের সর্বত্র বোধকরি চিহ্ন রেখে গেছে তার। কিন্তু জীবনের কোথাও কোন দাগ ফেলাতে পারেনি। পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্থির প্রশান্তভাবেই সে প্রতীক্ষা করে রইল। আসুন, আনন্দবাবু আসুন। তিনি কি বলেন সে শুনবে।

বিকেল বেলা দোকানে যাবার জন্যও সে বেরিয়েছিল। কিন্তু রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে পঞ্জাবী বুড়ী তার হিত করার বাগ্রতায় ছেলেটাকে যদি কোথাও নিয়ে চলে যায়। পঞ্জাবী বুড়ী তাকে বড় ভালবাসে। অকৃত্রিম তার ভালবাসা। তাই তাকে এত ভয়। ফিরে আসতেই কিন্তু বুড়ী ঠিক তার অভিপ্রায় বুঝেছিল। হেসে প্রশ্ন করেছিল, ফিরে এলি যে?

হেসেই কৃষ্ণা উত্তর দিয়েছিল। ভাল লাগল না যেতে। যাব না আজ।

—ভাল লাগল না? ঝুট বাত বলছিস।

উত্তর দেয়নি কৃষ্ণা।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিস? আমার উপর সন্দেহ করেছিস? ওই বেজাত বাচ্চাটাকে আমি ফেলে দিয়ে আসব আস্তাকুঁড়ে! হ্যাঁ, তাই আসতাম।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গর্জে উঠেছিল, তাও কি আসব না ভেবেছিস? আসব, একশোবার পাঁচশোবার আসব। তুই ওই বোঝা ঘাড়ে করে চির জীবন জ্বলবি তা আমি হতে দেব না। সে তোকে আমি বলে দিলাম।

কৃষ্ণা তারও উত্তর দেয়নি। তার বদলে সংসারের কাজে মন দিয়েছিল। জীবন ও মনকে স্বাভাবিক করে তুলতে এর চেয়ে ভাল পথ আর নেই। সহজ স্বাভাবিক কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া।

চা খেতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। চা খেয়ে সে রান্না চড়িয়ে রান্নাবান্না সেরে বুড়ীকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে একখানা বই নিয়ে বসে রইল। মাস খানেকের শিশুটা মধ্যে মধ্যে কাঁদছে। বেবী ওকে নিতো না। পঞ্জাবী বুড়ীই নিয়ে থাকত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ধমক দিয়ে স্তন্যপান করাতে বাধ্য করত।

বেবীকে বলতে ইচ্ছে হয়। চোখ দুটো জ্বলত। কি ইচ্ছে হয় মুখে বলত না, ওই জ্বলন্ত দৃষ্টির মধ্যেই প্রকাশ পেত।

পঞ্জাবী বুড়ী কঠিনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। সে দৃষ্টির সামনে কিন্তু বেবী ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ত। শেষে চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসত। বুড়ী বলত, একদিন তোকে এক চড় মারব। শিক্ষা দিয়ে দেব হ্যাঁ।

কোন কোন দিন বেবী চিৎকার করে উঠত—না-না-না।

রাত্রি এগারটা বেজে গেল কোথাকার টাওয়ার ক্লকে। শহরের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসছে। শহরের আলোগুলো জ্বলছে। ট্রামের আওয়াজ, যানবাহনের শব্দ কমে এসেছে। কৃষ্ণা বসে রয়েছে। সামনে বইখানা খোলা, কিন্তু একটা ছত্রও সে পড়তে পারেনি। সামনে যেন তার জীবনের ভবিষ্যৎ এই ক্রমঘনায়মান রাত্রির মতো স্তিমিত স্তব্ধ রূপে উন্মোচন করছে। বেবীর এই শিশুকে বহন করতে হবে তাকে? আনন্দ রায়ের বোঝা চাপবে তার ঘাড়ে।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। এল আনন্দ রায়। হয়তো মত্ত স্খলিত পদক্ষেপে নিজেকে অভিসম্পাত দিতে দিতে আসছে।

—আমার আত্মাকে পুতুলের মতো গালিফ স্ট্রীটের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি —ওই বেবীর সুমিত্রা দিদির ঋণায়। তাকে খুঁজে পেলাম না। ভাসিয়ে দিলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ত্রিপুরে কেউ জাগে না। মিছে কথা। কৃষ্ণা মিছে কথা। আমি প্রতারক, আমি ভণ্ড, আমি পাপী—আমি শয়তান, আমি সাপ।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল কৃষ্ণা।

ঘরে ঢুকল আনন্দ রায়।

না। এ কে? মুণ্ডিতমস্তক, সর্বাঙ্গে গেরুয়া, এ কে? এই তো আনন্দ রায়। আনন্দ রায় মুণ্ডিতমস্তক। সর্বাঙ্গে গেরুয়া। চোখে বিচিত্র দৃষ্টি।

কয়েক দিন পর আনন্দ রায়ের অপেক্ষাতেই জেগে বসেছিল কৃষ্ণা। আর মধ্যে মধ্যে চাইছিল কখনও টাইমপিস ঘড়িটার দিকে, কখনও তার চৌকিতে সুখস্বপ্নে বিভোর বেবীর একমাস কয়েকদিনের ছেলেটার দিকে। ছেলেটা এই গরমের

মধ্যেও ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করছে। কখনও হাসছে, কখনও তার কচি ঠোঁট দুটি ফুলে উঠছে কান্নায়। ছেলেটা আরামেই ঘুমুচ্ছে। বুড়ীয়ার স্পষ্ট আপত্তি এবং আনন্দর অস্পষ্ট বিরক্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণা ক-দিন আগে, যেদিন বেবী চলে যায় তার পরদিন মাসিক চারটাকা ভাড়ায় একটা টেবিল ফ্যান ভাড়া করে এনেছে ছেলেটার জন্যে।

কখনও ঘড়ির দিকে, কখনও বাচ্চাটার দিকে চেয়ে ভাবছিল কৃষ্ণা। তার ভাবনাটা কখনও আনন্দর আর কখনও এই বাচ্চাটাকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হচ্ছিল। আবার কখনও দুটো ভাবনা এক সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আর সেই সঙ্গে তার নিজের জন্যে এক ধরনের বিচিত্র মায়া হচ্ছিল।

এই তার জীবন? যাদের কথা সে এই মুহূর্তে ভাবছে, বলতে গেলে ভেবে মরছে তারা তার কে? তার বাল্যকালের ঝড়ের দিনের একটা ছবি তার মনে পড়ল। তাদের বাড়ির সামনে যেখানটায় ডলি-বেবীদের বাড়ি হয়েছিল সেইসব জায়গায় একটা আমগাছ, আর একটা দেবদারু গাছ ছিল। এক কালবৈশাখী ঝড়ের পর সেখানে বেড়াতে গিয়ে সাত-আট বছরের রেণু দেখেছিল শুকনো আমপাতার সঙ্গে গায়ে লাগালাগি হয়ে দেবদারু পাতা পড়ে আছে। আবার বাতাসের একটা ঝটকা আসতেই পাতাগুলো আলাদা হয়ে কোথায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়ে চলে গেল।

এও তেমনি। এই ক-বছর ধরে যে ঝড় চলছে, যা কখনও এসেছে যুদ্ধ হয়ে, কখনও এসেছে দাঙ্গা হয়ে তারই ধাক্কায় রেণু বলে দুঃখী মেয়েটা কৃষ্ণায় রূপান্তরিত হবার গৌরব নিয়েও তো বাঁচতে পারেনি। বাঁচবে কি করে? সে তো বড়লোকের বাগানের গাছ নয়! তার চারিপাশে উঁচু পাঁচিলের বেড়াও ছিল না, কি সে টবের সযত্নলালিত ললিত লতাটিও ছিল না। সে ওই কবরখানার আম আর দেবদারু গাছের ঝরা পাতার মতো। বাতাসের প্রথম ধাক্কাতেই গাছ থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছিল! উড়তে উড়তে আজ এই সার্কুলার রোডের ধারে এক বস্তির বাড়িতে এসে ঠেক খেয়েছে! সেই ঠেক খাওয়ার সময় আনন্দ রায়, এই কচি বাচ্চাটাও আর দুটো শুকনো পাতার মতো তার গায়ে এসে ঠেক খেয়েছে। ঝড়ে ভেসে-আসা শুকনো পাতা দুটো আজ এসে কাছাকাছি হয়েছে! আবার কবে কে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে?

ঠিক এমনি সময়ে দরজায় কড়া নড়ে উঠল। বুঝলে আনন্দ রায় ফিরল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়াল।

কিন্তু এ কে? এ-কি? এ-কি তার চেনা সেই লোকটি? এমন মুণ্ডিত মস্তক! সর্বাঙ্গে গেরুয়া!

আনন্দ রায়ের এ চেহারা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

আনন্দ রায়ের দিকে চেয়ে সে একটু হাসল মনে মনে! তার আবার কল্পনা!

সে আর কতটুকু ? তার দৌড়ই বা কতটা ! ও যে আনন্দ রায় ! ও লোকটা তো কল্পনাতেই বেঁচে আছে ! কল্পনা বিক্রি করেই ওর জীবন আর জীবিকা ! আনন্দ রায় যা কল্পনা করে করতে পারে, তার নাগাল সে পাবে কি করে ?

কিন্তু তাই বলে এই পরিণাম ?

কিন্তু কেন ? প্রশ্নটা কাঁটার মতো খচ করে উঠল তার মনে। সে দরজার পাল্লার পাশ থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল আনন্দ রায়কে। বিচিত্র চেহারা ও পোশাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল আনন্দ রায়। কবি আনন্দ রায়, গাইয়ে আনন্দ রায়, হৈ-চৈ করা আনন্দ রায়, মদ্যপ আনন্দ রায়, ডলি-বেবী-সুমিত্রায় আসক্ত আনন্দ রায়ের সঙ্গে এই ন্যাড়ামাথা, গেরুয়া-পরা আনন্দ রায়ের বিন্দুমাত্র মিল নেই।

তাই-ই বা কেন ? নেই-ই বা কেন ? এই মুহূর্তে সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের পোড়-খাওয়া ওই কৃষ্ণা বলে মেয়েটা যেন আনন্দ রায়ের মনের একেবারে ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। ওই যে লোকটা, যে আজ মাথা ন্যাড়া করে, গায়ে গেরুয়া চড়িয়ে সন্ন্যাসী সেজে এসে দুপুর রাত্রিতে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ও যেন একটা নাটক করছে। নাটকীয়তাই আনন্দ রায়ের চরিত্রের আসল চেহারা। আনন্দ রায় সেই ছেলেবেলায় স্বদেশী গান গাওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত যত কাজ করেছে তার ওই একটাই উদ্দেশ্য ! লোকটার প্রাণের ভিতর যে ইচ্ছা-ভোমরাটি বাস করে, তার একান্ত ইচ্ছাটি হলো, সবাই সবাই আমাকে দেখুক। আমাকে সর্বক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখুক। দেখুক আর তারিফ করুক। লোকটা টাকা চায় না, পয়সা চায় না। চায় কেবল মান আর খাতির। চায়—সবাই বলুক, আনন্দ রায়—আনন্দ রায়ই। একটা সর্বক্ষণ চেয়ে দেখার লোক বটে। সেই দেখানোর মনটাই আজ ওর এই বিচিত্র চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সেই কথাটাই সে নিঃশব্দে অথচ তারস্বরে যেন খুব জোরে জোরে বলতে চাইছে।

বলুক আনন্দ রায়। তাতে রেণু বলে এই দুঃখী মেয়েটার কিছু এসে যায় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের সামান্য উদরান্নের জন্যে যাকে নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয়, যার সংসারে নিজেকে ছাড়া ভরসা করবার মতো কেউ নেই তার ওসব নাটকীয়তা দেখে মুগ্ধ বা বিভ্রান্ত হওয়া চলে না ! সে দরজার পাশ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতেই আনন্দ রায় তার দিকে একবার চেয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কৃষ্ণা চুপ করে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট পর পাশের ঘর থেকে আনন্দ রায়ের গলা শোনা গেল। সে কৃষ্ণাকে তার সাফ-পরিষ্কার গান-গাওয়া দরাজ গলায় ডাক দিলে—কৃষ্ণা !

কৃষ্ণা এই ডাকটির অপেক্ষাতেই যেন ছিল মনে মনে। আনন্দ রায় সম্পর্কে মনে যে সরস প্রীতির ভাঁড়টি কানায় কানায় সর্বক্ষণই ভরাট হয়ে থাকে এই

শব্দটির ছোঁয়ার এত বিরূপ চিন্তা সত্ত্বেও, তার মনে-ধরা সেই ভরাভর্তি পাত্রটি যেন চমকে ছলকে উঠে তা থেকে খানিকটা মধু উপচে পড়ল তার মনেরই উপর। সে প্রীতি-প্রসন্ন স্নেহের সঙ্গে জবাব দিলে—যাই!

বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাসি মুখেই বললে—ডাকছিলেন?

আনন্দ রায় নিজের গায়ের গৈরিক চাদরখানা খুলে নিজের বিছানার উপর ফেলে নিজের গায়ের গেরুয়া আলখাল্লাটা খুলতে খুলতে বললে ওঘর থেকে তোমার টেবিল্-ফ্যানটা একবার এনে দাও না! বড় গরম লাগছে! একটু হাওয়া খাই!

দুঃখী মেয়েটা এক মুহূর্তে আবার অনেক কথা ভেবে নিলে। আসলে তার এই ছোট্ট শিশুটার কাছ থেকে পাখাটা এখন সরিয়ে নিয়ে যাবার আদৌ ইচ্ছা নেই। এই নিদারুণ গরমের ভেতর মাতৃহীন ছেলেটা কখনও ঘুমুচ্ছে, কখনও জেগে পিটপিট করে চাইছে, আর নিজের আঙুল চুষছে। পাখার আরামে দিব্যি আছে ছেলেটা। পাখা বন্ধ হলেই কেঁদে উঠবে। আহা, ও দুর্ভাগার কে আছে? কেউ তো নেই! পিতৃপরিচয়হীন, সেইসঙ্গে মাও ওকে ছেড়ে পালিয়েছে। আর সে মা এমন মা যে শুধু ওর মৃত্যুই চেয়েছে! ওই শক্তিহীন, দুর্ভাগা, অবোধের আশেপাশে যে তিনটি মানুষ বিচরণ করছে তার মধ্যে দু-জনের মনোভাব তো তার জানা! বুড়ী নানীয়া তো পরিষ্কার বলছে ছেলেটাকে সরিয়ে দে। কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দে, নয়তো কোন কাউকে দান করে দে! আনন্দ রায়ও এ ছেলেটাকে চান না। তাঁর ওর প্রতি বিরূপতাও কিছু গোপন নয়। কৃষ্ণাকে যে তিনি যেটুকু অনুরাগের চোখে দেখেন তার মধ্যে ওই শিশুটির কোন জায়গা নেই। তিনিও দু-একবার পরিষ্কার বলেছেন ছেলেটাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে!

কিন্তু ওই দুর্ভাগা, শক্তিহীন অবোধকে কৃষ্ণা কোথায় ফেলে দেবে? ওর জন্মাবধি ওর প্রতি ওর মায়ের নিষ্ঠুর বিরূপতা ও যত দেখেছে তত এক অসহায় মমতা বোধ করেছে শিশুটির ওপর। প্রথম প্রথম বাচ্চাটার দিকে হাত বাড়াতে ওর সঙ্কোচ হয়েছে, ভয়ও হয়েছে। মনে হয়েছে যদি বেবী তার সামগ্রীতে হাত দেবার অপরাধে তাকে খেঁকিয়ে ওঠে। কিন্তু বেবী তা করেনি। বরং সে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে সে নিষ্ঠুরভাবে মুখ বাঁকিয়ে হেসেছে। হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে বলেছে—না বিইয়ে কানাইয়ের মা হবার খুব শখ দু-দিনেই মিটে যাবে।

কথাগুলো কানে এসেছে তার। বেবী শিশুটার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে প্রাণান্ত করবার বার দুয়েক চেষ্টা করার পর থেকেই বুড়ী নানীরা তাকে গালাগাল দিয়ে বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। এরপর কৃষ্ণাই তার সব দায়টা বুকে তুলে নিয়েছিল। শুধু বুকেই তুলে নেয়নি, ছেলেটা জন্মদাত্রী

মায়ের কাছে যা তার পাওনা সত্ত্বেও পায়নি তাই অতি গোপনে সুধসুদ্ধ তাকে দিয়ে মনে মনে তার মা সেজে গেল। বেবী তাকে যখন ফেলে চলে গেল তখন কৃষ্ণা এক ধরনের স্বস্তি ও তৃপ্তি অনুভব করেছিল মনে মনে। যাক, শিশুটির উপর তার স্বত্ব পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে গেল তাহলে! তারপর দিনে দিনে বুড়ী নানীয়া আর আনন্দ রায়ের বিরূপতা যত স্পষ্ট হলো শিশুটির উপর তার স্নেহ ও মমতা তত প্রবল হয়ে উঠল দিনে দিনে।

সেটা একবার স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে যেদিন সে টেবিল ফ্যানটা ভাড়া করে নিয়ে এল। তার চুলের জুলফি বেয়ে ঘাম পড়ছে, ঠোঁটের উপর ঠোঁট কেটে বসে আছে, দেহটা হাতে-ঝোলানো টেবিল-ফ্যানটার ভারে একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। টেবিল-ফ্যানটা হাতে করে সে ঢুকল বাড়িতে। তাকে ওই অবস্থায় দেখে বুড়ী নানীয়া হাসিমুখে ছুটে গিয়ে ফ্যানটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললে খুব ভাল কাজ করেছিস ফ্যানটা এনে! গরমের দিন, তুইও বাঁচবি বাতাস খেয়ে, আমিও থোড়া বহুত ঠাণ্ডা বাতাস খেতে পাব। তার ওপর তোর ওই তেজী পাগল মাশুক, বাতাস খেয়ে, তারও গরম মাথা থোড়া বহুত ঠাণ্ডা হবে। এ ভালই করেছিস! আর তোর তো খেটে খেটে জিন্দগী কাবার হয়ে গেল!

বুড়ী নানীয়া ভুলেও বাচ্চাটার নাম করেনি। তা না করুক! তবে তার মনে মনে রাগ হয়েছিল। সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বুড়ী নানীয়ার হাতে ঝোলানো ফ্যানের পিছন পিছন ঘরে ঢুকেছিল।

বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল চৌকীতে। নানীয়া ফ্যানটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বলেছিল—চালা, একবার তোর ফ্যানটা চালা। একটু বাতাস খাই। দেখি কেমন লাগে!

চৌকির পাশে একটা বেঞ্চে তার আর নানীয়ার যে দু-তিনটি বাক্স-প্যাটরা আছে সেগুলি রাখা থাকে। তারই মধ্যে একটা স্যুটকেশের উপর ফ্যানটা বেশ শক্ত করে বসিয়ে তার পিনটা প্লাগে ঢুকিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলে কৃষ্ণা। এ সব তার আগে থেকেই মনে মনে হিসেব করা ছিল। চালাবার আগে হিসেব করে ফ্যানটার মুখ মেঝের দিকে ঘুরিয়ে দিলে।

বুড়ী নানীয়া সঙ্গে সঙ্গে আরাম করে শুয়ে পড়ল সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর। পাখার বাতাস যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দেহের ওপর আদুরে ছেলের মতো। তার আঁচল উড়তে লাগল, তার মাথার পাকা চুল উড়তে লাগল। সে মুখে একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বললে—আঃ!

আবার ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপাল কৃষ্ণা। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে সে নানীয়ার আরাম করে বাতাস খাওয়া দেখতে লাগল।

কৃষ্ণা নানীর ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শিশুর ওপর রাখল। ফ্যানের বাতাস পেয়ে শিশুর ঘুম গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। আহা! একটু বাতাস—

একটু বাতাস বেশি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন স্নিগ্ধতর হয়ে উঠছে। বাতাস-আলো-জল মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে এই তিন প্রয়োজনীয় জীবনধারণের সামগ্রী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে। ঈশ্বর মানুষের মতো কৃপণ নন, স্বার্থান্বেষী নন, লোভাতুর নন! তিনি তো আলো-বাতাস-জল বিতরণ করেছেন এই পৃথিবীর মানুষকে বিনামূল্যে, বিনাস্বার্থে, শুধু তাঁর সৃষ্টি যাতে চিরকাল বেঁচে থাকে তারই প্রত্যাশায়।

কৃষ্ণা পরম স্নেহে ধীরপায়ে শিশুর কাছে গিয়ে পাশ ফিরিয়ে তাকে শুইয়ে দিল, যাতে সে পাখার হাওয়ার মুখোমুখি হয়। নিজের আঁচল দিয়ে শিশুর মুখ হাত পায়ের ঘাম মুছিয়ে দিল। শিশুর ঘুম ভাঙল না। বরং, আরও গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

কৃষ্ণা নানীয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল। পাখার বাতাসের আরামে এরই মধ্যে বুড়ী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। একটু একটু নাক ডাকার শব্দ কানে আসছে। ওই টুকু আরামের প্রলেপে দুটি জীবন কেমন নিশ্চিন্তভাবে আরামের মধ্যে সঁপে দিয়েছে নিজেদের। দুজন জীবনের দুই প্রান্তের অধিবাসী। মানুষ যখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, বার্ধক্যের জরা যখন জীবনের বুকে নেমে আসে, তখন তার মন হয়ে যায় শিশুর মতো। দুজনের মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণা। নিষ্পাপ মুখ। বেবী, আনন্দ রায়, সুমিত্রার মুখের ওপর যে রেখাসমষ্টি দেখেছে, তার একটিও এদের মুখের ওপর নেই। দৈনন্দিন জীবনের কুটিলতার রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে, নিষ্পাপ রেখাহীন দুখানি মুখ গভীর শান্তিতে নিদ্রায় মগ্ন। কৃষ্ণা নিঃশব্দ-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে নানীয়ার কাছে এসে, তার পাশে বসল, তারপর নিজের আঁচল দিয়ে নানীয়ার মুখের ঘাম মুছে দিল। মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন, আশ্চর্য শান্তি। নানীয়ার পাশ থেকে উঠে সে দরজার দিকে এগোল। দরজা বন্ধ করে শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানি মুছে পরম আরামে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আঃ!

—কই! পাখাটা এগিয়ে দিলে না?

আনন্দ কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে অনেকটা আদেশের ভঙ্গীতে বলল বড্ড গরম! একটু হাওয়া খাই!

কৃষ্ণা একদৃষ্টিতে আনন্দর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের তারা দুটি আনন্দর শরীরের সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুণ্ডিত মস্তক, দু-চোখের তারায় সন্ন্যাসের ঔদাসীন্য। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে উন্নত এবং উজ্জ্বল। পরনে গেরুয়া বস্ত্র এবং উত্তরীয়। সর্বস্ব ত্যাগের প্রতীক।—কি দেখছ অমন ভাবে? খানিকটা অস্বস্তি-ভরা-কণ্ঠে আনন্দ বলল—পাখাটা ঠিক না

করে দিলে আর পারছি না। গরমে হাঁফ লেগে যাচ্ছে।

—সন্ন্যাস নিয়েছেন, সাংসারিক আরামটুকু তো ছাড়তে পারেননি।—কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর ধীর স্থির অবিচলিত। পাখা ঠিক করে দেবার জন্যে সে একটুও ব্যস্ত হলো না।

আনন্দ রায় থমকে গেল। এ উত্তর কৃষ্ণার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু মেয়েটি কি তার মর্মচক্ষে আনন্দ রায়ের কীর্তিকলাপ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে? এ তো মিথ্যা কথা নয়। সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে সে শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছে। তাদের সংসারের সেরা খাদ্যদ্রব্য সে গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে আরামপ্রদ শয্যায় তার বিছানা তৈরি হয়েছে। সন্ন্যাসীর পোশাকের অন্তরালে সত্যিই আনন্দ রায় সংসারের সবচেয়ে আরামপ্রদ খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেছে, বিলাসবৈভব উপভোগ করেছে।

—কৃষ্ণা! বিশ্বাস করো আমি সন্ন্যাসী!

আনন্দ রায় কৃষ্ণাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টায় একটু জোর দিয়েই কথাগুলো বলল।

—আমার বিশ্বাসে কি এসে যায়? আপনার নিজের বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় বিশ্বাস!

কৃষ্ণা একটু থামল, তারপর মৃদু হেসে বলল—আপনি সকলকে প্রবঞ্চনা করতে পারবেন, নিজেকে পারবেন না। আপনি চিরকাল নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছেন বলেই কোনদিন কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারেননি। শান্তি পাননি। উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গেরুয়ার আবরণে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ চেষ্টার মধ্যেও সততা নেই, আছে আত্মপ্রবঞ্চনা, তাই অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন এখান-থেকে-ওখানে। একটু বাতাসের জন্যে তাই আমার মতো নিঃস্ব নারীর কাছেও ভিক্ষা করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

অপার বিস্ময়ে আনন্দ কৃষ্ণার দিকে তাকাল। একটি সাধারণ মেয়ে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পরাজিতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা—সে যেন মুহূর্তে মধ্যে অপরাজিতা হয়ে উঠল।

আনন্দ রায়ের মনের মধ্যে এক আশ্চর্য বিবর্তনের সূচনা। সত্যিই সে এতদিন নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছে। কৃষ্ণা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তার আত্মা তাকে কখনও প্রবঞ্চনা করেনি। সেখানে সে নিষ্পাপ। তাই কৃষ্ণা যেভাবে মাথা সোজা করে কথা বলতে পারছে, আনন্দ রায় পারছে না।

উত্তরীয়খানা তুলে নিয়ে গায়ে দিল আনন্দ। আর গরম লাগছে না। ওই পাখাটা থাকলেই বা কী, বা না-থাকলেই বা কী! ওই যে শিশুসন্তান শুয়ে আছে, এই যে সামনে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে, সব অচেনা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ আকর্ষণ রাখতে নেই। সাংসারিক আকর্ষণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েই সন্ন্যাস জীবনের সূত্রপাত।

—কৃষ্ণা! তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। তুমি অপরাজিতা। আমি পরাজিত।

—ছিঃ ছিঃ একথা বলবেন না। আপনি কত জ্ঞানী।

—এতদিন আমার যে ভুল ধারণা ছিল, সেই ধারণা তুমি পাল্টে দিলে একেবারে।

নির্বিকার সুরে আনন্দ রায় বলল আমার হয়ত কিছু জ্ঞান ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল অহমিকা। দম্ভের অন্ধকারে আমার সমস্ত জ্ঞানের আলোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। দম্ভের রাহু জ্ঞানের সূর্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল। আজ উপলব্ধি করছি কৃষ্ণা, জ্ঞানের সঙ্গে যদি বিনয় আর সততা না থাকে তাহলে সে জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায়, মনের মধ্যে দুষ্ট সরস্বতী ভর করে।

আনন্দ রায় উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি পাখার কাছে গিয়ে পাখার মুখ আনন্দের দিকে করে দিয়ে বলল—বসুন।

—না। ও পাখারও আর দরকার নেই। বিশ্বাস কর কৃষ্ণা আজ সত্যই আমি মুক্তপুরুষ, সন্ন্যাসী।

—আজ রাতে বিশ্রাম করে যান।

—না। অনেক সময় অপচয় করেছি. আর নয়। এখন হয়ত মনেপ্রাণে অন্বেষণ করলে ঈশ্বরের দেখা পাব।

কৃষ্ণা বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল—গৃহস্থের সেবার মধ্যেও ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। আপনি আমার এখানে এসেছিলেন বিশ্রামের জন্যে। আমি যদি আপনার সেবা না করি, গৃহস্থের অকল্যাণ হবে, ওই শিশুর অকল্যাণ হবে।

আনন্দ এক পলকের জন্যে শিশুর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে কৃষ্ণাকে বলল—কৃষ্ণা! তুমি মহিমময়ী। তুমি যে কথা বললে তার বিরুদ্ধে আমার কোন যুক্তি নেই। শুধু এইটুকু বলব, আজ আমি বিশ্রামের জন্য আসিনি, এসেছিলাম ভোগের জন্যে। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ, আমি বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছি, যদি কোনদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, সেদিন সর্বাগ্রে তোমার কাছেই দাঁড়াব, তখন তুমি যে সেবা করবে আমি পবিত্রচিত্তে তাই গ্রহণ করব। আজ যদি তুমি আমাকে এই মুহূর্তে বাধা দিয়ে আটকে দাও, কাল সকালে এই মুহূর্তের পবিত্র আত্মার মৃত্যু ঘটতে পারে। কাল সকালে আবার ভণ্ড পাপাচারী লোভী সন্ন্যাসী আনন্দ রায় জেগে উঠতে পারে। একজন ঈশ্বর সন্ধানী মানুষকে আবার পাপাচারী করে তোলার পাপ সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর বর্তাবে। তোমার সংসারের অমঙ্গল হবে। ওই

শিশুসন্তানের অকল্যাণ হবে।

কৃষ্ণা মনে মনে শিউরে উঠল। বার বার শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখল। একবার আনন্দর দিকে তাকাল। তার মুখের বিবর্তন উপলব্ধি করছে কৃষ্ণা। পূর্বের আনন্দ রায়ের মৃত্যু ঘটেছে, আর তার ভিতর থেকে নতুন এক আনন্দ রায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, যে আনন্দ রায় তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সৌম্য, দিব্যদর্শন, সাধু।

কৃষ্ণা ধীরপায়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। আনন্দ দু-হাতে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একবারের জন্যেও সে পিছন ফিরে দেখল না। সাংসারিক জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সে যাত্রা করল নতুন এক জীবনের সন্ধানে।

—ক্যাঁচ! হর্ন! চিৎকার—বিকট আওয়াজ!

কৃষ্ণা ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তার ওপরই মিলিটারী লরী দাঁড়িয়ে। লরী ছুটে চলেছিল বিদ্যুৎবেগে। আনন্দ রায় অন্যমনস্কভাবে একেবারে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ে। গাড়ির ড্রাইভার অকস্মাৎ একটি মানুষকে সামনে দেখে প্রাণপণে ব্রেক কষে। কিন্তু বৃথা। গাড়ি থামার আগেই গাড়ির ধাক্কায় আনন্দ রায় পড়ে যায় রাস্তার ওপর. প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের চাকা চলে যায় আনন্দ রায়ের বুকের ওপর দিয়ে।

কৃষ্ণা পাথরের মতো নিস্তব্ধ নিথর।

রক্তাপ্লুত আনন্দ রায়ের দেহ পথের ওপর। ড্রাইভার এবং আরও কয়েকজন সৈন্য লরী থেকে নেমে ধরাধরি করে আনন্দ রায়ের প্রাণহীন দেহ লরীর মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। পীচের রাস্তার ওপর ছোপ ছোপ রক্ত লেগে রয়েছে।

কৃষ্ণার দু-চোখে জলের ধারা। আনন্দ রায় নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর লাভ করেছে। ঈশ্বর তাকে দু-হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আনন্দ রায়ের আত্মার শান্তি হয়েছে।

কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখল কৃষ্ণা। মুখখানি অবিকল আনন্দর মতো। পায়ে পায়ে শিশুর কাছে এসে দাঁড়াল সে। ঘুমন্ত শিশুকে দু-হাতে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। কৃষ্ণার দু-চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা। আনন্দ রায়ের যত আশীর্বাদ সব যেন কৃষ্ণার চোখের জল হয়ে শিশুর মাথায় ঝরে পড়ছে অবিরত ধারায়।

শিশুর হৃদপিণ্ডের শব্দ কৃষ্ণা বুকের জন্যে অনুভব করছে ধক ধক করে। সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নির্জন ঘরে শিশুর হৃদপিণ্ডের গতি-শব্দের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণা অনুভব করল আনন্দ বলছে আমি আছি, আমি আছি।